রত্ননিবাসে তিন অতিথি

বিমল কর

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭/২৭শে এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশক : অরুণ কুমার শীল, দেবযানী,
৬বি শংকর হালদার বাই লেন, কলকাতা-৫

মুদ্রাকর : সেনকো প্রিন্টার্স, ৪৬বি শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ : অপরূপ উকিল

শ্রী গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ
কল্যাণীয়েষু

বাড়ির নামগুলো পুরনো ধাঁচের। 'সুধাস্মৃতি', 'বসন্ত বকুল', 'মাধবকুঞ্জ', 'আশীর্বাদ'।

গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এই অবেলায় সব নাম ভাল করে পড়াও যায় না। যেমন 'বসন্ত বকুল' নামটা আন্দাজ করে নিয়েছিল কমলকুমার। 'বসন্ত' পড়া যাচ্ছিল কোনোরকমে, 'বকুল'-এর 'ব' পুরোপুরি মুছে গিয়েছে, 'কুল' আবছা।

ফুল ফলের ব্যাপারে কমলকুমারের জ্ঞান কম। বর্ষার সময় রজনীগন্ধা, শীতকালে গোলাপ আব গরমে বেলফুল হয়—মোটামুটি এগুলো—এই সব সাধারণ গোছের ফুলটুলের ব্যাপারটা তাব জানা। বকুল কি বসন্তকালের ফুল?

কে জানে বকুল কখন ফোটে? তবে মানুষের জীবনের বেলায় অত ফোটাফুটির নিয়ম নেই। বসন্ত নামেব ভদ্রলোকের সঙ্গে বকুল নামের কোনো মহিলার বিয়ে হতেই পারে। আর শেষ বয়েসে বা মাঝ বয়েসে বসন্ত নামের ভদ্রলোক নিজেব এবং স্ত্রীব নাম জড়িয়ে বাড়ির নাম বসন্ত বকুল দিতেই পারেন।

শ' কি দেড়শ' গজ রাস্তা এইভাবে আসার পর কমল বুঝল, খাঁটি বাঙালিআনার সঙ্গে ফিবিঙ্গিআনাও এখানে মিশে আছে। 'দি নেস্ট' 'আইভি ভিলা' 'হ্যাপি হোম'—এই রকম আর কি! স্বাভাবিক বাঙালি চরিত্র।

গাড়িঅলা কিছু বলতে যাচ্ছিল। হয়ত বলতে চাইছিল, "স্যার—এইভাবে চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে কতক্ষণ গাড়ি চালাব? আপনার বোধ হয় নামধাম ঠিকমতন জানা নেই।"

গাড়িঅলাকে কিছু বলতে হল না, তার আগেই কমল গাড়ি থামাতে বলল। 'রত্ননিবাস'।

"এহি কোঠি?"

"হ্যাঁ।"

লোকটা গাড়ি থামাল। স্টার্ট বন্ধ করল।

গাড়ি থেকে নামার আগে কমল একটু ভাবল। বাড়ির ফটক বন্ধ। লোহার গরাদ-দেওয়া ফটক। এত পুরনো, মরচে ধরা, ভাঙাচোরা চেহারা যে, মনে হয় না, এই ফটক পুরোপুরি খোলা যায়। ফটকের দুই পাল্লার মাথায় শেকল বাঁধা! কাছাকাছি কাউকে দেখাও যাচ্ছে না।

কমল গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। দেখে মনে হয়, তার বাঁ পা কমজোরি। ভেঙেচুরে গিয়েছিল বোধ হয়। বাঁ হাতে ছড়ি। বেতের নয়। অ্যালুমিনিয়াম স্টিকের মতন।

বাঁ পায়ের দিকে সামান্য খুঁড়িয়ে, যেন একটু পা টানতে-টানতে ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল।

বেলা পড়ে গিয়েছে। আলো প্রায় মিলিয়ে এল। অক্টোবর মাস। হুস্ করে অন্ধকার নেমে আসবে। এখনই আকাশতলায় আলো খুবই ফিকে হয়ে এসেছে, পাতলা আবছা অন্ধকার যেন পা বাড়াতে বসল। এখানে গাছপালা অজস্র। আম জাম দেবদারুর পাতায় কালচে রঙ ধরে গিয়েছে, পাখির দল ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে গাছের ডালে।

কমল ফটকের সামনে এসে ভেতরের দিকে তাকাল।

আশ্চর্য, কাছাকাছি কোনো লোক নেই। সামনে মরা বাগান, আগাছাই বেশি। অন্তত তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।

কমল একবার পেছন দিকে তাকিয়ে গাড়িঅলাকে দেখল। একে ট্যাক্সি বলে না। মান্ধাতা আমলের এক 'মরিস'। ভাড়া খাটে।

সাধারণভাবে কমল একবার ফটক খোলার চেষ্টা করল। হাত কয়েক মাত্র খুলল, তারপর আটকে গেল। ফটকের মাথায় আলগা করে শেকল বাঁধা।

কমল গাড়ির কাছে ফিরে এল। ড্রাইভারকে বলল, "বাড়ি কোথায়? পুরুলিয়া না বাঁকুড়া?"

লোকটা থতমত খেয়ে গেল।

"বাঁকুড়া?" কমল একটু হেসে বলল।

"আজ্ঞা।"

"কি নাম?"

"রামগতি বিশ্বাস।"

"আমি বাঙালি। সাহেব নই, বাপ্।...হিন্দিতে তোমার দরকার নেই। বাংলা বলবে।...নাও, এখন একটু হাত লাগাও। ভাড়ার ওপর পাঁচ টাকা।"

রামগতি আপত্তি করল না। পাঁচ-পাঁচটা টাকা উপরি রোজগার কে ছেড়ে দেয় আজকের দিনে। আর সাহেবের মালপত্রও বেশি নয়। একটা হোল্ডঅল, বড় সুটকেশ, বেতের এক টুকরি।

গাড়ি থেকে নেমে রামগতি মালপত্র নামাতে লাগল।

"স্যার, আপনি এই বাড়িতে আসবেন আগে বললে—"

"কেন ?"

"এ বাড়ির নাম, গুম বাড়ি।"

"গুম বাড়ি !...কেন ? বাড়ির নাম লেখা আছে রত্ন নিবাস।"

"নাম আছে তো কী হয়েছে, স্যার। আমার নাম রামগতি, আমি কিন্তু খেস্টান।" রামগতি হোল্ডঅল আর সুটকেশ তুলে নিয়েছিল। তার চেহারার মধ্যে কাঠখোট্টা ভাব রয়েছে। মাথায় বেঁটে, রঙ কালো। মুখ ভোঁতা ধরনের। দেখলেই বোঝা যায়, গায়ে ক্ষমতা আছে। চোখ খানিকটা লালচে। নেশাভাঙ করে বলেই মনে হয়।

কমল বেতের টুকরিটা উঠিয়ে নিল।

ফটক যেটুকু খুলে রেখেছিল কমল, তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল দুজনেই।

কমল বলল, "বাড়িটার নাম গুম বাড়ি হল কেমন করে রামগতি ?"

রামগতি বলল, "এই বাড়িটায় স্যার লোকজন আসে না। এক দু' বছরে কেউ যদি এল, সে আর ফেরে না। এই বাড়িতেই মারা যায়।"

"মারা যায় ?"

"লাশ হয়ে যায়। ডেড্ বডি স্যার। আগের লোকটা আগুনে পুড়ে মরেছিল। তার আগে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল। তার আগে..."

"তা হলে গুম বলছ কেন, বলো—মৃত্যুপুরী।"

"যা বলেন !...আপনি কেন এ-বাড়িতে এলেন স্যার ?"

কমল মজার গলায় বলল, "তোমার কথা যদি ঠিক হয় তবে মরতে এসেছি।"

"ভাল করেননি স্যার। এখানে আরও বাড়ি আছে। আপনি বেড়াতে এসেছেন। অন্য বাড়ি নিয়ে নিন। ফাঁকা বাড়ি অনেক আছে, স্যার। সিজন্-টাইম এখনও পুরোপুরি শুরু হয়নি।"

কমল অন্যমনস্কভাবে বাগান দেখছিল। কিছু গাছপালা, ঝোপ, আগাছা ছাড়া বাগানের আর বিশেষ কিছু নেই। নেড়া মাঠের মতন জমিও পড়ে আছে খানিকটা। হাঁটতে হাঁটতে কমল বলল, "তুমি কোথায় থাক, রামগতি ?"

"বাজারের কাছেই স্যার। পুব দিকে। সরকারবাবুর বাড়ি বলে একটা বাড়ি

"হ্যাঁ।"

লোকটা গাড়ি থামাল। স্টার্ট বন্ধ করল।

গাড়ি থেকে নামার আগে কমল একটু ভাবল। বাড়ির ফটক বন্ধ। লোহার গরাদ-দেওয়া ফটক। এত পুরনো, মরচে ধরা, ভাঙাচোরা চেহারা যে, মনে হয় না, এই ফটক পুরোপুরি খোলা যায়। ফটকের দুই পাল্লার মাথায় শেকল বাঁধা! কাছাকাছি কাউকে দেখাও যাচ্ছে না।

কমল গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। দেখে মনে হয়, তার বাঁ পা কমজোরি। ভেঙেচুরে গিয়েছিল বোধ হয়। বাঁ হাতে ছড়ি। বেতের নয়। অ্যালুমিনিয়াম স্টিকের মতন।

বাঁ পায়ের দিকে সামান্য খুঁড়িয়ে, যেন একটু পা টানতে-টানতে ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল।

বেলা পড়ে গিয়েছে। আলো প্রায় মিলিয়ে এল। অক্টোবর মাস। হুস্ করে অন্ধকার নেমে আসবে। এখনই আকাশতলায় আলো খুবই ফিকে হয়ে এসেছে, পাতলা আবছা অন্ধকার যেন পা বাড়াতে বসল। এখানে গাছপালা অজস্র। আম জাম দেবদারুর পাতায় কালচে রঙ ধরে গিয়েছে, পাখির দল ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে গাছের ডালে।

কমল ফটকের সামনে এসে ভেতরের দিকে তাকাল।

আশ্চর্য, কাছাকাছি কোনো লোক নেই। সামনে মরা বাগান, আগাছাই বেশি। অন্তত তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।

কমল একবার পেছন দিকে তাকিয়ে গাড়িঅলাকে দেখল। একে ট্যাক্সি বলে না। মান্ধাতা আমলের এক 'মরিস'। ভাড়া খাটে।

সাধারণভাবে কমল একবার ফটক খোলার চেষ্টা করল। হাত কয়েক মাত্র খুলল, তারপর আটকে গেল। ফটকের মাথায় আলগা করে শেকল বাঁধা।

কমল গাড়ির কাছে ফিরে এল। ড্রাইভারকে বলল, "বাড়ি কোথায়? পুরুলিয়া না বাঁকুড়া?"

লোকটা থতমত খেয়ে গেল।

"বাঁকুড়া?" কমল একটু হেসে বলল।

"আজ্ঞা।"

"কি নাম?"

"রামগতি বিশ্বাস।"

"আমি বাঙালি। সাহেব নই, বাপ্।...হিন্দিতে তোমার দরকার নেই। বাংলা বলবে।...নাও, এখন একটু হাত লাগাও। ভাড়ার ওপর পাঁচ টাকা।"

রামগতি আপত্তি করল না। পাঁচ-পাঁচটা টাকা উপরি রোজগার কে ছেড়ে দেয় আজকের দিনে। আর সাহেবের মালপত্রও বেশি নয়। একটা হোল্ডঅল, বড় সুটকেশ, বেতের এক টুকরি।

গাড়ি থেকে নেমে রামগতি মালপত্র নামাতে লাগল।

"স্যার, আপনি এই বাড়িতে আসবেন আগে বললে—"

"কেন ?"

"এ বাড়ির নাম, গুম বাড়ি।"

"গুম বাড়ি !…কেন ? বাড়ির নাম লেখা আছে রত্ন নিবাস।"

"নাম আছে তো কী হয়েছে, স্যাব। আমার নাম রামগতি, আমি কিন্তু খেস্টান।" বামগতি হোল্ডঅল আব সুটকেশ তুলে নিয়েছিল। তার চেহারার মধ্যে কাঠখোট্টা ভাব বয়েছে। মাথায় বেঁটে, রঙ কালো। মুখ ভোঁতা ধরনের। দেখলেই বোঝা যায়, গায়ে ক্ষমতা আছে। চোখ খানিকটা লালচে। নেশাভাঙ করে বলেই মনে হয়।

কমল বেতেব টুকরিটা উঠিয়ে নিল।

ফটক যেটুকু খুলে রেখেছিল কমল, তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল দুজনেই।

কমল বলল, "বাড়িটাব নাম গুম বাড়ি হল কেমন করে রামগতি ?"

রামগতি বলল, "এই বাড়িটায় স্যাব লোকজন আসে না। এক দু' বছরে কেউ যদি এল, সে আর ফেবে না। এই বাড়িতেই মারা যায়।"

"মারা যায় ?"

"লাশ হয়ে যায়। ডেড্ বডি স্যার। আগের লোকটা আগুনে পুড়ে মরেছিল। তার আগে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল। তার আগে…"

"তা হলে গুম বলছ কেন, বলো—মৃত্যুপুরী।"

"যা বলেন !…আপনি কেন এ-বাড়িতে এলেন স্যার ?"

কমল মজার গলায় বলল, "তোমার কথা যদি ঠিক হয় তবে মরতে এসেছি।"

"ভাল করেননি স্যার। এখানে আরও বাড়ি আছে। আপনি বেড়াতে এসেছেন। অন্য বাড়ি নিয়ে নিন। ফাঁকা বাড়ি অনেক আছে, স্যার। সিজন্-টাইম এখনও পুরোপুরি শুরু হয়নি।"

কমল অন্যমনস্কভাবে বাগান দেখছিল। কিছু গাছপালা, ঝোপ, আগাছা ছাড়া বাগানের আর বিশেষ কিছু নেই। নেড়া মাঠের মতন জমিও পড়ে আছে খানিকটা। হাঁটতে হাঁটতে কমল বলল, "তুমি কোথায় থাক, রামগতি ?"

"বাজারের কাছেই স্যার। পুব দিকে। সরকারবাবুর বাড়ি বলে একটা বাড়ি

আছে। বাবুরা আজকাল আর আসেন না বড়। বাড়িটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সারাতে চান না বাবুরা। আমি সেই বাড়িতে থাকি।"

"তোমার গাড়িটাও ওঁদের ?"

"আজ্ঞা হাঁ। গাড়িটা পড়ে থাকত। আমি ঠুকেঠাকে কাজ চালানো গোছের করে নিয়েছি। দু'দিন চলে, তিন দিন বিগড়োয়।"

"তুমি কি সরকারবাবুদের বাড়ির কেয়ারটেকার ?"

"হ্যাঁ স্যার। আমার হাতেই সব।"

"রামগতি, তুমি স্কুলে পড়েছ না ? কেয়ারটেকার কথার মানে বুঝলে কেমন করে ?" কমল হালকা করে বলল।

রামগতি যেন হঠাৎ বিনয়ী হয়ে গেল। বলল, "এইট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম স্যার। তারপর আর হল না। জড়িয়ে পড়লাম। গরিব মানুষেব আর কত হবে !"

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিল কমল। বাড়ি দেখতে দেখতে কমল বলল, "রামগতি, তুমি আমারও কেয়ারটেকার হয়ে যাও।"

কী বুঝল রামগতি কে জানে সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তা হলে চলুন, স্যার ; এ-বাড়িতে উঠবেন না। আজ আপনি আমার ওখানে থাকবেন। কাল আমি আপনাকে বাড়ি খুঁজে দেব। একা মানুষ আপনি। কোনো কষ্ট হবে না।"

কমল একটু হাসল। বলল, "না, আমি এই বাড়িতেই উঠব। অন্তত এখন। পরে যদি দরকার হয় দেখা যাবে।...তুমি কিন্তু আমার কেয়ারটেকার হলে। কিছু হলে—তুমি দেখবে।"

রামগতি কথাটা ঠিক বুঝল না। কিছুটা অবশ্য আন্দাজ করতে পারল। খানিকটা ধাঁধা খেয়ে গিয়েছিল। শেষে বলল, "স্যার, আমি কিছু বুঝলাম না। আপনার কোনো দরকার হলে আমায় বলবেন।"

কমল মাথা নাড়ল। "ঠিক আছে।...এখন তুমি ওই সিঁড়ির ওপর আমার সুটকেশ বিছানা নামিয়ে রেখে পালাও।"

রামগতি সিঁড়ির ওপর জিনিসগুলো নামাল না। বারান্দায় নামিয়ে রাখল।

কমল কুড়ি টাকার একটা নোট দিল রামগতিকে। দেবার কথা পনেরো। দশ টাকা গাড়ি ভাড়া, পাঁচ টাকা মাল-বওয়ার জন্যে। তবু কুড়ি টাকাই দিল কমল। ইচ্ছে করেই। বোধ হয় হাতে রাখতে। বলল, "তোমার কাছেই থাক। কাল দেখা করব। স্টেশনে।...নাও, তুমি পালাও।"

রামগতি ফিরে চলল।

কমলকুমার বোধ হয় এতটা আশা করেনি। একটাও লোক নেই কাছাকাছি।

সামনের বারান্দাটা গোল, আধাআধি। সিঁড়ির ধাপগুলোও গোল করে উঠে গিয়ে বারান্দায় মিশেছে। গোটা আষ্টেক ধাপ। বারান্দার শেষ দিকে পরপর ঘর। সামনাসামনি দুটো। আর বাকি দুটো দু'পাশে—ডাইনে বাঁয়ে।

আসার সময়েই, বাগান থেকে, কমল লক্ষ করেছে, বাড়িটা দোতলা। সামনের দিকে অন্তত তাই। পেছন দিকে হয়ত আরও আধতলা থাকতে পারে। কেননা, চালচিত্রের মতন বাড়ির পেছন দিকেও কিছুটা ছাদ, ঘরের মতন দেখা যাচ্ছিল।

বাড়িটা যে বেশ পুবনো বুঝতে কষ্ট হয না। বাডির বাইরে প্লাস্তারা নেই। শুধু ইট। রঙচঙ বোধ হয় কবা হয় না। কালচে রঙ ধরে গিয়েছে।

কী কববে, কাকে ডাকবে, বুঝতে না পেরে কমল সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে এমন সময একজনকে দেখা গেল। ঘব থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাতে লণ্ঠন।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল ততক্ষণে।

কমলের সিগারেট ধবানো চোখে পডেছিল লোকটার। দাঁড়াল। দেখল কমলকে। তাবপর এগিয়ে এল।

কাছে আসতেই লোকটার নজরে পডল, বারান্দায সুটকেশ, হোল্ডঅল, বেতের টুকরি নামানো।

কমলও লোকটিকে দেখছিল। মাঝ বয়েসী। সাধারণ মুখ। দাড়িগোঁফ না-কামানোর জন্যে ময়লা হয়ে রয়েছে। পবনে ধুতি। গায়ে মোটা ফতুয়া। ডান পায়ে গোড়ালির ওপর খানিকটা জায়গা ফেট্টি বাঁধা।

লোকটি বলল, "কী চাই ?"

কমল বলল, "বাড়ির মালিক—মানে মালিকানির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তিনি তো দেখা করেন না।"

"কে দেখা করেন ?"

"বড় ম্যানেজারবাবু।"

"বড় ম্যানেজারবাবু। কী নাম ?"

"প্রসন্ননাথ সিংহ।...আপনার নাম, পরিচয়— ?

"আমার নাম কমলকুমার গুপ্ত। আমি কলকাতা থেকে আসছি। দরকারি কাজে এসেছি।

লোকটি যেন কিছু ভাবল। বলল, "মালপত্র আপনার ?"

মাথা নাড়ল কমল।

"আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। বড় ম্যানেজারবাবু সন্ধের দিকে নিচে

নামেন না বড় । আমি খবর দিচ্ছি । আপনি আসুন—বসার ঘরে বসবেন ।”

“আমার জিনিসগুলো ?”

“এখানেই থাক । কেউ হাত দেবে না ।”

কমল আর কথা বলল না, লোকটির সঙ্গে এগিয়ে গেল ।

বারান্দার ডান দিকের ঘরটাই বসার ঘর ।

ঘর অন্ধকার ছিল । বড ধরনের একটা কেরোসিনের টেবিল বাতি জ্বালিয়ে দিল লোকটি । আলো জ্বালাতে জ্বালাতে নিজের পরিচয় দিল । নাম তার অর্জুন । এ-বাড়ির কর্মচারী ! বাইরের বাড়ির কাজকর্ম সে দেখাশোনা করে । আট বছর এ-বাড়িতেই কেটে গেল তার ।

কমল বলল, “এত বড় বাড়ি, মস্ত বাগান । একটাও লোক দেখলাম না কোথাও ?”

অর্জুন বলল, “দরকার করে না । ফটকের কাছে দরোয়ানের ঘর আছে । লোকটা নেশাখোর । কোথাও নেশা করতে বেরিয়েছে ।...আপনি বসুন । আমি বড় ম্যানেজারবাবুকে খবর দিচ্ছি ।”

“তোমাদের কি ছোট ম্যানেজারবাবুও আছেন ?”

অর্জুন বলব কি বলব না করে বলল, “ছিলেন । চলে গেছেন ।”

“চাকরি ছেড়ে ?”

অর্জুন সে-কথার কোনো জবাব দিল না । চলে গেল ।

কমলের সিগারেট আধাআধি শেষ । বসার ঘরটা সে দেখছিল । এটাকে ঠিক বসার ঘর বলা যায় না । অফিস ঘর আর বসার ঘর মিলিয়ে-মিশিয়ে সাজানো । সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা দেখলে মনে হয়, ভিক্টোরিয়ার আমলের কোনো আসবাব যেন । চেয়ারটাও দশ রকম কারুকাজে থিয়েটারের রাজসিংহাসনের মতন । বড়ই বেমানান লাগে এই ঘরে । কাঠের আলমারি, ডেস্ক—এ-সবের পাশাপাশি কয়েকটা কাঠের চেয়ার । চেয়ারের ওপর তুলোর পাতলা গদি । একপাশে সরু মাপের এক ফরাস ।

নজর করে কমল দেখল, মাপজোকে ঘরটা মোটামুটি বড়ই বলা যায় । খড়খড়ি দেওয়া জানলা । কাচের পাট করা পাল্লাও রয়েছে । দু'চারটে কাঁচ ভাঙা । কোনো সন্দেহ নেই, বাড়িটা শুধু পুরনো নয়, তখনকার ধাঁচে পয়সা খরচ করে করা ।

বাইরের প্লাস্তারা না থাক ঘরের ভেতর মোটা করে প্লাস্তারা দেওয়া । দেওয়ালটাও মোটামুটি সাজানো । বড় বড় কিছু ছবি, বনজঙ্গল পাহাড়ের, পুরু ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো । এসব ছবি সাহেবসুবোর আঁকা, কোম্পানির আমলে যারা

ভারতবর্ষ দেশটা দেখতে এসেছিল। এ-রকম ছবি কমল দেখেছে। ভাল ছবি। অবশ্য সাহেবী ছবির পাশে না হোক—তলাতে রবি বর্মার ছবির ঢঙে আঁকা সীতা সোনার হরিণ দেখছে গালে হাত দিয়ে। বাঃ, সুদর্শনচক্রধারী কৃষ্ণের ছবিও আছে। প্রভু যিশুরও একটা ছবি রাখা উচিত ছিল।

সিগারেটের টুকরোটা কোথায় ফেলবে ঠিক করতে না পেরে জানলা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে এমন সময় বাইরে কার গলা পাওয়া গেল।

কমল টুকরোটা ফেলে দিল, দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ক' মুহূর্তের মধ্যেই এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে অর্জুন।

কমল ভদ্রলোককে দেখছিল। গভীবভাবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ভদ্রলোকও কমলকে দেখছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ওপব ওপর তীক্ষ্ণ নয়, বরং হালকা। ভেতরে হয়ত অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, সতর্ক, ধূর্ততায় ভরা।

অর্জুন বলল, "বড় ম্যানেজারবাবু— !"

কমল বাঁ হাতের ছড়ি চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ভদ্রভাবে নমস্কার জানাল। "আমার নাম কমলকুমাব গুপ্ত।"

বড ম্যানেজাববাবু প্রসন্ননাথ সিংহ নিজেব সিংহাসন মার্কা চেয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "কলকাতা থেকে আসছেন ?"

"হ্যাঁ। আমাব চিঠি পাননি ?"

নিজের জাযগায় বসলেন প্রসন্ননাথ। বসে ইশাবায় অর্জুনকে বললেন, বাতিটা টেবিলেব অন্য পাশে সবিযে দিতে।

কমল এখনও ভাল করে বড ম্যানেজারবাবুকে লক্ষ করতে পারেনি। দু'দশ মিনিট কি আধ ঘণ্টা তাকিয়ে এসব মানুষকে বোঝা যায় না। তবু কমল ওপর ওপর যা দেখল তাতে মনে হয, ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। চেহারায় বয়েসটা ধরা মুশকিল। মাথায় যথেষ্ট লম্বা, গাযে মেদ কম, শক্তসামর্থ গড়ন। গায়ের রঙ আধ-ফরসা। মুখটি দেখার মতন। লম্বা নাক, গালের হাড় সামান্য উঁচু, শক্ত থুতনি। চোখ দুটি আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, স্থির। অবশ্য চশমার জন্যে ভাল ধরা যাচ্ছে না। পুরনো আর্মলের গোল ধরনের চশমা, কান জড়ানো সোনালি রঙের পাতলা ফ্রেম। মাথার চুল বারো আনাই পাকা। মাঝখানে সিঁথি। চুল পাতলা হয়ে গিয়েছে।

প্রসন্ননাথের পরনে ধুতি, গায়ে হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। একটা সুতির চাদর গায়ে আলগা করে জড়ানো। পায়ে চটি।

কমল আগে লক্ষ করেনি, এখন লক্ষ করল, বড় ম্যানেজারবাবু চাদরের আড়াল থেকে চুরুটের চামড়ার খাপ আর দেশলাই বার করে টেবিলে রাখলেন।

কমল আবার বলল, "আমার চিঠি পাননি ?"

"পেয়েছি।"

"ট্রেনটা বোধ হয় দেরি করে এল।"

"প্রায় তাই আসে।"

কমল এবার সামান্য বিরক্তভাবেই বলল, "আমি বোধ হয় বসতে পারি ?"

প্রসন্ননাথের যেন খেয়াল হয়নি এতক্ষণ। বললেন, "বসুন—বসুন। আমি খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। দেখছিলাম—।"

"আমাকে ?"

"অন্য কিছু দেখার মতন ঘরে কী আছে— !" বলে অর্জুনকে ইশারায় কাছে ডেকে গলা নামিয়ে কী যেন বললেন।

অর্জুন ঘব ছেড়ে চলে গেল।

প্রসন্ননাথ বললেন, "কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন ?"

"চিঠিতে আমার ঠিকানা ছিল।"

"ছিল নিশ্চয়, ভুলে গিয়েছি। বুড়ো মানুষ— !"

"ফার্ন রোড। বালিগঞ্জ।"

"কলকাতায় যাওয়া হয় না একরকম। আপনি বালিগঞ্জে থাকেন ? কে কে আছে বাড়িতে ?"

"কেউ নয়।...কেন আমার চিঠিতে... !"

"ছিল। সবই ছিল। মনে পড়ছে না !...আপনি কোনো অ্যাটর্নি, উকিল কিংবা ল'ইয়ারের পরামর্শ নিয়ে এসেছেন ?"

"না।"

"না— ! তা হলে ?"

"আমি ওঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে চাই।"

"ওঁর— ! মানে ?"

"শ্রীমতী বিদ্যা দেবীর সঙ্গে।"

প্রসন্ননাথ একটু চুপ করে থাকলেন। চুরুটের খাপটা নাড়লেন সামান্য। তারপর বললেন, "নব্বুই বছরের এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করার সময় এটা নয়। উনি অসুস্থ। চোখের দৃষ্টি এমনিতেই কমে গিয়েছে। এ-সময় কিছু দেখতে পান না, বলাই ভাল। তা ছাড়া, এখন ওঁকে ওষুধপত্র খাওয়ানো হচ্ছে। এরপর যদি কিছু খেতে চান খাবেন, নয়ত একেবারে চুপচাপ রাখা হবে। ঘুমোতে পারেন না, যতটা ঘুমের মতন রাখা যায়..."

কমল একটু ভাবল। "তা হলে আজ দেখা করা সম্ভব নয় ?"

"না।"

"কাল সকালে ?"

"হতে পারে। ন'টা দশটার পর।...আবার নাও হতে পাবে।"

"একটা কথা। আমি কিন্তু এখানে থাকতে চাই বলে চিঠিতে লিখেছিলাম। যদি তার ব্যবস্থা না হয়ে থাকে আমাকে একটা লোক দিন স্টেশনে পৌঁছে দেবে।"

প্রসন্ননাথ যেন একটু হাসলেন। বললেন, "অতিথিকে আমরা ফেরত পাঠাই না। আপনি এখানেই থাকবেন। আপনাব মালপত্র উঠিযে নিযে গিযে ঘবে বাখা হয়েছে।"

"ধন্যবাদ।"

কমল যেন উঠতেই যাচ্ছিল এমন সময দেখল, একটি মেয়ে এসে ঘবে ঢুকছে।

মেয়েটি ঘবে ঢুকে কমলকে দু'পলক দেখল মাত্র, তারপব প্রসন্ননাথের কাছে গিযে দাঁড়াল। "আমায ডেকেছেন. মেসোমশাই ?"

মাথা হেলিযে প্রসন্ননাথ বললেন, "হ্যাঁ। দিদিমামণি এখন কি শুযে পড়েছেন ?"

"ওষুধ খাওয়া শেষ কবে দুটো গ্লাস ভাঙলেন।"

"এ আর নতুন কথা কী!··কিছু খাবেন ?"

"জানি না। বোধ হয় ক'চামচে খইয়ের পায়েস।"

"তোমাকে জানিয়ে দি—" বলে প্রসন্ননাথ মুখ সবিযে ইশারায় কমলকুমারকে দেখালেন। বললেন, "ওই ভদ্রলোকের নাম কমলকুমার গুপ্ত। উনি কলকাতা থেকে আজ বিকেলের গাড়িতে এখানে এসে পৌঁছেছেন। এর আগে উনি চিঠি লিখেছিলেন আমাদেব কাছে। দিদিমামণিকে সে চিঠি পড়ে শোনানো হয়েছে। উনি জানেন। ভদ্রলোক কাল সকালে একবাব দিদিমামণির সঙ্গে দেখা করতে চান।"

মেয়েটি কমলকুমারের দিকে তাকাল।

প্রসন্ননাথ বললেন, "দিদিমামণির চান-টান শেষ হয়ে বারান্দায় বসতে বসতে ন'টা দশটা হয়ে যায়, তাই না ?"

"ওই রকম। শেফালিদি জানে। সবই তার হাতে আর মণির মরজি।"

"তুমি তাহলে কথা-টথা বলে কমলবাবুকে একবার দিদিমামণির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার চেষ্টা করো।" বলে প্রসন্ননাথ কমলের দিকে তাকালেন। "কাল

সকালে ও—আমাদের ময়নাই আপনাকে দিদিমামণির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। দায়িত্বটা ওর হাতেই দিলাম।"

ময়না। এই মেয়েটার নাম ময়না। কমলের মনে হল, এই মেয়েটির মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়ার মতন কিছু একটা রয়েছে ? কী সেটা ? গায়ের রঙ ময়লা, কালোই বলা যায় ; মুখের গড়ন ছোট কিন্তু ছড়ানো, অথচ নাক বাদ দিলে গাল থুতনি—সবই ধারালো। নাক মোটা। চোখ দুটো আকারে ছোট কিন্তু ঝকঝকে তীক্ষ্ণ। চতুর বলেই মনে হয়। কত বয়েস ? বোঝা মুশকিল। মাথায় খাটো। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত।

প্রসন্ননাথ কমলকে দেখছিলেন। কমল সেটা খেয়াল করেনি, বা করলেও গ্রাহ্য করেনি।

"উনি এখানে কোথায় থাকবেন একটু দেখিয়ে দাও। অর্জুনকে জিজ্ঞেস করো। ওঁর মালপত্র কোন ঘরে রাখা হয়েছে অর্জুন বলে দেবে।" প্রসন্ননাথ ময়নাকে বললেন।

কমল উঠে দাঁড়াল। সে বুঝতে পারছিল, প্রসন্ননাথ আর তাকে আটকে রাখতে চান না।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কমল তার ছড়িটা তুলে নিল।

চেয়ার সরিয়ে দু'পা এগুতেই প্রসন্ন বললেন, "ছড়ি নিয়ে হাঁটতে হয় ?"

কমল তাকাল। "বাঁ পা জখম।"

"ও !...অ্যাকসিডেন্ট ?"

"কপাল খারাপ।"

"ও-রকম ছড়ি কেন ? বেতের ছড়ি... ?"

"বেতের চেয়ে ভাল। নষ্ট হয় না। চলতি কথায় অ্যালুমিনিয়াম স্টিক বলে। আসলে এগুলো মজবুত। দেখতে ভাল, ব্যবহার করতে সুবিধে।"

"ও !...দেখতে বাস্তবিকই ভাল।...আচ্ছা।"

ময়না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আগেই।

কমল আর একবার দেখল প্রসন্ননাথকে তারপর বেরিয়ে এল।

এতক্ষণে একটা বাতি দেখা গেল গোল বারান্দায়। কাঠের উঁচু টুলের ওপর দাঁড় করানো। আলো কম ; অন্ধকার বেশি।

প্রসন্ননাথের ঘরেও আলোর অভাব ছিল। মানে যতটা আলো থাকলে আরও পরিষ্কার করে খুঁটিয়ে সব দেখা যেত, কমল দেখতে পায়নি। তার চোখ শহুরে আলোয় অভ্যস্ত। কেরোসিনের আলোয় নিজেকে অন্ধ অন্ধ মনে হয়। তবু রক্ষে, কমলের চোখে এক ধরনের কনট্যাক্ট লেন্স লাগানো আছে। বাইরে থেকে

বোঝার উপায় নেই। এই লেন্স সাধারণ বাজারি লেন্স থেকে আলাদা। এর সুবিধে হল, দৃষ্টিশক্তি আরও একটু উজ্জ্বল হয়; এমনকি ঝাপসা অন্ধকারেও স্বাভাবিক দৃষ্টির চেয়ে স্পষ্ট করে দেখা যায় খানিকটা।

ময়নার গায়ের শাড়ি প্রায় সাদাটে। পাড়ের রঙ ঘন। গায়ের জামা নীল। হাতে একটা লোহার সরু বালা। কানে ছোট ছোট দুটো ফুল। গলায় কিছু নেই।

ময়না সিঁড়ি উঠতে লাগল। পেছন দিকে তাকাল একবার।

"আপনি কলকাতা থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ,"—কমল বলল।

"আরও দুজন এসেছে।"

কমল সিঁড়ির ধাপেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ভীষণ অবাক যেন। "আরও দুজন?"

"একজন পাটনা থেকে", ময়না বলল। তার গলার স্বর নিচু। খানিকটা রহস্য আর কৌতুকে ভরা। "আর একজন কোন চা বাগান থেকে।"

কমল পা ওঠাতে পারছিল না। ময়না কি তাকে নিয়ে তামাশা করছে? না ঘাবড়ে দিতে চাইছে?

কমল নিজের ঘাবড়ে যাবার ভাবটা চাপা দেবার চেষ্টা করল। "কবে এসেছে?"

"পরশুর আগের দিন একজন। আর একজন গতকাল।"

সিঁড়ি উঠতে শুরু করল কমল। "আপনাদের দিদিমামণির সঙ্গে এদের দেখা হয়েছে?"

"না।"

"না!...কেন?"

"মণির মরজি। শরীর ভাল যাচ্ছে না। যখন মরজি হবে দেখা করবে।"

"তা হলে তো আমার সঙ্গে কাল দেখা নাও করতে পারেন?"

"পারে।"

"মুশকিল...! তা এ রকম চুপচাপ বসে থাকা...। বাকি দু'জন কোথায় রয়েছে?"

"এই বাড়িতেই।"

কমল যেন আবার বড় ধাক্কা খেল। দেখল ময়নাকে।

সিঁড়ি উঠতে উঠতে ময়না বলল, "ওরা একজন আছে উত্তরদিকের শেষ ঘরটায়। চা-বাগানের লোকটা রয়েছে একটা ঘর বাদ দিয়ে। আমার মনে হচ্ছে অর্জুন আপনার জন্যে দু'জনের ঘরের মাঝের ঘরটার ব্যবস্থা করেছে।"

বলতে বলতে দোতলায়।

বাইরে থেকে কমল বুঝতে পারেনি, আন্দাজ করতেও পারেনি—এই বাড়ির ভেতরের চেহারাটা কেমন হতে পারে। দোতলায় উঠে আন্দাজ করতে পারল। অনেকটা সেকেলে জমিদার বাড়ির মতন, ঘরের অভাব নেই, চওড়া বারান্দা, গলিঘুঁজি, এখানে-ওখানে প্যাসেজ, বড় বড় টুলের ওপর গোটা দুই লণ্ঠন বসানো। পুরনো বাড়ির গন্ধ। মাঝে মাঝে প্লাস্তারাখসা দেওয়াল, ফাটা মেঝে। কাঠের অব্যবহার্য কিছু আসবাব এখানে-ওখানে পড়ে আছে।

কমল বলল, "যারা আগে এসেছে তাদের নাম ? মানে, যদি জানা থাকে আপনার ?"

ময়না একটু দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ঘোরাল। স্পষ্ট করে তার চোখের ভাবটা বোঝা না গেলেও মনে হল, চাপা হাসি বা কৌতুক রয়েছে। বলল, "পাটনার লোকটার নাম নরেশ। চা-বাগানের ছোকরাটার নাম রথীন।"

"নরেশ কী ?"

"নরেশচন্দ্র মজুমদার।"

"রথীন তালুকদার নাকি ?" কমল ঠাট্টার গলায় বলল।

"রথীন পালিত।"

"আচ্ছা !...বয়েস ?"

"আপনার মতন ?" বলতে বলতে সামনের চওড়া বারান্দার পাশ দিয়ে একটা সরু প্যাসেজ ধরল ময়না।

কমল পেছন পেছন এগিয়ে এল।

"আমার বয়েস কত বলে মনে হয় আপনার ?" কমল বলল।

"আঠাশ থেকে তিরিশ।"

"কেমন করে বুঝলেন ?"

"অঙ্ক করে", ময়না যেন মজা করল।

কমল নিজেকে বোকা বোঝানোর চেষ্টা করল। ঠাট্টা করেই। বলল, "মেয়েদের বয়েস বোঝা যায় না। বলাও উচিত নয়। আমার আবার অঙ্কে মাথা নেই। তবু মনে হচ্ছে, আপনার বয়েস বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ।"

ময়না বলল, "চব্বিশ।"

কমলের চোখে পড়ল, সরু প্যাসেজের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট সরু মতন একটা টেবিলের ওপর কয়েকটা লণ্ঠন, টেবিল বাতি, ময়লা কালি মোছা কাপড়, টুকিটাকি আরও কী পড়ে আছে। বোঝা যায়, এই জায়গাটায় এদিককার আলো-টালো রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য একটিমাত্র ছাড়া অন্যগুলো জ্বলছে না। সাজানো আছে। দরকার পড়লে জ্বালানো হয়।

ময়না ডাকল, "অর্জুনদা ?"

প্রথমে সাড়াশব্দ নেই। বার দুই তিন ডাকার পর সাড়া পাওয়া গেল। অর্জুনের নয়, অন্য কারও।

বড় বারান্দার দিক থেকে বুড়ো মতন একজন এগিয়ে এল।

ময়না বলল, "পতিতদা !...এই ভদ্রলোকের মালপত্র কোন ঘরে রেখেছ ?"

"ছোট ঘরে।"

"বাতি দিয়েছ ?"

"দিয়েছি।"

"আচ্ছা, তুমি যাও।" বলে কমলকে ডাকল, "যা বলেছিলাম, আপনার জন্যে মাঝের ঘরটায়ই ব্যবস্থা হয়েছে।"

কমল ঠাট্টার গলায় বলল, "নরেশ আর রথীনের মাঝখানে।"

ময়না তাকাল। চোখে হয়ত ঠাট্টার জবাব ছিল। কিছু বলল না। দশ পনেরো পা এগিয়ে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। "এই ঘরটা আপনার।" বলে বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একটা জায়গা দেখাল। "চানটানের ব্যবস্থা ওখানে। জোড়া চানঘর।...আপনি কাপড়জামা বদলে হাত মুখ ধুয়ে নিন। চা জলখাবার পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

বন্ধ দরজার ওপর হাত রেখে কমল বলল, "আপনাদের অতিথি আপ্যায়নে কোনো খুঁত নেই।"

"খুঁত আমরা রাখি না। হুকুম নেই।"

"কার ?"

"মণির।"

দরজাটা হাতের ধাক্কায় খুলে দিল কমল। পুরো খুলল না। একটা পাল্লা প্রায় আধখোলা হয়ে থাকল ; অন্যটা হাট হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালানো হয়েছে। জোর করা হয়নি আলোর শিখা। কমল দেখল, তার হোল্ডঅল আর সুটকেশ নামানো রয়েছে। পাশে বেতের টুকরি।

ময়না চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

কমল বলল, "একটা কথা !"

তাকাল ময়না।

কমল প্রায় স্বাভাবিক গলায় বলল, "এই ঘরে কি আগে কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মারা গিয়েছে ?"

ময়না চমকে উঠল। থতমত খেয়ে কথা বলতে পারছিল না। শেষে বলল, "মানে ?"

"না, মানে—" কমল খানিকটা চাপা রহস্যের গলায় বলল, "আমার মধ্যে একটা ইন্‌টিউসন আছে। সার্টেন ফিলিং। বিপদের গন্ধ পাই। এই ঘরে গলায় ফাঁস..."

কথাটা শেষ করতে দিল না ময়না, "আমি জানি না।" বলতে বলতে সে আর দাঁড়াল না, চলে গেল। যেন পালিয়ে গেল।

ঘড়ি দেখল কমলকুমার। আটটা দশ।

এ-বাড়িতে সে এসেছে ঘণ্টা দুই হয়ে গেল। তার ঘর এখন গোছানো। সরু খাটে বিছানা পাতা হয়ে গিয়েছে। এক কোণে সুটকেস। বেতের টুকরিটা অন্য পাশে, আড়ালেই বলা যায়। ঘরের আলো যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছে কমলকুমার। বড় বড় দুটো জানলাই খোলা। গরাদ দেওয়া জানলা। কাচের শার্সি খড়খড়ি-করা পাল্লা বাইরে। অন্ধকার আর বড় বড় গাছের মাথার ওপর থিতিয়ে বসা কালোর ঘন ছায়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। মাঝে সাঝে গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশের তারা অবশ্য দেখা যায়।

এই রাত কিছু নয়। আট নয় এমনকি দশটা বেজে গেলেও মনে হয় না অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। কলকাতা এমনই শহর। এখন কলকাতায় যাও—বোঝাই মুশকিল রাত নেমেছে। আলো দেখে বুঝতে হবে। নয়ত বোঝা দায়। ট্রাম, বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি, মোটর সাইকেল ; গিজগিজ করছে লোক, শহরের মাটির তলা থেকে যেন গর্জন উঠছে। সমুদ্রে যেমন ঢেউয়ের গর্জন, কলকাতা শহরে সেই-রকম গাড়িঘোড়া, মানুষ, দোকান পশারের গর্জন।

এখানে অবশ্য এরই মধ্যে মনে হচ্ছে, অনেকটা রাত হয়ে গেল।

কমল একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। সিগারেটটা শেষ হবার পর টুকরোটা ফেলে দিল। বাইরে। ছোট্ট ঢেঁকুর উঠল। না, অতিথি সৎকারে এদের কৃপণতা নেই। জলখাবার ভালই দিয়েছিল। লুচি, বেগুনভাজা, আলুর দম, কিসের এক বরফি, পট্‌ ভরতি করে চা।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কমলের কোনো খুঁতখুঁতুনি নেই। একমাত্র যা আছে—সে মাংস খায় না। ডিম মাছ খায়। যদিও আজকাল আর মাছ খেতেও ভাল লাগছে না। হয়ত ছেড়ে দেবে।

কমল ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অলস ভাবেই। দুটো হাতই মাথার তলায়।

ছাদের দিকে স্বাভাবিকভাবেই চোখ পড়ল। কাঠের কড়ি বরগা। কড়ি বরগা

শুনতে শুনতে কমল লক্ষ করল এই বাড়িটায় ইলেকট্রিক আলো নেই, অথচ বরগার সঙ্গে লোহার হুক লাগানো আছে। পাকাপোক্ত হুক। একটা নয় এক জোড়া। কেন ?

দরজায় কে যেন টোকা মারল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর সামান্য জোরে।

কমল বিছানা ছেড়ে উঠল। সামান্য চলাফেরায় তার বোধহয় অসুবিধে হয় না। স্টিকটা নিল না।

"কে ?"

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছিল কমল। "কে ?"

"একবার খুলুন", আস্তে গলায় কেউ বলল বাইরে থেকে।

কমল দরজা খুলতেই যেন চোরের মতন একজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পড়েই নিজেই দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। কমল দরজা বন্ধ করে দিল।

লোকটা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধ পেয়েছিল কমল। হ্যাঁ, লোকটা মাতাল নয়, কিন্তু মদ খেয়েছে। তার মুখ সামান্য টসটসে, চোখ একটু লালচে, চকচকে। মুখে জরদা দেওয়া পান।

"আমার নাম নরেশ। নরেশ মজুমদার।"

আচ্ছা। এই তা হলে নরেশ মজুমদার। পাটনা থেকে এসেছে।

"আপনি ?"

"কমলকুমার গুপ্ত। কলকাতা থেকে এসেছি।"

"আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ঘুরতে ফিরতে। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে ! 'বোর' করছিল।"

কমল বুঝতে পারল, নরেশ মজুমদার সন্ধের ঝোঁকে নেশা করতে বেরিয়েছিল। পাকা নেশুড়ে। সূর্যের আলো ডুবলে নেশা বিহনে অন্ধকার দেখে। লোকটাকে চট করে দেখে পাকা নেশুড়ে মনে হয় না। এখন কমলের অন্যরকম লাগছে। কাঁচা নেশাখোরদের সে অনেক দেখেছে। পেটে দু' চামচ পড়তে না পড়তেই পা টলে, হাত পা সুতোকাটা ঘুড়ির মতন ডাইনে বাঁয়ে ভাগে, গোত্তা খায়। জিব জড়িয়ে আসে। এ পাকা নেশাখোর। জিব সামান্য মোটা হয়ে এলেও জড়িয়ে যায়নি, গলার স্বর ভাঙা নয়। হাত পা টলছে না বলা যায়।

নরেশ বলল, "আমি ওপরে উঠে আসছিলাম, সিঁড়িতে শেফালির ঝিয়ের সঙ্গে দেখা। সে বলল।"

শেফালি নাম কমল আগেই শুনেছে, বড় ম্যানেজারবাবুর ঘরে। পরিচয়ও শুনেছে। তবু এখন এমন ভাব করল যেন শেফালি নামটাই সে জানে না। "কে শেফালি ?"

"ওই নার্স মেয়েটা।" বলেই নরেশ যেন শুধরে নেবার মতন করে বলল, জোয়ানি মেয়ে।"

"নার্স ?"

"বুড়ির নার্সিং করে। সী ইজ্ এভরিথিং। সকাল থেকে বুড়িব সঙ্গে থাকে। নাওয়ানো, খাওয়ানো, বাথরুম নিয়ে যাওয়া, ওষুধপত্র দেওয়া, বুড়ির মেজাজ সামলানো, তাকে কানে কানে মন্ত্র দেওয়া—হোয়াট নট্ !"

"ও ! আমি জানি না।"

"বসি একটু। ডোন্ট মাইন্ড !"

"বসুন।"

নরেশ বিছানায় বসে পড়ল। সে যে পরপর পান-জরদা মুখে পুরেছে বোঝা যায়। পুরু ঠোঁট লাল। পানের রস ঠোঁটের তলায় ছড়িয়েছে। "আপনি ওই লোকটাকে মিট্ করেছেন ? লিলি গস্ ?"

কমল অবাক হয়ে বলল, "লিলি গস ? না ! কে সে ?"

নরেশ তার মুখের অদ্ভুত মজাদার এক ভঙ্গি করল, "লিলি গস…লিল্লি গস। ওই টি গার্ডেনের লোকটা। রথীনসাহেব।"

কমল এবার ধরতে পারল। রথীন পালিতের কথা বলছে নরেশচন্দ্র। কিন্তু লিলি গস্কেন ? নরেশ মজা করছে ? মাতালদের মজা ?

কমল হালকা গলায় বলল, "বথীন পালিত ?"

"দেখেছেন বেটাকে ?"

"না। কিন্তু উনি লিলি গস হবেন কেন ?"

"হি লুকস্ লাইক দ্যাট ! জেনানা চেহারা। ছেলে না মেয়ে বোঝার উপায় নেই। দুবলা বডি। চোখমুখ দেখলে মেয়ে মনে হবে। ভেরি ফাইন ফেস। টকটক করছে রঙ। মাথার চুলগুলো হোয়াইটিস। আপনাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি—ওর মাথার চুল দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এমন চুল আপনি কম দেখতে পাবেন। কালো, খয়েরি, লালচে—কোনোটাই নয়। সাদাটে। আমি একটা অ্যাংলো মেয়ের এই রকম চুল দেখেছিলাম। মোগলসরাইয়ে। রেলের গার্ডের বউ। তার নাম ছিল লিলি গস। গায়ের রঙ মশাই কালো, শুধু চুলগুলো সাদা। টেরিফিক দেখাত, মিস্টার। ব্রিডিংয়ের…।"

কমল এবার হেসে ফেলল।

নরেশ লোকটা মজার। সত্যি কি মজার ? না, মজার ভান করছে। ভাল করে নরেশচন্দ্রকে নজর করলে বোঝা যায়, লোকটা স্বাস্থ্যবান। পেটানো চেহারা। হাতের থাবা চওড়া, আঙুলগুলো ভোঁতা ধরনের। চওড়া কাঁধ। হ্যাঁ,

লোকটার গায়ে যে ক্ষমতা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুখের গড়ন তেকাটা। শক্ত নাক। কপাল ছোট। মাথার চুল ছোট, কোঁকড়ানো।

কমল এই ধরনের মানুষকে চট করে ধরে নিতে পারে না। হয়ত লোকটা নিজেকে যতটা ভাঁড়েব মতন দেখাবাব চেষ্টা করছে, আসলে স্বভাবে একবারেই উলটো।

কমল বলল, "আপনি পাটনায কোথায় থাকেন ?"

"পাটনায় আমি ঠিক থাকি না। মাস কয়েক আছি। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। আমি থাকি বেনাবসে। নাগোযা। গিয়েছেন বেনারসে ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি আর্টিজান ক্লাসের লোক, মিস্টার। হাতেকলমে আমার কাজ। মেকানিক। ট্রান্সফরমাব বোঝেন ? আমাব 'ডলসন' কোম্পানির যেখানে কাজ হয়—পাঠায। পাটনায একটা কাজ হচ্ছে—ক'জনকে পাঠিয়েছে। ট্রান্সফরমার বসাচ্ছি।"

"আপনি তাহলে কাজের লোক !" কমল পরিহাসের গলায় বলল।

"মজুর। লেবাব। আপার ক্লাস লেবার।...নসিব সাহেব। অল্ ইজ লাক্। আমি একবার নেভিতে ঢুকেছিলাম। আর্টিজান শালারা আমায় নিয়ে মজা করত। একদিন খুনোখুনি হয়ে গেল। আমায় স্যাক করে দিল।"

কমল যেন ভয় পাওয়ার গলা করে বলল, "কাউকে খুন করে ফেললেন নাকি ?"

"করতাম। গলা টিপে ধরেছিলাম ডেকের ওপর। শালা মরে যেত। তখন ট্রেনিং পিরিয়েড। আমায় ব্যাক্ শুট্ করে দিল !"

"ব্যাক শুট।"

"পেছনে লাথি।" বলে নরেশচন্দ্র পকেটে হাত ঢোকাল। সিগারেটের প্যাকেট লাইটার বার করল। "নিন—কড়া ব্র্যান্ড !"

কমল সিগারেট নিল।

নিজের সিগারেট নিয়ে নরেশ প্রথমে কমলের সিগারেট ধরিয়ে দিল। পরে নিজেরটা ধরাল। "নসিব, ভাগ্য—লাক আপনি জানেন ? মানেন আর না মানেন দেয়ার ইট ইজ—এ স্টার ইজ দেয়ার।" বলে নিজের কপাল দেখাল। "আপনাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি—এই যে বাড়িতে আমরা বসে আছি, ওই যে নব্বুই বছরের বুড়ি—আজ যাই কাল যাই করছে—এই বাড়ি ওই বুড়ির সমস্ত সম্পত্তির আমি ভাগিদার। কত লাখ টাকার সম্পত্তি বুড়ি রেখে যাচ্ছে—আপনি জানেন ?" বলে দু'হাত দিয়ে যেন একটা বড় পুঁটলি দেখাল, মানে বোঝাতে

চাইল—প্রচুর সম্পত্তি—বলল, "আমি বুড়ির সমস্ত সম্পত্তি পাব। ইনহেরিট করব। আমি ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না।"

কমল মুখে একটু হাসল। "যদি বুড়ি আপনাকে দেয় ?"

"ইয়েস—যদি দেয়।"

"আপনার দাবি যদি সত্যি হয় কেন পাবেন না ?"

"সত্যি কি মিথ্যে সেটা বুড়ির সঙ্গে কথা বলে বোঝাব। আমার মুঠোয় ঘোড়ার লাগাম আছে মিস্টাব। এ লট অফ হিস্ট্রি। কিন্তু দেখাই করতে পারছি না। বুড়ি সময় দিচ্ছে না।...আমি শেফালিকে ধরবার চেষ্টা করছি। সী ইজ এভরিথিং। ওর একটা ঝি আছে—ঝি আয়া—যাই বলুন—মেয়েটা শেফালিকে বুড়ির কাজকর্ম করার সময় হেল্প করে। আমি সেই সোর্সে একটা চান্স নিচ্ছি।"

"কী নাম মেয়েটার ?"

"নন্দা। কেন, আপনি চান্স নেবেন ?"

কমল মাথা নাড়ল। হাসল। "না।"

"আপনি পারবেন না। আমি ওর হাতে টাকা গুঁজে দিচ্ছি মিস্টার। দু'দিনে দুটো একশো টাকার নোট গিয়েছে। আরও যাবে। যাক, একটা হেস্তনেস্ত করে যাব।"

কমল ঠাট্টার গলায় বলল, "চেষ্টা কবে দেখুন।"

নরেশ উঠে দাঁড়াল হঠাৎ, উঠে দাঁড়িয়ে পাখির ডানা ছড়ানোর মতন দু'হাত দু'দিকে ছড়াল। "মেয়েছেলেবা যা পছন্দ করে আমাব আছে। অ্যানিমেল স্ট্রেংথ। শুধু টাকায় কাজ হয় না, তাদের নজরে লাগতে হয়। নন্দা মেয়েটা একটা গিলে-খাওয়া মেয়ে। মাদী মোষ। আমি ম্যানেজ করব।"

কমল ঠাট্টার গলায় বলল, "ভাল।"

নরেশ ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করল। "নাউ লেট আস টক ফ্র্যাঙ্কলি! আপনিও বুড়ির সম্পত্তি বাগাবার জন্যে এসেছেন ?"

"বাগাতে নয়, পেতে।"

"আপনার রাইট আছে পাবার ?"

"সেটা উনি বিচার করবেন। বিদ্যা দেবী।"

"উনিটুনি বাদ দিন। আমাকে বলুন ? আপনার কোন অধিকার কী সম্পত্তি পাবার ?"

"আপনাকে বলা আমার কাজ নয়।"

নরেশ এমন চোখ করে কমলকে দেখল, যেন অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে কলকাতার এই ল্যাংড়া লোকটাকে দেখছে। অবশ্য কমল যে ল্যাংড়া সেটা বোঝা যাচ্ছে না

চোখে। কিন্তু সে নন্দার কাছে শুনেছে—কমল ল্যাংড়া। কিছু ভাবল নরেশ। তারপর বলল, "ওয়েল, লেট আস বি জেন্টেলম্যান। ফ্রি ফর অল বলে এক রকমের কুস্তি মারপিট আছে, দেখেছেন ? আমরা সেই খেলাই খেলব। দেখা যাক—কে জেতে—আমি, আপনি না ওই লিলি গস ?"

কমল তার হাত বাড়িয়ে দিল। "ভদ্রলোকের খেলা খেলাই ভাল। আপনি যদি জেতেন জিতবেন। আমি কিছু মনে করব না। ডালভাত খাবার মতন ব্যবস্থা আমার আছে। আমি ফিরে যাব। যাবার আগে আপনাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করে যাব।"

নরেশ দু'পা এগিয়ে এসে কমলের বাড়ানো হাতে হাত ছোঁয়াল। তারপর হেসে বলল, "বড় নরম হাত।"

কমল বলল, "আমি ছবি আঁকি।"

"ছবি আঁকেন ? আর্টিস্ট ?"

"অ্যামেচার। শখের ছবি।"

নরেশ এমন এক মুখের ভাব করল যেন ব্যাপারটা তার মন্দ লাগছে না। মজার গলায় বলল, "আমি কোনোদিন ছবি-আঁকা লোক, আর্টিস্ট দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। আপনি কী ছবি আঁকেন ? মানুষ, রাম-সীতা, বেগার বয়, রাজকাপুর, বাঘ, বাঁদর..."

"ল্যান্ডস্কেপ। মাঠঘাট, আকাশ, মেঘ, নদী, গাছ..."

"মাই গড !...আঁকেন ছবি, সূর্য চাঁদ ডালিম ফল—আপনি কেন এখানে এলেন ?"

"আপনি যে-জন্যে এসেছেন !"

নরেশ তাকাল। দু'পলক দেখল কমলকে। "ও কে গুডনাইট।" দরজার দিকে পা বাড়াল নরেশ। দরজার ছিটকিনি খুলল। "চলি।"

নরেশ চলে যাবার পর কমল দবজা বন্ধ করল। ছিটকিনি তুলে দেবার পর দু'দণ্ড দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর কাঠের হুড়কো তুলে দিল জায়গা মতন।

কমল মনে মনে হাসছিল। সে শখের আর্টিস্ট। ল্যান্ডস্কেপ আঁকে ? তার হাতের আঙুল নরম, হাত নরম ?

আবার ঘড়ি দেখল কমল। প্রায় নয়। রাত্রের খাবার আসতে আসতে সাড়ে নয়। জানিয়ে গেছে পতিত। জলখাবার দিয়ে যাবার সময়। ঘরেই খাবার আসবে। হাতে একটু সময় আছে।

কমল ঘরের আলোটা দেখল। ছোট টেবিলের ওপর রাখা। হাত কয়েক

তফাতে একটা দেওয়াল-কুলঙ্গি।

বাতিটা তুলে নিয়ে একেবারে নিবুনিবু করে কুলঙ্গির মধ্যে রাখল। রেখে বিছানায় নয়, মাটিতে বসল। আসন করে।

পিঠ সোজা, মেরুদণ্ড টান টান, ঘাড় সোজা, হাত পা শক্ত নয়, শিথিল অথচ সরলভাবে রাখা।

কমলকুমার সামান্য সময় কুলঙ্গির মধ্যে রাখা বাতির আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। আলোর শিখা একেবারেই নিষ্প্রভ। ছোট মোমবাতির শিখার মতন। নিচে বসে থাকার জন্যে কমলকুমারকে ঘাড় উঁচু করতে হয়েছিল। এবার চোখ নামিয়ে ফেলল। এখন আর আলো দেখছিল না।

চোখের পাতা বন্ধ করল কমলকুমার। ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে লাগল।

মন এবং চোখের তলায় চঞ্চল দৃশ্যগুলিকে স্থির করানো যাচ্ছিল না। তারা যেন জলের তলায় খেলা করছিল। মাছের মতন। কখনও বা ময়লার মতন ভাসছিল। কমল আরও শান্ত হল, মনের চঞ্চলতা নষ্ট করার জন্যে একটি দু'টি চারটি শ্বেত বিন্দু কল্পনা করতে লাগল। চারটি বিন্দু চার কোণে, রেখা দিয়ে যোগ করলে চৌকোণো ঘর হবে।

ধীরে ধীরে মন স্থির হল। চারটি বিন্দু যেন ক্রমশ কাছে আসতে আসতে একটি মাত্র বিন্দুতে মিশে গেল। মিশে একটি ছোট্ট নক্ষত্রের মতন স্থির হয়ে থাকল। অনুজ্জ্বল নক্ষত্র।

তারপর কমল বুঝতে পারল, স্নায়ু এবং রক্তের মৃদু আলোড়ন অনুভব করছে। পুকুরে যেভাবে জল কাঁপে বাতাসে, ঢেউ নয়—শুধুই মৃদু কম্পন—সেই রকম অনেকটা। ক্রমশ স্নায়ু তীক্ষ্ণ, শক্ত হতে লাগল। যেন শরীরের তলা থেকে কোনো অদৃশ্য শক্তি তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যেতে লাগল। নিজের মধ্যে সেই অদ্ভুত শক্তি অনুভব করতে পারছিল এবার।

কমল তার ডান হাত মাটিতে ঠেকাল। আঙুলের ডগা শক্ত। হাড় শক্ত। প্রত্যেকটি আঙুল যেন লোহার মতন কঠিন শক্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। হাত কাঁধ পিঠও অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল। নিজেকে পশুর মতন লাগছিল।

কমল হাত ঝাড়ার মতন ডান হাতটা ঝাড়ল। বোঝাই যাচ্ছিল, তার আঙুলের ডগা,গাঁট, হাড় এখন ইস্পাতের চেয়ে শক্ত এবং ধারালো। এই হাত দিয়ে সে তিনটে নরেশকে চোখের পলকে খুন করতে পারে।

না, নরেশকে সে খুন করতে যাচ্ছে না। এখন অন্তত নয়। অকারণে নয়।

কমল ইচ্ছে করলে তার এই শক্তিকে আরও দু-তিনগুণ বাড়াতে পারে। পুরো শারীরিক ক্ষমতাকেই।

কমল যেন নিজের শরীরের মধ্যেকার কোনো লুকনো আশ্চর্য অস্বাভাবিক ক্ষমতাকে একবার উসকে দিল, যেমন করে বাতির শিষ আমরা উসকে দিই।

না, আর নয়। কোনো প্রয়োজন নেই। কমল নিজেকে স্বাভাবিক করতে লাগল।

বেশি সময় লাগল না।

সবই অভ্যাসের ব্যাপার।

অনেক কষ্ট করে কমলকে এটা শিখতে হয়েছে। দু-চার বছর নয়—আরও বেশি। প্রায় আট দশ বছর। এক যুগ।

মানুষের জীবন কী অদ্ভুত।

আজ থেকে প্রায় দু'যুগ আগের কথা। এই কমলকুমারকে তখন কেউ কমল বলেও ডাকত না। কেউ বলত, আবে শুয়োরের বাচ্চা কালুয়া, কেউ বলত—আবে কম্বলু, কেউ কামলা বলে ডাকত। ছেঁড়া প্যান্ট, যার আশেপাশে এমনকি পেছনেও তালিমারা থাকত। নোংরা ছেঁড়া ফাটা জামা কি গেঞ্জি, খালি পা, কালিঝুলি মাখা হাত-মুখ, রোগা টিকটিকির লেজের মতন চেহারা—একটা সাইকেলের দোকানে কাজ করত কমল। থাকত মায়ের সঙ্গে গাজিপাড়ার বস্তিতে। মা এ-বাড়ি সে-বাড়িতে বাসন মাজত, কাপড় কাচত, কখনো কখনো কোনো মাতাল মেয়েবাজ এসে মাকে জ্বালাত। লোকে বলত—কম্বলু, মানে কমল বেজন্মা। মা অন্য কথা বলত। কমল বিশ্বাস করতে পারত না। করত না। বস্তিতে শ্যামনাথ বলে একটা লোক পেশায় ছিল রাস্তার জ্যোতিষী। তেলক কেটে, গায়ে গেরুয়া জামা চাপিয়ে, পাখির ছোট খাঁচা, কতকগুলো পোস্ট কার্ডের মতন কার্ড, রঙচঙে লেখাপত্তর, চক খড়ি নিয়ে বসে বসে বিড়ি টানত আর দিনান্তে দু'একটাকা কামাত। লোকটা কমলকে ভালবাসত। তাকে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করে পাঁচ সাত ধাপ পার করিয়ে দিয়েছিল। মায় ফার্স্ট বুক।

একদিন শ্যামনাথ গাড়িচাপা পড়ে খোঁড়া হল। আর সেইদিনই সে জানতে পারল, তার মাকে এক বাবুর বাড়ির লোক থানায় ভরে দিয়েছে চোর বলে। কমলের মেজাজ ভাল ছিল না। কী করবে সে বুঝতে পারছিল না। এমন সময় সাইকেলের দোকানের মালিকের ভাগ্নে তাকে বিনা দোষে গালিগালাজ চড়চাপড় কষাতে লাগল। কমল খেপে গিয়ে মালিকের ভাগ্নেকে সাইকেলের চেন ছুঁড়ে মেরেছিল। তার ফলটা ভাল হয়নি। কমলকে রাস্তার কুকুরের মতন পেটাতে লাগল ভাগ্নে আর তার মামা।

এমন সময় একটা লোক তাকে বাঁচাল। লোকটা ঠিক যে কেমন, কমল তখন

বোঝেনি। দেখতে সাধু ফকিরের মতন। চোখমুখ দেখলে লামা কিংবা ভুটানি মনে হয়। লোকটা কমলকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যেখানে আশ্রয় দিল সেটা যেন কোনো ধর্মশালা।

পরের দিন লোকটা বলল, বেটা তুই আমার পা ছুঁয়ে বল, তুই কুত্তার মতন কাঁদবি না ; তুই মানুষের মতন লড়বি। তোকে আমি সব শেখাব। তোর মা তোর বাপ তোর কোথাও কেউ নেই। শুধু আমি আছি। আমি তোর বাপ, মা গুরু—তুই যদি আমার বাচ্চা হতে চাস—তোর সব ভার আমার। আর তুই যদি নিজের মতন থাকতে চাস—চলে যা।

কমল রাজি হয়ে গিয়েছিল। শুধু জানতে চেয়েছিল—তার মায়ের কী হবে!

"লোকটা বলেছিল, সে আমি বুঝব।"

এই মানুষটাই কমলকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে গড়ে তুলেছে। কলকাতায় নয় ; বাইরে। পালামৌর দিকে এক আশ্রমে।

কমলকে গরমে, বৃষ্টিতে, শীতে গাছের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানতে হয়েছে—শরীর কতখানি সহ্যক্ষমতা ধরে। কমলকে দিনের পর দিন অভ্যাস করে শিখতে হয়েছে, ভিসিকাবজ্র। স্নেহ যত্ন প্রেমের পাশাপাশি কমল যে কঠোরতা, ক্লেশ, নিগ্রহ নির্যাতন সহ্য করেছে আজ তা যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে শিখেছিল খানিকটা। ততদিনে তার মা মারা গিয়েছে। মা শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের আয়া হয়েছিল।

কমলকে বিশেষ একটা শিক্ষাই নয়, অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন 'একাজি'। হ্যাঁ, তাঁকে একাজি বলা হত। তাকে লেখাপড়াও শেখানো হয়েছিল।

একাজি মারা যাবার সময় কমলকে মুক্তি দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, "তুই ছ' আনা শিখেছিস, দশ আনা শিখিসনি। শোন বেটা জগতে তুই বিল্লি বান্দার কুত্তা হয়ে আসিসনি। তুই মানুষের বাচ্চা। তোর পাওনা বুঝে নিবি, যা তোর পাওনা নয়, নিবি না। আর জানবি, আকাশ না থাকলে যেমন বাজ চমকাতো না, তেমনি তোর মধ্যে যদি ধ্যান একাগ্রতা উদ্দেশ্য প্রতিজ্ঞা না থাকে তোর ভেতরকার শক্তি চমকাবে না।"

একাজি বড় অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। সন্ন্যাসীর মতন। কিন্তু বাইরের আচরণ সন্ন্যাসীর ধারে কাছেও যায় না। পোশাকে আলখাল্লা গোছের কমলা-গেরুয়া একটা জামা থাকত সেটা ঠিকই। তবে তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁর কোনো ধর্ম ছিল না। না হিন্দু, না মুসলমান, না ক্রিশ্চান। বৌদ্ধ? না বৌদ্ধও বলা যায় না। তবে একাজি বোধহয় কোনো প্রায়-লুপ্ত বৌদ্ধ প্রশাখার কোনো কোনো

জিনিস শিখেছিলেন।

একাজি অশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি চলতি ভাষা অল্প-স্বল্প জানতেন। সংস্কৃত ভাষাও। জেলে বসে—সাত আট বছর—জেলের মধ্যে থাকতে থাকতে তিনি নাকি জীবনের অনেক কিছু শিখেছিলেন। বলতেন, মানুষ চেনার সবচেয়ে ভাল জায়গা জেল। নরকের মধ্যে যে থাকে সে বোঝে, মানুষ সত্যিকারের কেমন জীব!

শক্তি কোথায় থাকে? শরীবে?

না বেটা, না। মানুষের শরীর হল তারের যন্ত্রের মতন। তার মধ্যে অনেক অনুভূতি আছে; ইন্দ্রিয় আছে পাঁচ, বোধ আছে ছয়, ছয় ঋতুর মতন। সূক্ষ্ম ঝঙ্কার আছে অনেক। যন্ত্রকে বাঁধতে হয়, যে স্বরসুর চাও সেই জায়গায় আঙুল ছোঁয়াতে হয়।

কমল আগে এসব বুঝতে পারত না। পরে কিছু কিছু বুঝেছে।

তার নরম আঙুল দেখে নরেশ তামাশা করল।

কমলও তামাশার জবাব দিয়েছে। বলেছে, সে ছবি আঁকে।

ছবি?

কমল ছবি আঁকা কিছুই জানে না। দু'চারটে লাইন টানতে পারে আঁকাবাঁকা। কে না পাবে! একটা বাচ্চাও পারে।

দরজায় শব্দ হল। কে যেন ধাক্কা মারছিল।

কমল উঠে পড়ল। বাতিটা কুলঙ্গি থেকে সরিয়ে টেবিলে রাখল। জোর করল শিখা।

কে এল? চা বাগানের রথীন পালিত? নরেশের কথায়, লিলি গস?

দরজায় ধাক্কা জোর হল।

সাড়া দিল কমল। "আসছি।"

রথীন অপেক্ষা করছিল। মাঝরাত পেরিয়ে গেল কখন, চারদিক এত নিঝুম নিস্তব্ধ যে, মনে হয় সময় প্রবাহ ছাড়া কিছু নেই এখানে। আর থমথমে অন্ধকার।

ঘরের জানলা পুরোপুরি খুলে রাখেনি রথীন। রাত বাড়ার পর থেকেই গা সিরসির করছিল। এখন হেমন্তকালের শেষ। গাছপালা, নির্জনতা, কুয়াশা—এই শুকনো শক্ত মাটি যেন আগেভাগেই শীতকে হালকা করে জড়িয়ে নিয়েছে।

রথীন তার ঘরের জানলা আধাআধি বন্ধ করার সময় কিছুক্ষণ অন্য একটা ঘরের জানলার দিকে তাকিয়েছিল। ঘরটা মুখোমুখি নয়। অনেকটা তফাতে।

রথীনের ঘর থেকে সরাসরি দাঁড়ালে দেখা যাবে না। জানলার বাঁদিকের পাট বন্ধ করে গরাদ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে তাকালে চোখে পড়বে ঘরটা। না, পুরোপুরি ঘর নয়, ঘরের একটা জানলার অংশমাত্র।

রথীন প্রথমটায় কিছু দেখতে পায়নি। ভেবেছিল পাবে না। ঘড়িতে তখন সাড়ে দশ। কাঁটায় কাঁটায়।

সামান্য পরে রথীন যা দেখার আশা করছিল দেখতে পেল। কেউ যেন ঘরে মুহূর্তের জন্যে আলো জ্বালল ; জ্বেলেই নিবিয়ে ফেলল। দেশলাইয়ের একটা কাঠি ফস্ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেলে যেমন হয়—তেমনই। অবিকল।

একবার মাত্রই জ্বলেছিল, আর নয়।

রথীন হয়ত এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ত, শুধু ওই আলোটুকুর জন্যেই জেগে আছে। বারোটাব আগে নয় সে জানত। মাঝরাতের পর। কিন্তু কখন ? রাত একটায়, দেড়টায়, না আরও পরে, রাত দুটোয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই রথীন দরজার দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছিল। তার কান পড়েছিল ঘরের দরজায়।

অনেকক্ষণ থেকেই হাই উঠছিল। আবাব হাই উঠল।

রথীন প্রায় যখন হতাশ, ক্লান্ত, হয়ত খানিকটা বিরক্ত, তার চোখে পড়ল, ঘরের দরজার তলায় ফাঁকটুকুব কাছে পলকেব জন্যে আলো জলল। জ্বলেই নিবে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রথীন। দরজাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে দরজার ছিটকিনি খুলল। হুড়কোটা সে লাগায়নি।

দরজা খোলামাত্র কালো চাদরে মাথা মুখ ঢাকা কে যেন ঘরে ঢুকে পড়ল। একটি মেয়ে।

রথীন দরজা বন্ধ করল।

হাতের ছোট টর্চের কাচের ওপর বাঁহাত চাপা দিয়ে, যেন আলো না ঠিকরে ওঠে, একবার মাত্র আলো জ্বালিয়ে বথীনকে দেখে নিল যুবতী মেয়েটি। দেখেই টর্চ নিবিয়ে দিল।

"জানলাটা পুরো বন্ধ করে দাও। শব্দ না হয়। সামলে।" এত মৃদু গলায় বলল মেয়েটি যেন কানে কানে কথা বলছে। নিঃশ্বাসের শব্দের মতনই শোনাল।

রথীন জানলা বন্ধ করল। তার ঘরে একটি মাত্র জানলা। কোণাচে ঘর। কোণাচে ঘর বলেই বোধহয় ঝুল বারান্দা আছে এক ফালি। বারান্দা-ছোঁয়া দরজাও। সেটা বন্ধ ছিল।

মাথা থেকে চাদর সরালো মেয়েটি। গায়ের শাড়িটা বোধহয় খয়েরি রঙের। অন্ধকারে সবই কালো দেখায়। দেখাই যায় না মেয়েটিকে।

বিছানায় বসল মেয়েটি। একটু চুপচাপ।

রথীন বলল, "আমি ভাবলাম, তুই আর আসতে পারবি না, পার্বতী।"

"আস্তে", মেয়েটি ধমকে উঠল যেন। "দেওয়ালেরও কান আছে।"

রথীন সাবধান হল।

"এখানে বসো।" মেয়েটি ডাকল।

রথীন মেয়েটির পাশে বসল। গা ঘেঁষে।

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপব রথীনের হাত ধবে ফেলল। ফেলে নিজের বুকের কাছে টেনে নিল। নিয়ে বসে থাকল। মুখ নামিয়ে রথীনের হাতের গন্ধ শুঁকছিল যেন, নিজের ঠোঁটে ঠেকাল। "তোমার হাতের গন্ধ কেমন হয়ে গিয়েছে। আগে অন্যরকম গন্ধ ছিল।"

রথীন বলল, "আজ ক'বছর চা-বাগানে। তুই আমায় শেষ দেখেছিস প্রায় দু-বছর হতে চলল। কলকাতায়। কাশীপুবে।...কত দিন হয়ে গেল ভেবে দেখ।"

পার্বতী ততক্ষণে তার ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়েছে। রথীনের আঙুল ঠোঁটের ওপর ঘষতে ঘষতে পার্বতী বলল, "দুই কেন, বারো বছর হলেও আমি এই বাড়িতে তোমার জন্যে বসে থাকতাম।"

"তোর খুব কষ্ট হয়?"

"কষ্ট! না। পেটে খেলে পিঠে সয়। এই কষ্ট আর কিসের কষ্ট। ভাল বাড়িতে থাকি, ভাল খাই। পুরু বিছানায় শুই।" পার্বতী একটু থামল। রথীনের হাত নিজের বুকের ওপর থেকে সরিয়ে মুখের ওপর ধরল, যেন রথীনের হাতের তালুতে মুখ ঢাকল। সামান্য পরে বলল, "কষ্টের কথা তুমি কেমন করে বলো! কত কষ্ট জন্ম থেকে সইতে হয়েছে তুমি জানো না!"

রথীন বলল, "জানি। আমি অন্যভাবে বলেছিলাম।"

পার্বতী বলল, "এখানে আমার সুখের কাজ। বড় ম্যানেজার বাবুব কাজের মেয়ে। ঘর সামলানো, রান্নাবান্না, বিছানা ঝাড়া, ফাই ফরমাস খাটা। রাঁধুনি, ঝি—যা বলো।"

"তোকে তো ম্যানেজার ভালই বাসে?"

"তা হয়ত বাসে খানিকটা। বউ মেয়ে মারা গেছে বলেই হবে। ভালবাসলেও অন্ধ নয়। মানুষটার দশটা চোখ।"

"বউ মারা গেছে। মেয়ে তো..."

পার্বতী রথীনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এক একরকম শুনি। কেউ বলে, মারাই গিয়েছে, কেউ বলে হারিয়ে গিয়েছিল। আবার শুনেছি, মেয়ে নিজেই মরেছে।"

রথীন কিছু যেন ভাবল, মনে করল। বলল, "অত কম বয়সে কেউ মরে ?"

"কী কবে বলব। আমারও তো এক সময় মনে হত হয় গলায় দড়ি দিই, না হয় বিষ খেয়ে মরি। তখন আমার ওই রকম বয়েস, পনেরো ষোলোই ছিল।"

রথীন পার্বতীর মাথায় হাত বোলাতে লাগল আদর করে, "জানি। এখন ও-সব ভুলে যা।"

সামান্য চুপ করে থেকে পার্বতী বলল, "আমি তোমায় যেসব চিঠি দিয়েছি সেগুলো কি সঙ্গে কবে বয়ে এনেছ ?"

"না। আমার কি মাথা খাবাপ !"

"ভাল করেছ !...ধরা ছোঁযার মধ্যে থাকবে না এখন।"

"বড় ম্যানেজারবাবু তোকে কিছু বলে না ?"

পার্বতী মাথা নাড়ল। না, বলে না।

"তুই বলাতে পারলি না এতদিনে ?"

"চেষ্টা কবেছি," মাথা নাডল, পার্বতী আবার, বলল, "পারিনি। বড় শক্ত মানুষ। কথা কম বলে।" একটু থেমে বথীনের হাতের আঙুল নিজর কপালে ঠেকিয়ে রাখল। বলল, "আমি যদি যাই ডালে ডালে ও যায় পাতায় পাতায়। ...দেখো খোকনদা, এই বাড়ি, ওই বুড়ি—চিতেয় ওঠার জন্যে যে মাগী পা বাড়িয়ে বসে আছে, বুড়ির চাবিকাঠি যার হাতে—ওই শেফালিদি, বড় ম্যানেজারবাবু, ময়না—সবার মধ্যে এক গোলমাল আছে। কিসের গোলমাল আমি জানি না। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, সম্পত্তি, যখের ধন আগলে বসে থাকলে—এই রকমই হয় হয়ত। আমি বুঝতে পারি না। এখানে এক সাপের কুণ্ডলি।"

রথীন বলল, "বুঝতেই পারি।"

পার্বতী বলল, "আমার এখন ভয় করে খোকনদা !...তখন এত বুঝিনি।"

"ভয় করে কেন ?"

"যদি ধরা পড়ে যাই। তুমিও কি সত্যি এসব দাবি করতে পারবে ?" পার্বতী রথীনকে শক্ত করে ধরে বসে থাকল।

রথীন বলল, "পারব। না পারলে শেষমেষ তোকে এখানে আসতে বলতাম না। তোর দাম আমার কাছে কম নয় পার্বতী।"

পার্বতী রথীনের গালে ঠোঁটে আলগা চুমু খেল। "আমি চলি।...শোনো,

এভাবে আসতে পারব না রোজরোজ। বিপদে পড়ে যাব। ধরা পড়ব।...ওই জামগাছটার তলায় আজ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে—সন্ধেবেলায় দাঁড়িয়ে থেকো। আমার কিছু বলার থাকলে জানিয়ে যাব।" বলে পার্বতী উঠে দাঁড়াল। জামার তলায় হাত ডুবিয়ে দু-টুকরো কাগজ বার করল; গুঁজে দিল রথীনের হাতে।

মাথা ঢাকতে ঢাকতে পার্বতী বলল, "সাবধানে থাকবে।...আজ একটা ল্যাংড়া লোক এসেছে কলকাতা থেকে। দেখেছ?"

"আড়াল থেকে দেখেছি। পাশের ঘরেই আছে।"

"আমি যাই।" পার্বতী দরজার দিকে পা বাড়াল। এসেছিল ছায়ার মতন, চলেও গেল ছায়ার মতনই।

দরজা বন্ধ করল রথীন। ছিটকিনি তুলে দিয়ে দরজার হুড়কোও লাগিয়ে দিল। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল না। ভাবতে লাগল।

নিজের জীবনের কথা ভাবলে রথীনের মনে হয়, হিন্দি সিনেমার গল্পও তার জীবনের কাছে হার মেনে যায়। সত্যি মানুষের জীবনের গল্প আসল গল্পকেও হার মানায়।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই রথীন কোনোদিন নিজের বাবাকে দেখেনি। মাকে দেখেছে। মা যে-বাড়িতে থাকত সেই বাড়ির কর্তাকে মা মামাবাবু বলত। তিনি ছিলেন ডাক্তার। মোটামুটি পশার ছিল তাঁর। সন্তানাদি ছিল না। ডাক্তারদাদুর স্ত্রী, দিদিমা, গোড়াতে সাধারণ মানুষের মতনই ছিল পরে মাথার গোলমাল দেখা দেয়, শেষে পাগল হয়ে গেল দিদিমা। বাধ্য হয়ে তাকে পাগলা হাসপাতালে পাঠাতে হল দাদুকে। দিদিমা সেখানেই মারা গেল।

ভদ্র বাড়িতে, ভদ্র পরিবেশে রথীন মানুষ হয়েছে কিছুকাল। ডাক্তারদাদু মাকে নার্সেস ট্রেনিংয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মা পরপর ক'টা ট্রেনিং নিয়ে কলকাতার এক হাসপাতালে কাজ করত।

তারপর কোথায় কী ঘটে গেল অজান্তে, দিদিমা পাগল হল, দাদুর মতন মানুষ যেন নিজেকে ভোলাতে, নিত্যদিনের দুঃখযন্ত্রণা ভুলতে নেশার পথ ধরল। আগে শুরু করেছিল রাত্রে মদ্যপান। তার মাত্রা বাড়তে লাগল। মাতাল হয়ে উঠতে লাগল দাদু। আর দিদিমা বদ্ধ উন্মাদ।

দিদিমাকে পাগলা হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিয়ে আসার পর দাদু কিসের ইনজেকশন নিতে শুরু করল। মানুষটাকে দেখলে মনে হত, রুগ্ন, ক্লান্ত, অসুস্থ—বেশিরভাগ সময়েই যেন আচ্ছন্ন রয়েছে। দিদিমা মারা গেল।

এই সময় দাদু—যার বয়েস তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে—কোনো কিছু না

জানিয়ে একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে বসল। সম্পর্কে নাকি দাদুর শালী সেই মহিলার বয়েস হয়েছিল। বড় রুক্ষ, অসভ্য গোছের মহিলা। মাকে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে।

রথীন ঠিক জানে না, কেন—কী কারণে—মা এই সময় কলকাতার এক মিশনারি হাসপাতালে কাজ নিল। চার্চের পয়সায় হাসপাতালটা চলত। ছোট হাসপাতাল। মা যে এই সময় খ্রিশ্চান ধর্ম নিল, বিয়ে করল এক খ্রিশ্চান মাঝবয়সী ভদ্রলোককে, এটা রথীনের কাছে মা লুকোয়নি। আর তখন থেকে রথীন হল মা-ছাড়া হোস্টেলবাসী। তার বয়েস তখন পনেরো ষোলো। রথীনকে তার মা কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিল। মিশনারি স্কুলে, হোস্টেলে।

রথীন সবে কলেজে ঢুকেছে, এমন সময় তার মা পড়ল অসুখে। দু-মাস, চার-ছ'মাস—মা আর সেরে উঠল না। মারা গেল। মারা যাবার আগেই মা রথীনকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আর মারা যাবার দিন দুই তিন আগে—একটা খাতা তার হাতে তুলে দিল। খুব সম্ভব মা সদ্য এ-সব লিখতে শুরু করেছিল—মারা যাবে ভেবে নিয়েই। মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, রথীন যেন এই খাতা আগে না পড়ে। মা মারা যাবার পর পড়বে।

রথীন সেই প্রতিজ্ঞা রেখেছিল।

মা আরও একটা কথা আদায় করিয়ে নিয়েছিল, বলেছিল—পরের দান আর ভিক্ষে নিয়ে মানুষ হবার চেষ্টা করবে না কখনো। ভিক্ষের রুটিতে পেট ভরে, তবে সে-রুটিতে দয়ার নামে তাচ্ছিল্য থাকে। এই জগতে প্রেমের দান করতে শিখেছে লাখে একজন। তুমি দয়া, অনুগ্রহ নেবে না। তোমার সমস্ত কিছু ছোট নোংরা হয়ে যাবে। নিজের পরিশ্রম, বুদ্ধি, বিবেচনা দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। ঈশ্বর তোমায় দেখবেন। লেখাপড়া না শিখেও পেটের রুটি জোগাড় করা যায়।

মা মারা গেল।

রথীন তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি। মা মারা যাবার পর মায়ের দেওয়া সেই খাতা সে পড়ল। পড়ে বুঝতে পারল, তার এবং মায়ের অতীতের তলায় কী লুকিয়ে আছে। সেই অতীতের কাহিনীতে মায়ের স্বীকারোক্তি যতটা ছিল, ততটাই ছিল অগৌরব। তবু অন্য কিছুও ছিল। স্বপ্নকথার মতন। রথীন বিশ্বাস করতে পারত না।

কিন্তু তখন অতীত নিয়ে মাথা চাপড়ানোর সময় নয়, সুযোগও নেই। তাছাড়া মাঝে মাঝে ফাঁক, কয়েকটা পাতা হারিয়ে যাওয়া। তিরিশ চল্লিশটা এলোমেলো লেখা পাতার কী দাম। তার সত্য মিথ্যে কে যাচাই করবে।

রথীনের তখন বয়েসই বা কী! বছর উনিশ কুড়ি। সে লেখাপড়া ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এসে পেটের ধান্ধায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে যে কী কষ্ট, কী নোংরামির জীবন বোঝানো যায় না। রথীন কিছুদিন ট্যাক্সি ড্রাইভারি করেছে, প্রাইভেট গাড়ি চালিয়েছে। এই সময় পার্বতীর সঙ্গে তার ভাবসাব হয়। একই জায়গায় পাড়ায় থাকত। কলোনিতে। সিঁথির দিকে।

রথীন যখন এক বাবুর ভাড়া-খাটা গাড়ি চালাত—তখন তার সঙ্গে এক যাত্রাদলের দু-নম্বর হিরোর আলাপ হয়। রথীন ভাড়া-খাটা গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে কুন্দনবাবুকে এখানে ওখানে বয়ে বেড়াত। লোকটির মন-মেজাজ ভাল। রথীনকে স্নেহ করতেন।

একদিন রথীন মুখ ফুটে পার্বতীর কথা বলে ফেলল। পার্বতীর তখন ভীষণ অবস্থা। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের মতন সদ্য তরুণী পার্বতীর বস্ত্র হরণের জন্যে অনেকগুলো হাত চারদিক থেকে এগিয়ে রয়েছে।

কুন্দনবাবু বড়ির নেশায় ছিলেন। বললেন, "শালা, তুই নিজের কথা বল। তোর এমন লালু চেহারা। তুই শালা নিজে গাইতে নাম . দু-বছরে ফেনটুস হয়ে যাবি। মেয়েছেলে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন!"

রথীন বলল, "কুন্দনদা, আপনি না বাঁচালে মেয়েটা মরবে।"

"তুই নিজে বেঁচে আছিস?"

"আমার কথা ছাড়ুন। আমি একদিন রাজপুত্তুর হব। বরাত খুললে।"

"আমার ইয়ে হবি শালা।...মেয়েটাকে তুই ভালবাসিস?"

"জানি না।"

"মেয়েছেলেকে ভালবাসবি না। মরবি।...নদীর দ আর মেয়েছেলের ভ এক জিনিস। যাক্ আনিস মেয়েটাকে—ঢুকিয়ে দেব। তবে এ-লাইন ভাল নয়, রথীন। তুই নিজের পাঁঠায় নিজে কোপ বসাচ্ছিস।"

কুন্দনদা পার্বতীকে যাত্রার দলে ঢুকিয়ে দিলেন।

তারপর একদিন রথীন কুন্দনদাকে তার মায়ের লেখার কথা বলেছিল।

কুন্দনদা চমকে উঠেছিলেন। বিশ্বাস করতে চাননি। পরে যখন খানিকটা বিশ্বাস করলেন, বললেন, "তুই তোর হক ছাড়বি না। দাঁড়া, আমি তোকে উকিল ঠিক করে দেব।"

উকিল ঠিক হবার আগে কুন্দনদা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন। রথীনের গাড়ি নয়, সে তখন জ্বরে কাবু হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। শ্রীপতী ভাড়ার গাড়ি চালাচ্ছিল। মেদিনীপুরের দিকে পালা গাইতে যাচ্ছিল কুন্দনদারা। লরির ধাক্কায় কুন্দনদাদের গাড়ি ব্যাঙ চ্যাপ্টা। কুন্দনদা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন, মারা গেল

লক্ষ্মীবাবু। শ্রীপতী মারা গেল হাসপাতালে।

পেট ভরাবার জন্যে বছর দুই রথীন ভাড়ার গাড়ি নিয়ে খেটেছে, ট্যাক্সি চালিয়েছে। শেষে ছেড়ে দিল। ভাল লাগছিল না আর। কিছু না হোক কলেজেও তো সে ঢুকেছিল, মাথায় গোবর পোরা নেই। রথীন ছোট ছোট কোর্স পড়তে লাগল ফাঁকে ফাঁকে। টাইপ করা শিখলো, টেলিগ্রাফের খটা-খটা-খট শিখলো, এমনকি রেডিয়োর কাজকর্ম।

এক ভদ্রলোককে একবার জোর বাঁচিয়ে দিয়েছিল রথীন। বৃদ্ধ মানুষ। দমদম স্টেশনের কাছে। রেলে কাটা পড়তেন আর একটু হলে। রথীন তাঁকে সময় মতন সরিয়ে নিতে পারায় উনি বেঁচে গেলেন।

ভদ্রলোক যেন কৃতজ্ঞতাবশে রথীনকে পাঠিয়ে দিলেন চা বাগানে। সেখানে তাঁর জামাই অফিসের হেড ক্লার্ক। বড়বাবু রথীনকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। কেরানির কাজ।

রথীন বছর কয়েক চুপচাপই ছিল। মায়ের লেখা কাগজগুলো কাছে থাকলেও সে কোনদিনই ভাবতে পারেনি কোনো ধনসম্পত্তির দাবিদার সে হতে পারে। কুন্দনবাবু বেঁচে থাকলে কী হত বলা যায় না। শেট পর্যন্ত চা বাগানে থাকার সময় সে একদিন কাগজে এক সম্পত্তিঘটিত নোটিশ দেখে। দেখে অবাক হয়ে যায়। কী আশ্চর্য, এই সম্পত্তির সে না দাবিদার! তবে?

দাবিদার হওয়া এক, আর দাবি প্রতিষ্ঠা করা, আদায় করা অন্য। মায়ের লেখা হাতে করে সটান সেই বাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালে কেউ তাকে 'এসো এসো' বলে ডাকবে না। ছিঁড়ে যাওয়া পুঁতির মালার মতন তার অনেক পুঁতি যে খোওয়া গিয়েছে। দাবিদার হতে গেলে আরও কিছু প্রমাণ দরকার। সত্যি-মিথ্যে যাচাই দরকার। হাত শক্ত না করে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না।

রথীন অনেক ভাবল। কোনো দিশে খুঁজে পাচ্ছিল না।

কলকাতায় এসেছিল পাকা উকিল-টুকিল ধরবে বলে। বা ধরার চেষ্টা করতে। পরামর্শ নিতে।

পার্বতী কোনোদিনই রথীনের জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানত না। রথীন বলেনি। কিছু অবশ্য জানত। সম্পত্তির ব্যাপার জানত না।

রথীন পার্বতীকেই বলল সব। বলে ফেলল। হয়ত আবেগের বশে।

তারপর কী যে হল কে জানে। আচমকা ছেলেমানুষের মতন পার্বতী নিজেই বলল, সে যদি একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে ও-বাড়িতে গিয়ে ঢোকে—কেমন হয়! ও-বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে পারলে সে অনেক কিছু জানতে পারবে। চেষ্টা করবে জানবার।

কথাটা প্রথমে কানে তোলেনি রথীন। পাগলামি, ছেলেমানুষি!

কিন্তু এক ফোঁটা ভয়ংকর বিষ যেমন ধীরে ধীরে তার বিষের ক্রিয়া ছড়িয়ে দেয়—সেই রকম পার্বতীর কথাটা রথীনকে ক্রমশই অস্থির করে তুলতে লাগল। পার্বতীও তখন যাত্রার দল ছেড়ে দিয়েছে। তার পক্ষেও কলকাতা ছেড়ে সরে থাকাই ভাল। একটা দুটো গুণ্ডা ক্লাসের লোক তার পেছনে লেগে আছে সারাক্ষণ।

রথীন মনঃস্থির করে ফেলল। পার্বতীকে বলল, "তুই পারবি?"

"পারব।"

"কলকাতার বাইরে যেতে হবে। মহুয়াটাঁড় দু শো আড়াই শো মাইল মতন হবে।"

পার্বতী যাত্রাদলের সঙ্গে কোলিয়ারি, কারখানা শহর, গাঁগঞ্জ, রেলশহর—কোথায় না ঘুরেছে। চা বাগানেও গিয়েছে। বলল, 'আমি ওদিকে গিয়েছি। আমার ঘোরাঘুরি তোমার চেয়েও বেশি।'

"তা না হয় হল। যাবি কী বলে? তোকে যদি ও-বাড়িতে ঢুকতে না দেয়।"

"বড়লোকের বাড়িতে ঝি দাসদাসী পোষে। আমায় পুষবে। চেষ্টা করে দেখতে হবে। পা ছড়িয়ে বসে থাকলে কি চলবে?"

"তবু ধরে নে, তোকে কোনো চাকরি দিল না!"

"খোকনদা, তুমি বোকার বোকা। ও-বাড়িতে না দেয় ওখানকার অন্য বাড়িতে পাব। আমি মেয়েছেলে, বাইশ তেইশ বয়েস, যাত্রার দলে অ্যাক্টিং শিখেছি।"

রথীন বলল, "বেশ। কিন্তু তোর যদি কোনো বিপদ হয়?"

"তেমন হলে মরব। না হলে আমি ছুঁচ হয়ে ও বাড়িতে ঠিকই ঢুকে পড়ব।"

"তা হলে—যা তুই; দেখ কী হয়।"

"আমি কথা দিচ্ছি, আমি তোমায় ঠকাবো না। কিন্তু তুমি আমায় কথা দাও, তুমি আমায় ঠকাবে না।"

"ঠকাবো না।"

"মাথায় হাত দিয়ে বলো।"

রথীন পার্বতীর মাথায় হাত দিল। দেবার সময় তার হাত একটু কাঁপল। সে বলতে পারল না, চা বাগানে যাবার পর রথীন আর পুরোপুরি আগের মানুষ নেই। তার ভেতরের অনেকটাই পালটে গিয়েছে। না, সে চোর জোচ্চর লম্পট হয়নি। তবে তার আর একজনকে ভাল লাগতে শুরু করেছে।

পার্বতী বাহাদুর মেয়ে। মুখে যা বলেছিল কাজেও তাই করল। তবে

এ-বাড়িতে পাকাপোক্তভাবে ঢুকতে তার মাস দুই তিন সময় লেগেছিল।

কথামতন পার্বতী মাস কি দু-মাসে একটা করে চিঠি লিখত রথীনকে, চা বাগানে। খবর জানাত।

এখন যে রথীন এসেছে সেটাও পার্বতীর কথায়। রথীন জানতই না, এই বাড়ির বুড়ির তরফে হালে নতুন করে কাগজে আইনমাফিক নোটিশ ছাপা হয়েছে—সম্পত্তিগত ব্যাপারে কোনো নিকট বা দূর আত্মীয়ের কোনো দাবি থাকলে, সশরীরে এসে বা আইনমাফিক তা পেশ করতে।

পার্বতী চিঠিতে লিখেছিল, কাগজে একই রকম নোটিশ ছাপা হলে লোকও দু একজন আসে। তারা জুয়াচোর, ঠগ্। এরা সবাই ফিরে যেতেও পারে না। মারা যায়। এই বাড়িতেই। তুমি সাবধান হয়ে এসো।

সাবধান হয়েই এসেছে রথীন। চোরাই পিস্তল নিয়ে এসেছে। কিনতে হয়েছে পিস্তল। অনেকগুলো টাকা গিয়েছে তার। যার কাছ থেকে কেনা—সে রথীনকে পিস্তল ছুঁড়তে শিখিয়ে দিয়েছিল অবশ্য। কিন্তু রথীন নিশানা ঠিক রাখতে পারে না।

না পারুক। পিস্তল থাকার দরুন তার সাহস তো বেড়েছে।

এখন দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল শেফালির।

শাড়ি জামা পাল্টে চুল আঁচড়ে নিচ্ছিল সে, ময়না ঘরে এল।

"শেফালিদি ?"

শেফালি ঘাড় ঘোরাল না। চিরুনিতে চুল জড়িয়েছে অনেক। এখন এই সময়টায় বড় চুল ওঠে তার। কেন কে জানে! চিরুনি পরিষ্কার করে নিতে নিতে শেফালি বলল, "বলো ?"

"মসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দিদিমামণিকে আজ কিছু বলবে ?"

"কিসের ?"

"যারা এসেছে তাদের কথা ?"

"কতবার বলব ?"

"কাল যে-ভদ্রলোক এল সন্ধেবেলায় ?"

"না। তার কথা বলিনি। সময় ছিল না। রাত্তিরে ওঁর কাছে এ-সব কথা বলা যায় না।"

"ভদ্রলোক বলেছেন, আজ সকালে দিদিমামণির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।"

শেফালি ঘুরে দাঁড়াল। দেখল ময়নাকে। বলল, "কেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের ? এসেছে কাল সন্ধেবেলায়—আজ সকালেই তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে দিদিমার ? ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে এসেছে ?"

ময়না কোনো জবাব দিল না।

শেফালিকে ময়না পছন্দ করে না। করে না অনেক কারণে। শেফালির এই কর্তৃত্ব তার পছন্দ নয়। এ-বাড়ির সে কে ? কেউ নয়। দিদিমামণির দেখাশোনার কাজ তার। সে একজন নার্স। হ্যাঁ—অনেক দিন আছে, বছর চার পাঁচ। কিন্তু তাতে কী ? ময়নাও তো এ-বাড়িতে কম দিন নেই ! বলতে গেলে এক যুগ। শেফালিদির ব্যবহাব থেকে মনে হয়, দিদিমামণির ব্যাপারে সে-ই সব। মণি যেন শেফালিদির সম্পত্তি, তার হুকুমেই সব।

ময়না অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু বলল না। "আমি তাহলে মেসোমশাইকে গিয়ে কী বলব ?"

শেফালি চিরুনি রেখে একটা ছোট তোয়ালে উঠিয়ে নিল। চুলের আগায় এখনও জল রয়েছে। রগড়ে মুছে নিল। ঝাড়ল। আবার চিরুনি তুলে নিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। "বড় ম্যানেজারবাবু এখন কোথায় ?"

"অফিস ঘরে।"

"কে আছে সেখানে ?"

"উনি নিজের কাজ করছেন।"

"ও !...কালকের লোকটার নাম কী যেন।" শেফালি জেনেও না-জানার ভান করল।

"কমলকুমার গুপ্ত। কলকাতার লোক।"

"আমি এখন বারান্দায় যাব। উনি রোদ পোয়াচ্ছেন। ঘরে আনার সময় হয়েছে। বলব ওঁকে।...আজ দেখা হবার আশা কম। ওঁর শরীরটা ভাল নেই। কাল ঘুম হয়নি।"

ময়না ভাবছিল চলে যায়। হঠাৎ বলল, "কালকের মানুষটি অন্যরকম। আর পাঁচ জনের মতন নয়।"

শেফালি ময়নাকে দেখতে দেখতে বলল, "সব মানুষই অন্যরকম।...কলকাতা থেকে যে এসেছে তার আলাদা কটা হাত পা আছে ?"

বিরক্ত হল ময়না। শেফালিদির কথাবার্তার মধ্যে ভব্যতা থাকে না। খোঁচামারা কথা বলে। রুক্ষ মেজাজ নিয়ে থাকে। নিজেকে কোন মহারাণী ভাবে কে জানে ! দিদিমামণিকেও মাঝে মাঝে ধমকায় এত সাহস। সব সময় মেজাজ চড়া করে রাখলেই চলে না, কথাবার্তা বলতেও শিখতে হয়। অসভ্য

মেয়েছেলে !

ময়না বলল, "আমি যাই। মেসোমশাইকে বলে দিই—পরে তুমি খবর পাঠাবে।"

"হ্যাঁ, তাই বলো গে ! আর বোলো, আগে থেকে যারা এসে বসে আছে তারা কোনো দোষ করেনি। উনি যখনই বলবে—আমি বড় ম্যানেজারবাবুকে খবর দেব, একে একে এসে দেখা করবে।"

ময়না আর দাঁড়াল না। যাবার আগে একবার শেফালির চুল, মুখ, শাড়ি, জামা দেখে নিল। নার্স, না, থিয়েটার সিনেমার মেয়ে !

মাথার চুলের বাহার তো ওই। হাতখানেক লম্বা বড় জোর। কোঁকড়ানো। কালোর 'ক' নেই, লালচে ধরনের। গায়ের রঙ ফরসা হলেই সুন্দরী হওয়া যায় না। তাও এমন একটা টকটকে ফরসা নয় রঙ ; মাঝারি ফরসা। মুখের ছাঁদ একেবারে মাটির ঘটের মতন। গালের দিকটা চওড়া—থুতনির দিক সরু। আড়ালে শেফালিদিকে ওরা বলে ঘটমুখী।

নিজের চেহারা, সাজগোজ সম্পর্কে শেফালিদির ভেতরে ভেতরে বেশ যত্ন আছে। রঙিন শাড়ি জামা ছাড়া সাদা বড় একটা পরে না। অথচ বয়েস কম হল না। বত্রিশ তেত্রিশ তো হবেই। গায়ে-গতরে চর্বিমাংস জমিয়েছে খানিকটা। বয়েসের ছাপ চুরি করা অত সহজ নয়।

ময়না চলে গেল।

শেফালির চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছিল। মুখ পরিষ্কার করল। শীত না পড়ুক, বাতাস শুরু হয়েছে। হাত পা মুখ ঠোঁট ফাটতে শুরু করেছে এখন থেকেই।

শেফালি খানিকটা ক্রিম নিয়ে হাতে মুখে মেখে নিল।

এতক্ষণে সে তৈরি। সকাল থেকে কাজের কি শেষ আছে ! প্রত্যেকদিন সকাল হলেই আগে তাকে বুড়ির শোওয়ার ঘরে ঢুকতে হয়। বুড়ি কোনো কোনোদিন জেগেই থাকে, কোনোদিন শুধুই শুয়ে থাকে চোখ বুজে। নিজে না উঠে বসলে তাকে ওঠাবার হুকুম নেই।

এক সময় শেফালির মনে হত, কোনোদিন গিয়ে দেখবে, বুড়ির চোখের পাতা আর খুলছে না, বুকে শব্দ নেই, হাত পা শরীর ঠাণ্ডা বরফ। রাত্রে ঘুমের মধ্যেই বুড়ি চলে গিয়েছে। ভয়-ভাবনা খুবই হত তখন।

এই ভয় শেফালির এখন আর অতটা হয় না। গত শীতে ভীষণ ভুগিয়েছিল বুড়ি। এই যাই সেই যাই অবস্থা। শেফালিও ভরসা রাখতে পারত না। তা ক্ষমতা আছে বুড়ির, যমের কড়া নাড়াকে কলা দেখিয়ে ফিরে এল। একেই বলে

'জান' । এবার বর্ষায় আবার শরীর খারাপ হয়েছিল । আগের মতন নয় অতটা । সামলে নিল । সামনে আবার শীত আসছে । সবাই বলাবলি করে, এবার শীত নাকি হাড় জমিয়ে দেবে । দু-বছর অন্তর শীত বেশি পড়ে এখানে । বর্ষা বাদলা বেশি হলে শীতের দাপট নাকি বাড়ে । শেফালিও দেখেছে, গত বছরের আগের আগের বছরই শীত বেশি ছিল ।

নিজের ঘরটা একবার দেখে নিল শেফালি । তার ঘর মাঝারি । আসবাবপত্র মোটামুটি সবই আছে । খাট, কাঠের আলমারি, দেরাজ । দেরাজের মাথায় মুখ-দেখা চৌকো আয়না । সেকেলে আসবাব । একটা ছোট টেবিল, চেয়ার, গোটা দুই বেতের মোড়া, কাঠের আলনা । বেশির মধ্যে রয়েছে সরু এক দেওয়াল আলমারি, আর বাহারী এক কুলঙ্গি । এ-বাড়ির মজাই এই । সব ঘরেই দু-একটা করে কুলঙ্গি ।

শেফালির ঘরের পাশেই একটা কোণাচে খাঁজ, তার পরই বুড়ির ঘর । বুড়ির ঘরের একদিকে তার স্নানঘর অন্যদিকে আর একটা ছোট কুঠরি । সেখানে থাকে নন্দা । দুয়ের মাঝখানে দরজা । বুড়িকে পাহারা দেয় নন্দা ।

নন্দাকে শেফালিই এনেছে । না এনে উপায় কী ! বুড়ির কাপড়-চোপড় কাচো, তাকে চান করাও, গা-হাত মোছাও, থুতু কাশি—দরকারে গু-মুত পরিষ্কার করো, বুড়ির বিছানা-বালিশ বদলাও—এসব তো শেফালির কাজ নয় । আয়ার কাজ । প্রথম প্রথম শেফালি নিজেই সামাল দিয়েছে অনেক কিছু, তখন অবশ্য বুড়ি একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়েনি । তারপর আর শেফালি পারত না । তার ভাল লাগত না । ঘেন্নাও করত । এখন এসব কাজ করে নন্দা । শেফালি শুধু বুড়ির শরীর সামলায়, ওষুধপত্র খাওয়ায়, সঙ্গ দেয় । সঙ্গ আর কী দেবে—বসে বসে দুটো কথা কয়ে, মাঝেমধ্যে বুড়িকে ধর্মের বই পড়ে শোনায় । কখনো বা বুড়ির কোনো সাধারণ পরামর্শ দরকার হলে দেয় । তবে এটা ঠিক, বুড়ি এখন শেফালির হাত ধরা হয়ে গিয়েছে । সেটা শরীরের ব্যাপারে ।

এ-বাড়ির লোকের ধারণা, শেফালি বুড়ির মন্ত্রণাদাতা । তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার পেয়েছে । বা আদায় করে নিয়েছে । সোজা কথা, শেফালি নাকি বশ করে ফেলেছে বুড়িকে ।

বুড়ি অত সহজ পাত্রী নয় । তার দশটা আঙুলে দশটা শেফালিকে পুতুলনাচ নাচাতে পারে । বুদ্ধি, জ্ঞান্ কোনোটাই কম নয় । এতখানি বয়েসেও মাথা নষ্ট হয়নি ।

শেফালি আর দাঁড়াল না । টাইম পিস ঘড়িটা দেখে নিল । পৌনে দশ প্রায় । ঘর থেকে চলে গেল বারান্দায় ।

ঘরের গা লাগানো বারান্দা। বেশ বড়। চওড়া। বারান্দার ধার ঘেঁষে গোল গোল থাম। মাথার দিকে কাঠের খড়খড়ি জাফরি, হাত দেড়েক লম্বা হবে।

বারান্দায় এসে শেফালি দেখল রোদ সরে আসছে।

রোদের মাঝমধ্যিখানে নয়, ছায়া আর রোদের মাঝামাঝি জায়গায় বুড়ির শয্যা। শয্যা মানে বসার ব্যবস্থা। একটা সেকেলে আর্মচেয়ার। গদি মোড়া। গদি থাকলেও চেয়ারের চারপাশে বালিশের অভাব নেই। গোল লম্বাটে ছোট ছোট তুলোর বালিশ গোঁজা। মনে হয়, একরাশ বালিশ বা কুশন যেন কেউ রোদে শুকোতে দিয়েছে।

ওই স্তূপীকৃত বালিশের মধ্যে এক বৃদ্ধা মহিলাকে চট করে খুঁজে নেওয়া মুশকিল। কাছে এলে তাঁকে দেখা যায়। বালিশের বিছানা সাজিয়ে তিনি যেন শুয়ে আছেন। শরীবের অর্ধেকটা ছায়ায়, পায়ের দিকটা রোদে। জোড়া মোড়ার ওপর তাঁর পা।

এই বৃদ্ধাই বিদ্যা দেবী। বিদ্যাবতী দেবী। চলতিভাবে তাঁকে দেবী বলা হলেও তিনি নাম সইয়ের বেলায় লেখেন, বিদ্যাবতী দাসী।

কোনো কোনো চেহারা থাকে যা দেখার পর সহজে চোখের পলক পড়তে চায় না। এই বৃদ্ধার চেহারাও সেই রকম। নোংরা নয়, বিশ্রী নয়, অভিজাত্যের সমস্ত লক্ষণই নজরে পড়ে—তবে শরীরে স্বাস্থ্যে প্রায় মৃত। চেহারায় কেমন যেন ভয়-মেশানো। দেখলে অস্বস্তি হয়। কী যেন রয়েছে এই চেহারায়। বিশেষ কোনো চরিত্র? ব্যক্তিত্ব? না কঠোরতা?

বৃদ্ধাকে দেখলেই মনে হয়, বয়েস তাঁর আয়ুর প্রান্ত ছুঁয়েছে। নব্বুই কি আরও এক আধ বছর কমবেশি হতে পারে। গায়ের রঙ ফরসা, সাদা। একরকম চুন-সাদা। মনে হয়, গায়ের চামড়ার তলায় যেন রক্তের আভা একেবারেই আর নেই। মুখের গড়ন লম্বাটে। বেশি লম্বাটে। নাকটি অত্যন্ত বেশি লম্বা, লম্বা এবং খাড়া। নাকের ডগা সরু হয়ে উঁচু হয়ে সামান্য বেঁকে আছে। চোখেব গড়ন নাকের মতনই লম্বাটে। তবে অতটা অস্বাভাবিক লম্বা নয়। দুটি চোখই গর্তে ঢুকে রয়েছে। মনে হয় নাকের পাশে ভাঙা গালের তলায় তলিয়ে আছে। চোখ দুটি কিন্তু সাধারণ নয়, সজল বলেও মনে হয় না। বরং ভাল করে নজর করলে মনে হতে পারে, ওই প্রায়-মরা দীপ্তিহীন চোখ আপাতত যেমনই হোক, তার তলায় চাপা কোনো ভয়ংকরতা রয়েছে। হয়ত কোনো নিষ্ঠুরতা।

বিদ্যাবতীর গায়ের চামড়া কোঁচকানো, ঝুলে পড়া। এ-বয়েসে যা স্বাভাবিক, কোঁচকানো চামড়া একেবারেই শুকনো, কোথাও কোথাও গুটিয়ে থলির মতন ঝুলে পড়েছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ওপর মাড়ির দুটি মাত্র লম্বাটে দাঁত দেখা যায়,

নিচের মাড়ির দাঁত চোখে পড়ে না। গলায় অজস্র ভাঁজ পড়েছে। হাত দুটি শীর্ণ, রেখায় ভরা। কিন্তু বোঝা যায়, ওঁর হাতের গড়ন যেন ঠিক মেয়েলি ছিল না। দীর্ঘ হাত, হাড় চওড়া। আঙুলগুলি এখন আর পুরোপুরি সোজা হয় না, বেঁকে থাকে।

বিদ্যাবতীর সামান্য তফাতে মাটিতে চটের আসন পেতে বসেছিল নন্দা। বসে বসে কবিরাজী ওষুধের শেকড়বাকড় পাতা বেছে পরিষ্কার করছিল। তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এখনও সকালের বাসি ভাব রয়েছে সর্বত্র।

শেফালি এসে সামনে দাঁড়াল।

বিদ্যাবতী আধবোজা চোখ করে সামনে তাকিয়ে ছিলেন। শেফালিকে নজরে পড়েছিল তাঁর। কোনো কথা বললেন না।

শেফালি বলল, "ঘরে যাবেন না?"

সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিলেন না বিদ্যাবতী। পরে মাথা নাড়লেন সামান্য। "আর খানিকটা পরে...।"

ওঁর গায়ে পাতলা করে শাল জড়ানো ছিল। পরনে থান। গায়ের জামাটা বোধহয় ফ্লানেলের। সাদা। মাথার দিকে সামান্য কাপড় তোলা। সাদা মাথা। প্রায় নেড়ার মতন মনে হয়।

শেফালি বলল, "আজ একবার ডাক্তারবাবুকে আসতে বলি?"

মাথা নাড়লেন বিদ্যাবতী। বললেন, "ওঁর ওষুধ খেয়ে মাথা গরম হয়ে যায়। কবিরাজমশাইয়ের কাছে লোক পাঠাতে বল।" বিদ্যাবতীর গলার স্বর সরু, ভাঙা, দাঁত না থাকার জন্যে জড়ানো।

শেফালি বলল, "বড় ম্যানেজারবাবুকে বলব। তবে করিবারজমশাই তো থাকেন বাইশ মাইল দূরে। বললেও আসতে পারবেন না। আজ একবার সামন্তমশাইকে ডেকে পাঠাই। দেখে যান।"

"যা ভাল হয় করো।...প্রসন্নকে বলো, কবিরাজকে আসবার জন্যে একটা চিঠি লিখে দিতে। তুমি উপসর্গগুলোর কথা লিখে দাও। প্রসন্ন লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।"

শেফালি চোখের ইশারা করল নন্দাকে। উঠে যেতে বলল।

নন্দা তার শেকড়বাকড়ের ঠোঙা গুছিয়ে নিয়ে উঠে গেল।

বারান্দার এপাশে ওপাশে কাঠের চেয়ার, মোড়া পড়েছিল। শেফালি একটা মোড়া টেনে আনল বিদ্যাবতীর সামনে। প্রায় পাশে। বসল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেফালি বলল, "কাল আপনাকে বলা হয়নি। কলকাতা থেকে কাল সন্ধের গোড়ায় আরও একজন এসেছে।"

বিদ্যাবতী তাকালেন “কলকাতা থেকে ? কখন ?”
“সন্ধের মুখে।”
“আমায় কেউ বলেনি কেন ?”
“কাল আপনার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। রাত্তিরে আর বলিনি।”
বিদ্যাবতী যেন ভাবছিলেন কিছু। “প্রসন্ন কথা বলেছে ?”
“দেখা করেছেন। কথা কী হয়েছে আমি জানি না।”
“কী নাম ?”
নামটা মনে ছিল শেফালির। “কমলকুমার গুপ্ত।”
“কলকাতার কোথ্ থেকে এসেছে ?”
কমলকুমারের কথা কালই শুনেছিলশেফালি।মনে করে বলল, “কলকাতার দক্ষিণ থেকে। বোধ হয় বালিগঞ্জের দিক থেকে। বড় ম্যানেজারবাবু বলতে পারবেন।”
বিদ্যাবতী রোদের দিকে চোখ করে পাতা বন্ধ করলেন। কোনো কথা বললেন না কিছুক্ষণ। শেষে বললেন, “ক জন এল ?”
“তিন জন।”
“নামগুলো ভুলে যাচ্ছি—”
শেফালির মনে ছিল। তবু এমন ভাব করল যেন একটু সময় নিল মনে করতে। বলল, “নরেশ, রথীন আর কাল এসেছে কমলকুমার।”
বিদ্যাবতী কিছু ভাবলেন। “তুমি আগের দুটোকে দেখেছ ?”
দেখেছে শেফালি। কাছাকাছি থেকে নয়। তফাত থেকে। বলল, “আগের দু-জনকে দেখেছি। বাড়ির ছাদ থেকে। নতুন যে এসেছে তাকে দেখিনি।”
বিদ্যাবতীর একটা দোষ আছে। একই কথা বার বার বলেন। বার বার জিজ্ঞেস করেন একই কথা। বয়েসে সব কথা মাথায় থাকতে চায় না বলেই হোক, কিংবা অভ্যাসবশেই হোক—এমন হতে পারে। পারা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু শেফালি এই বৃদ্ধাকে কম দেখল না। চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় পাশে পাশে রয়েছে ক'বছর। বৃদ্ধার স্মৃতিশক্তির বিশেষ ঘাটতি পড়েছে বলে তার মনে হয় না। সাধারণত এই বয়েসের মানুষের কাছে যতটা স্মৃতিশক্তি আশা করা যায়, তার চেয়ে বড় একটা কম নয় ওঁর স্মৃতি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি।
শেফালির ধারণা বিদ্যাবতীর মধ্যে সন্দিগ্ধভাব বেশি। উনি যথেষ্ট চতুর। উনি যাচিয়ে নিতে চান। পুলিশ যেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করে ভেতরের কথা জেনে নিতে চায়, ধরতে চায়—এই বৃদ্ধাও সেই রকম।

এবার শেফালি মোড়ায় বসল। বসল, কেননা সে জানে, বুড়িকে মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দিতে হয়, সে এ-বাড়ির আর পাঁচটা দাসদাসীর মতন নয়। সে প্রতিপালিত হচ্ছে না কারও কারও মতন। যেমন, ময়না। যেমন, বোবা গোঙা লালু। তাছাড়া শেফালির ডান পায়ের শিরায় কাল আচমকা টান ধরে ব্যথা হয়েছে। গোড়ালির ওপর থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত।

বিদ্যাবতী বললেন, "প্রসন্নর সঙ্গে আমি কথা বলব। ওকে খবর দিতে বলো। আর খানিকটা পরেই খবর দিও।" বলে একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, "তুমিও তো কলকাতার মেয়ে।"

শেফালি মাথা নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু সন্দেহ করল। বুড়ি কি মনে মনে ভাবছে, কাল যে-লোকটা এসেছে তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে শেফালির!

"তুমি কোথায় থাকতে?"

"বউবাজার।"

"কলকাতায় আমাদের দুটো বাড়ি ছিল। ঘটক লেনের বাড়িটা দাদা বেচে দিল রাগ করে। আর একটা বাড়ি রয়েছে ভবানীপুরে। সে তো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। প্রসন্নকে বলছি, বেচে দিতে…এরপর আর বেচা যাবে না, দখল হয়ে যাবে।" বিদ্যাবতী এবার একটু বসবাব চেষ্টা করলেন পিঠ তুলে। সামান্য থেমে বললেন, "ছোট ম্যানেজার একটা ব্যবস্থাও করছিল। হঠাৎ চলে গেল!"

শেফালি কিছু বলল না। ইঙ্গিতটা ধরতে পারল। বুড়ি গাছের পাতায় পাতায় যায়।

তা যাক। শেফালিও কচি খুকি নয়। সে সবই জানে, সবই বোঝে। ছোট ম্যানেজার আবিরলালকে এই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সরাসরি নয়। সে-সাহস বড় ম্যানেজার প্রসন্ননাথের ছিল না। হাত ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতন আবিরলালকে বোঝানো হয়েছিল, সে মানে মানে বিদায় নিক।

আবিরলাল ছিল সেই ধরনের মানুষ যারা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে, সহজে যাদের আবেগের ভূতে ধরে, খানিকটা বোকা, কিছুটা বেপরোয়া। অথচ আবিরলালের গুণও ছিল অনেক। সে বিশ্বাসী ছিল, আইন-টাইন পাস করেছিল, যা মনে মনে ঠিক করত তা কাজেও না করে ছাড়ত না।

শেফালিকে এ-বাড়িতে কি আবিরলাল আনেনি? না, কোনো চেনাজানা ছিল না। তারা পরস্পরের পরিচিত অথবা আত্মীয়ও নয়। বিদ্যাবতীকে সর্বক্ষণ দেখাশোনা করা এবং এ-বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে একটা বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপা হয়। সামন্ত ডাক্তার আর বড় ম্যানেজার মিলে ব্যবস্থাটা করেছিল। শেফালি চাকরিটা পেয়ে যায়। তাকেই পছন্দ করে দু-জনে।

এখানে থাকতে থাকতে শেফালির সঙ্গে আবিরলালের একটা চাপা সম্পর্ক কি গড়ে উঠতে পারত ? শেফালি কোনোদিন বোকামি করেনি। সে খুবই সাবধানী ছিল। কিন্তু আবিরলাল ছিল না। শেফালির চেয়ে সামান্য হয়ত বয়েস বেশি ছিল আবিরলালের। তার প্রথমা স্ত্রী, বিয়ের দু-মাসের মধ্যে অদ্ভুতভাবে মারা যায়। বিচিত্র অসুখে। ইয়ালো ফিভার। এদেশে যা লাখেও একটা হয় কিনা সন্দেহ।

এসব অবশ্য আগের ঘটনা, আবিরলাল তখন এ-বাড়িতে আসেনি, হুগলি চুঁচড়োয় থাকত। আদালত করত।

বিদ্যাবতীর বাড়িতে সে চাকরি নিয়ে চলে এসেছিল খানিকটা রুজির ধান্ধায়, খানিকটা মন শান্ত করতে।

বড় ম্যানেজারবাবু আবিরলালকে ভাল চোখে নেননি। গোড়ার দিকে সেটা বোঝা না গেলেও পরে সেটা বুঝতে পেরেছিল আবিরলাল। বুঝেও গ্রাহ্য করেনি।

দুই ম্যানেজারের মধ্যে রেষারেষি গড়াতে গড়াতে কোথায় যেত কে জানে ! কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল।

শেফালি আজও বুঝতে পারে না, আবিরলাল নিজেই যেচে গর্তে পা দিয়েছিল, না, প্রসন্ননাথের কোনো হাত ছিল ? ময়নাকে তিনি আবিরলালের গায়ে ঠেলে দিয়েছিলেন ? হ্যাঁ ময়না যে আবিরলালের গায়ে টলে পড়ছিল এটা অনেকেরই চোখে পড়তে শুরু করেছিল।

শেষে একদিন দু-জনকে যে-অবস্থায় শেফালি দেখল, তাতে তার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। নোংরা অবস্থায় না হলেও আদুরে অবস্থায়। গলে পড়ছিল ময়না। অতটা মাথা গরম কেন হল কে জানে ! রাগে ? নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল ?

শেফালি হয়ত তখনকার মতন সেই উত্তেজনা সামলে নিত। আবিরলালকে বিপদে ফেলত না। কিন্তু ময়নার সঙ্গে কথা কাটাকাটি, শেষে ঝগড়া হয়ে গেল শেফালির।

বিদ্যাবতীর কানে কথাটা কে তুলল কে জানে ! সন্দেহ সকলকেই করা যায়।

বিদ্যাবতী সরাসরি শেফালিকে জিজ্ঞেস করলেন কথাটা।

শেফালি জানত, অস্বীকার করে লাভ নেই। তাতে তার অন্ন যাবে, আশ্রয় যাবে। সে স্বীকার করে নিল। তাছাড়া সে চাইছিল ময়না জব্দ হোক।

শেফালি যা চাইছিল—হল তার উল্টো। বিদ্যাবতী প্রসন্ননাথকে ডেকে পাঠিয়ে হুকম করলেন, ছোট ম্যানেজারকে তাড়িয়ে দিতে।

তাড়াবার দরকার হল না। আবিরলাল নিজেই যাবার জন্যে তৈরি ছিল। সে চলে গেল।

আবিরলাল চলে যাবার পর, হপ্তা দুই পরে শেফালি একটা চিঠি পেল ডাকে। আবিরলালের চিঠি। বেশি কিছু লেখেনি। শুধু লিখেছিল, নিজের কাজের জন্যে শেফালিকে একদিন পস্তাতে হবে। ডাইনিবুড়িকে সে চিনতে পারেনি এখনও। যেদিন চিনতে পারবে, বুড়ি যদি ততদিন বেঁচে থাকে, বুঝতে পারবে শেফালি যা করেছে তার চেয়ে নোংরা কাজ আর হয় না।

এটা বড় আশ্চর্যের কথা, আবিরলালকে যে-দোষে তাড়াতে হল, কই ময়নাকে তো কিছু বলা হল না? কেন? ময়নার বেলায় বুড়ি চুপ করে গেল কী জন্যে?

বিকেলের মুখেই কমলকুমার বেরিয়ে পড়েছিল। সকালের দিকে সে ঘরেই ছিল অনেকক্ষণ। পরে নিচে নেমেছিল। প্রসন্ননাথের সঙ্গে কথাও হল। মানুষটি মুখে অতি অমায়িক না হলেও আচরণে সংযত। বললেন, যথাস্থানে খবর তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সময় মতন, তবে মনে হয় না, আজ ওঁর সঙ্গে দেখা হবার আশা আছে। কাল থেকে শরীরটা ভাল নেই মায়ের। কথাবার্তা বলতে পারবেন না বেশি।

কমল শুধু বলেছিল, "বিকেলে হতে পারে?"

প্রসন্ননাথ বললেন, "বলতে পারছি না। আমায় দেখা করতে খবর দিয়েছেন। বলব ওকে। তবে বুড়ো মানুষ, বিকেলের দিকে দেখা-টেখা বড় করেন না।" বলেই প্রসন্ন একটু হাসলেন, "এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কাল সন্ধের দিকে এলেন। এক আধদিন এ বাড়িতে থাকুন না! কোনো অসুবিধে হলে বলবেন!"

কমল মাথা নাড়ল। না, অসুবিধে হচ্ছে না।

"জায়গাটা ভাল। ঘোরাফেরা করুন, বিশ্রাম নিন। আপনারা কলকাতার মানুষ। এদিকে তো বেড়াতেই আসেন।"

কমল বিকেলের ঘোরাফেরা করতেই বেরিয়ে পড়েছিল। যাবে স্টেশন পর্যন্ত।

এখনও আলোয় খানিকটা উজ্জ্বলতা রয়েছে। তবে রোদের তেজ মরে গিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রোদ আর থাকবে না। আলো হয়ত থাকবে সামান্য। হেমন্তের দিন। তাড়াতাড়ি ছায়া নামবে, অন্ধকার হয়ে আসবে।

রাস্তা ভাল নয় এদিককার। পিচ নেই। পাথর আর মোরম ছড়ানো পথ।

মোরম উঠে গিয়েছে। পাথরের রাস্তার যত্রতত্র গর্ত।

প্রায় শ'চার পাঁচ গজ হেঁটে আসার পর কমল আর বাড়ি ঘর দেখল না। 'শান্তিকুটির 'মাতৃসদন'—এ সবের এলাকা শেষ। এখন চারদিক মাঠ, উঁচুনিচু, পলাশ গাছের ঝোপ, মাঝে মাঝে নিম-কাঁঠাল ধরনের গাছ। বট-অশ্বত্থও চোখে পড়ে। দূরে বালিয়াড়ি ধরনের ছোট পাহাড়।

এমন সময় কমল একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে গেল। পেছন দিক থেকেই আসছিল। কাউকে নামিয়ে ফিরছিল।

এদিককার সাইকেল রিকশার চেহারায় এক্কা গাড়ির ছাপ আছে। মাথার দিকের ছাদটা ওই রকম দেখতে। টিন দিয়ে ঢাকা। ঘণ্টি বাজায় সাইকেলের মতন। লোহার সরু এক শিক সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে লাগানো ঘণ্টির ওপর ঠোকে। শুনতে মন্দ লাগে না; হর্নের আওয়াজের চেয়ে ভাল।

রিকশা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কমল। কাছাকাছি এসে রিকশাঅলাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

কমল বলল, "স্টেশন?"

"আইয়ে!"

হাতের অ্যালুমিনিয়াম স্টিকটা রিকশায় আগে তুলে দিল কমল। দিয়ে রিকশা ধরে উঠে পড়ল।

রিকশাঅলা গাড়ি চালাতে শুরু করে একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, "বাবুর পায়ে কি জখম আছে? হাড্‌ডিমে চোট্?"

কমল হেসে বলল, "থোড়া বহুৎ।"

ছেলে ছোকরা রিকশাঅলা। সারাটা রাস্তা ধীরেসুস্থেই এল। হয়ত কমলের পায়ের চোটের কথা ভেবে।

ভাড়া তিন টাকা। কমল চারটে টাকা হাতে দিয়ে নেমে পড়ল।

রামগতিকে দরকার কমলের। স্টেশনের আশেপাশে রামগতি কিংবা তার ভাঙা মরিস গাড়ি দেখতে পেল না।

কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করল না কমল। হয়ত কোনো ভাড়া পেয়ে খাটতে গিয়েছে রামগতি। এখন কি কোনো ট্রেন আছে? এ যা শহর, এখানে ভাড়া খাটতে গেলে দিন ফুরোবার কথা নয়। খানিকটা পরে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। গতকাল প্রায় এই সময় কমল এখানে পৌঁছেছিল।

যেন স্টেশনের দিকে বেড়াতে এসেছে কমল এইভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল। অলসভাবে। কৌতূহলের চোখে স্টেশনের গা-লাগানো বাজারটা দেখছিল। মফস্বলের স্টেশন এবং তার কাছাকাছি বাড়ি বাজারের একটা নিজস্ব

চেহারা থাকে। সেইরকমই চেহারা। তবে বিহারের এই মফস্বল বাজারের ধরনটা সামান্য অন্যরকম। খুব ঘিঞ্জি, ময়লা নয়। বেশিরভাগই ছোট ছোট দোকান। একটি দুটি বাড়ি চোখে পড়ে, তা-ও আধ-পাকা।

কমল একটা দোকানে বসে চা খেল এককাপ। চা খেতে খেতে সব নজর করছিল। বাঙালি মুখ প্রায়ই চোখে পড়ে। কমলের মতন এক আধজন বেড়াতেও বেরিয়েছে। সাদা দাড়িঅলা এক বৃদ্ধকেও চোখে পড়ল। চমৎকার দেখাচ্ছিল বৃদ্ধকে। হইচই এখন নেই। সামনেই তেমাথা। একটা তেকোণা জায়গা ঘিরে বাগান। মানে কয়েকটা মোরগঝুঁটি ফুলের গাছ। আর ঘাস। খানিকটা তফাতে রিকশা স্ট্যান্ড। আশেপাশে খুচরো দোকান।

কমল একটা সিগারেট ধরাল। চায়ের দাম মিটিয়ে বাইরে এল, দাঁড়াল—তারপর ডানদিকেই এগুতে লাগল। মনিহারি দোকান, পানের দোকান, মুদি, মায় একটা চুন-সুরকির দোকানই যেন। বিস্তর বড় বড় গাছও এদিকে।

আরও খানিকটা এগিয়ে কমল রামগতির মরিস গাড়ি দেখতে পেয়ে গেল। পুরনো ভাঙাচোরা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওটাই তাহলে সরকারদের বাড়ি?

কমল গাড়িব কাছাকাছি আসতেই দেখল, রামগতি গাড়ির বনেট তুলে মাথা গুঁজে কিছু যেন করছে। তার ঘাড় নিচু হয়ে আছে।

রামগতি ঘাড় তোলার আগেই কমল গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির একটা দরজা খোলাই ছিল।

কমল বলল, "কী হল?" রামগতি ঘাড় তুলেই কমলকে দেখতে পেল। "স্যার আপনি?"

"তোমার কাছেই বেড়াতে এলাম। কী হয়েছে গাড়ির?"

"ধরতে পারলাম না। চেষ্টা করলাম অনেক। তেল টানছে না। মিস্ত্রিকে খবর দিতে হবে।"

"আজ গাড়ি বার করতে পারনি?"

"না স্যার। সকাল থেকে খাটলাম। হল না।" রামগতি আর চেষ্টা করল না। বনেট নামিয়ে দিল। দিয়ে ঘুরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল গাড়ির।

হাতে কালিঝুলি ছিল। ময়লা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে একবার আকাশের দিকে তাকাল। রোদ আকাশের তলায় ভাসছে।

"এই বাড়িটাই কি তোমার সরকারবাবুদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তোমার এই বাড়ি দেখছি ভেঙে পড়ছে।"

"যাদের জিনিস তারা না দেখলে আবার কী হবে ?...চলুন, বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসি ।"

"চলো ।"

আগাছার জঙ্গল । কয়েক ধাপ সিঁড়ি । এদিককার বাড়ি এমন ছাঁদ ছিরিহীন হবার কথা নয় । এ যেন শখের নয়—দোকান ঘর ভাড়া দেবার জন্যে কবা বাড়ি । এখন অবশ্য ইটখসা, জীর্ণ ।

রামগতি ঘরের ভেতর থেকে একটা টিনের চেয়ার বাব করে এনে দিল বারান্দায় । বলল, "বসুন স্যার । একটু চা খান । পরিবাবকে বলে এসেছি ।"

"চা যে দোকানে খেলাম গো ।" কমল ইচ্ছে করেই শেষ শব্দটা ব্যবহার করল । নরম কথা এরা পছন্দ করে । ঘনিষ্ঠ ভাবে নিজেদের ।

"দোকানে খেয়েছেন খেয়েছেন । এ আমার বাড়ি... ।"

"কে কে আছে তোমার ?"

"এখানে আমি আর আমার পরিবার । এক ছেলে আছে, সে শালা এখানে থাকে না ; আদরায় রেলের চাকরি করে । ফুটুনি ফোটায় শালা । খালাসির তো চাকরি ।"

কমল হেসে ফেলল । ছেলে-জামাই ভাই-ভাগ্নে—সবাই এদের মুখের তোড়ে শালা হয়ে ভেসে যায় ।

কমল বলল, "এ বাড়িতে তাহলে তোমরা দু-জন । তুমি আর তোমার বউ ?"

রামগতি মাথা নেড়ে বলল, "পাঁচ পোষ্য স্যার । একটা কুকুর । দুটো হুলো । গাই-বাছুর ।"

"কমল আবার হাসল । মানুষটা মজার । বলল, "কুকুর থাকলে ডাকে—তোমার কুকুর কি বোবা ?"

"ওদিকে কোথাও আছে । ঘুমোচ্ছে ।"

"কী কুকুর ?"

"জাত নেড়ি । দো আঁশলা ।...বেটা তেজী, স্যার ।"

কমল সিগারেটের প্যাকেট বার করল । নিজে একটা নিল, রামগতিকে দিল ।

রামগতি কিছুতেই নিতে চায় না । লজ্জা করছিল তার । শেষে নিল ।

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে কমল চুপচাপ থাকল কিছুক্ষণ । তারপর বলল, "রামগতি, তোমায় ক'টা কথা জিজ্ঞেস করব, বলবে ?"

"বলুন স্যার ?"

"তার আগে বলো, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি ?"

রামগতি তার সরল, নির্বোধ অথচ স্থির চোখ নিয়ে ক'পলক দেখল

কমলকে। "পারেন স্যার।" বলে যিশুবাবার শপথ নিল।

কমল বলল, "তুমি এই শহরে কতকাল আছ?"

"বারো-চোদ্দ বছর।"

"যে-বাড়িতে আমি উঠেছি ওই বাড়ির খবর তুমি রাখ?"

"কিছু রাখি স্যার।"

"তুমি কাল বলছিলে, ও বাড়িতে উঠলে লোকে গুম হয়ে যায়। গলায় ফাঁস লাগায়, আগুনে পুড়ে মরে—এসব কথা কি সত্যি? না, আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলে?"

রামগতি বলল, "ভয় দেখাব কেন বাবু, যা শুনেছি বলেছি।" এই প্রথম রামগতি স্যার না বলে বাবু বলল।

"কানে শুনেছ? চোখে তো দেখনি?"

মাথা নাড়ল রামগতি। বলল, "মিথ্যা বলিনি। চোখে কেমন করে দেখব। ও-বাড়ি আমাদের এই বাজারে নয়। দু-আড়াই মাইল তফাতে রাজরাজড়ার বাড়ি। আমাদের ঢুকতে দেবে কেন? থানা-পুলিশে খোঁজ নিন, জানতে পারবেন। আপনি বাজারের কোনো দোকানে গিয়ে খোঁজ নিন—সকলে বলবে।"

কমল সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল ছুঁড়ে।

ভেতরে কড়া খটখট করল কেউ। রামগতি উঠে পড়ল। বলল, "চা হয়ে গিয়েছে স্যার। আনছি।"

কমল সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। আড়ালেই বসে আছে তারা। রাস্তা থেকে চোখে পড়ার কথা নয়।

রামগতি একটা পরিষ্কার কাপে করে চা আনল কমলের জন্যে। নিজের জন্যে কাচের গ্লাসে করে চা এনেছে।

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে রামগতি বলল, "ওই বাড়ির নাম আমরা জানি স্যার। কিন্তু মুখে আসে না। মনে থাকে না। কেউ, বলে 'রাজ কোঠি', কেউ বলে,'সিংবাবুর কোঠি।' গুম বাড়ি বললে চট করে বুঝতে পারি।" কমল খেয়াল করতে পারল না, কাল রামগতির মরিস গাড়ি ভাড়া করার সময় 'রত্ননিবাস' নামটা বলেছিল কিনা! রামগতিও কানে শুনেছিল কিনা কে জানে! জজ রোড, ঝিন্‌ঝি মহল্লা—ওইটুকুই যথেষ্ট। অঞ্চলটার নাম ঝিন্‌ঝি, রাস্তার নাম জজ রোড।

রত্ন নিবাসে যাবার পথে কমল ওই এলাকাটার চেহারা দেখে বুঝতে পেরে গিয়েছে, বাঙালি বাবুরা এখানে ঘরবাড়ি করে একটা পাড়া তৈরি করেছিল

অনেককাল আগে থেকেই। শখের বাড়ি। পয়সাঅলাদের ছুটি কাটাবার, স্বাস্থ্য উদ্ধার করার বাড়ি। মধুপুর, যশিডি, গিরিডি, যেমন। তবে এখন ওই মহল্লার অনেক বাড়িই পুজোর শীতে ভাড়া খাটে, না হয় হাত বদল হয়ে গিয়েছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কমল বলল, "কটা গুমের খবর তুমি জান ?"

রামগতি একটু ভাবল। "চার জানি। শুনেছি।"

"কি শুনেছ ?"

"একটা তো স্যার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।" রামগতি বলল, "তার আগেরটা পুড়ে মরেছে। একটা ঝাঁপ খেয়েছিল বাড়ির ছাদ থেকে। মাথায় চোট খেয়েছিল, পিঠ ভেঙে গিয়েছিল। মরে গেল।"

"আর একটা ?"

"খুন !"

"খুন ? কেমন করে ?"

"কেউ বলে ঘাড়ে ছোরা খেয়েছিল। কেউ বলে বুকে। গলা টিপেও খুন করতে পারে, স্যার ?...লাশ বাড়িতে ছিল না। রেললাইনে ফেলে এসেছিল। মালগাড়িতে কাটা পড়ে গেল। ব্যস্‌, লোপাট হয়ে গেল সব।"

কমল আর এক ঢোঁক চা খেল। "এ সবই তোমার শোনা কথা ? নিজের চোখে দেখা নয় ?"

"দুটো লাশ দেখেছি স্যার। থানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখেছিল। মুখ দেখতে পাইনি। লাশ ঢাকা দেওয়া ছিল। তেরপল দিয়ে।"

কমল বলল, "একটা বাড়িতে খুন হচ্ছে, গুম হচ্ছে—পুলিশ কিছু করেনি ?"

"থানার কথা বাদ দিন। আগের দারোগাকে বদলি করে দিল। পয়লা নম্বরের হারামি ছিল। এখন নতুন দারোগা এসেছে। ছোকরা ! ভাল লোক।"

"তুমি যে চারটে গুমের কথা বললে, এগুলো কি একই দারোগার আমলে ঘটেছে ?"

রামগতি মাথা নাড়ল। "না স্যার, গুপ্তা দারোগার আমলেও ঘটেছিল। দু'দারোগার আমলে চার।"

"এটা ক' বছরের কথা। মানে চার-চারটে লোক যে মারা গেল—এটা ক'বছরের মধ্যে ঘটেছে ?"

"চার-পাঁচ বছর।"

কমল চা খেতে খেতে কিছু ভাবল। পরে বলল, "তুমি বলছ, প্রত্যেক বছরেই একজন করে মারা যাচ্ছে।"

"তাই তো দেখছি স্যার।"

"সবাই বাইরের লোক ?"

"বাইরের। আপনার মতন আসে। এসে ওই বাড়িতে ওঠে। আর মরে।"

"কেন আসে কিছু জান ?"

রামগতি মাথা নাড়ল। জানে না।

"একজন করেই আসে ?"

"কেমন করে বলব বাবু ! একজন করেই মারা যায় দেখেছি।"

কমল বলল, "রামগতি, এবার আমরা তিনজন এসেছি।"

রামগতি অবাক হয়ে বলল "তিনজন ?"

কমল একটু হাসল। "তিনজন একসঙ্গে গুম হলে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না !"

রামগতিও যেন সেটা বুঝতে পেরে মাথা হেলাল।

সামান্য চুপচাপ।

কমল বলল, "ও-বাড়িতে তোমার আসা-যাওয়া নেই ?"

মাথা নাড়ল রামগতি। বলল "এক আধবার গিয়েছি। ও বাড়িতে টমটম গাড়ি আছে। ম্যানেজারবাবু বাজারে এলে টমটম চেপে আসেন। হাটবাজার করতে যারা আসে সাইকেলে চেপে আসে।"

"ও বাড়ির কারুর সঙ্গে তোমার জানাশোনা খাতির নেই ?"

"মুখ চেনা আছে।·· ও বাড়ির লোকরা আমাদেব সঙ্গে মেলামেশা করে না। শালারা নিজেদের লাট ভাবে।"

"তবু কারোও সঙ্গে··· ।"

রামগতি বলল, "শিবুব সঙ্গে ভাব আছে অল্প। শিবু মালির কাজ করে। বাঁকড়োয় বাড়ি। দেশের লোক।"

কমল বসে থাকল কিছুক্ষণ। বিকেল মরে গিয়েছে। আবছা হয়ে আসছে চারদিক। কমল বলল, "তুমি কি খেয়াল করে বলতে পার—যারা মারা গিয়েছে তারা সবাই এই সময়টায় ও-বাড়িতে এসেছিল ?"

একটু ভেবে রামগতি মাথা নাড়ল। বলল, "না স্যার ! আগুনে যে পুড়েছিল সে দেওয়ালিতে এসেছিল। রেলের লাইন থেকে যার লাশ তুলে এনেছিল, সে এসেছিল গরমকালে। বাকি দুটো শীতকালে।"

কমল বলল, "এদের তুমি দেখনি কাউকে। তবু আন্দাজ বয়েস কেমন ছিল বলতে পার ?"

"শুনেছি ছোকরা বয়েস। তিরিশ বত্রিশ। আপনার বয়েস হবে।"

কমল এবার উঠে পড়ল। উঠে পড়ে কী ভেবে পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে দশটা টাকা নিয়ে রামগতিকে দিতে গেল।

রামগতি টাকা নেবে না।

কমল বলল, "রাখো হে !···সূর্য অস্ত গেল। একটু খাবে বটে ! জুত না হলে কাল আবার গাড়ি নিয়ে বসবে কেমন করে !"

টাকাটা রামগতির হাতে গুঁজেই দিল কমল। তারপর বলল, "শোনো, কাল আমি আসব। আজই আমি গুম হয়ে যাব না। কাল আমি তোমার কাছে একটা ঠিকানা রেখে যাব। কলকাতার। আমার যদি কিছু হয়—খবরটা ওই ঠিকানায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে।"

রামগতি বলল, "আপনি স্যার ও-বাড়ি ছেড়ে চলে আসুন। আমি আপনাকে ভাল জায়গায় ব্যবস্থা করে দেব।"

"না। এখন নয়। আমি কাজে এসেছি। কাজ শেষ করতে হবে হে !"

কমল পা বাড়াল।

রামগতি এগিয়ে দিতে আসছিল। কমল বলল, "তুমি আমার সঙ্গে আসবে না। আমি বাজার দেখে এসেছি। রিকশা নিয়ে নেব।···শোনো, একটা কথা বলি, এখানে নেশার দোকান কোনটা ?" বলে ইঙ্গিতে মদ্যপানের ব্যাপারটা বোঝাল।

রামগতি হকচকিয়ে গেল।

কমল হেসে বলল, "আমি নেশা করি না। একটা লোকের কথা তোমায় বলে যাই।" কমল মোটামুটিভাবে নরেশের চেহারার বর্ণনা দিল। বলল, "লোকটা বোধহয় এদিকেই কোথাও নেশা করতে আসে। পান করে, পান খায়। পাকা লোক। ধেনো দিশি সে খাবে না। ভাল জিনিস খাবে।"

রামগতি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "কানহাইবাবুর দোকান। প্যাকিংয়ের মাল বেচে। দোকানে বসে খাওয়া যায় না।"

"খায় কোথায় ?"

"জায়গা আছে। চেঞ্জারবাবুরা বাড়ি নিয়ে গিয়ে খায়, স্যার। রেল স্টেশনের কাছে একটা পানের দোকান আছে। তার পেছন দিকে বসেও খায়।"

"দিশির দোকানটা কোথায় ?"

রামগতি লজ্জা পেয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, "ফকিরবাবুর দোকান।"

"আমি চলি।···লোকটার কথা খেয়াল রাখবে।"

রামগতি মাথা হেলিয়ে বলল, খেয়াল রাখবে।

স্টেশনের সামনে বাজারে এসে কমল দেখল, সন্ধে হয়ে এল প্রায়।

রিকশা ভাড়া করে কমল তার ছড়ি তুলে দিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছে—এমন সময় রিকশাঅলা যেন কাকে দেখতে পেয়ে বলল, "বাবু, দুসরা এক সওয়ারি আছে। জজ রোড যাবে। আগার ওহি বাবুকে ভি লিয়ে লি !"

কমল ঘাড় ঘোরাল। দেখল, রথীন। পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে। আজ সকালে রথীনকে দেখেছে সে। আলাপ হয়নি।

কমল কী মনে করে বলল, "নিয়ে নাও।"

রিকশাঅলা রথীনকে ডাকতে লাগল।

রিকশাঅলার দোষ ছিল না। সামান্য আগে রথীন তাকে জিজ্ঞেস করে গিয়েছিল, জজ্ রোডের দিকে যাবে কিনা রিকশা। ভাড়া খাটতে বসে কে সওয়ারি ছাড়ে ! তাছাড়া জজ রোডের দিকে যেতে পারলে ভাড়াও বেশি পাওয়া যায়।

রথীন রিকশাঅলাকে সামান্য দাঁড়াতে বলে 'জ্যোতি স্টোর্সে' কিছু কিনতে গিয়েছিল। কিনে সিগারেট কিনছিল পানের দোকান থেকে এমন সময় কমল এসে পড়ল। তারও জজ্ রোড। একই দিকের যাত্রী যখন দু-জন সওয়ারি নিতে আপত্তি কিসের রিকশাঅলার ! সিট্ তো দু-জনের। তারও দু-তিনটে টাকা বেশি আসবে। বাবুদেরও সুবিধে, ভাগাভাগি করে ভাড়া দেবে।

রথীন সিগারেট কিনে রিকশার কাছে আসতে না আসতেই কমলকে দেখতে পেল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা রিকশায় কেন ?

ততক্ষণে রিকশাঅলা বাবুকে রিকশায় উঠিয়ে নেবার কারণ বলে রথীনকে ডাকছে।

রথীন বিরক্ত হয়েছিল। না, সে ওই লোকের সঙ্গে একই রিকশায় যাবে না।

যাবে না ; কিন্তু না-যাবার কৈফিয়ত কী দেখাবে ?

রথীন একটা কৈফিয়ত দেখাবার চেষ্টা করছিল, তার আগেই কমল বলল, "আসুন, একসঙ্গেই যাওয়া যাক। একই পথের যাত্রী। ভালই হল।"

রথীন বলতে যাচ্ছিল, না না আপনি যান—আমার একটু কাজ আছে—। কথাটা বলতে গিয়েও পারল না বলতে। কমল তার দিকে হাসি হাসি চোখ করে তাকিয়ে আছে। ওই চোখে কী যেন ছিল।

রথীন খানিকটা দোনামোনা করল। শেষে বাধ্য হয়েই যেন রিকশায় উঠে বসল। ভেতরে বিরক্ত। সে কারও সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে চায় না। একলাই থাকতে চায়। কাউকে সে বিশ্বাস করে না ; কে বলতে পারে কার মনে কী রয়েছে। পার্বতী তাকে বার বার বলে দিয়েছে, খুব সাবধানে থাকতে, হুঁশিয়ার

হয়ে।

রথীন সাবধানেই আছে। তবু এখন এই মুহূর্তে তার এমন কিছু করা কি উচিত যাতে গোড়া থেকেই বোঝানো চলে, তুমি আমার শত্রু ? সেটা বোধহয় করা উচিত নয়। মনে মনে তারা জানে, একে অন্যের বন্ধু নয়। অপ্রয়োজনে শত্রুতা করার কী দরকার।

কলকাতা থেকে আসা এই খোঁড়া লোকটা যে কেমন, রথীন জানে না। সকালে তাকে দেখেছে মাত্র। দেখে মনে হয়েছে, এই লোকটা পাটনার নরেশ মজুমদারের মতন নয়। নরেশকে দেখলে বিরক্তি হয়। তার হাঁটা চলা, কথা বলা, কথায় কথায় কাঁধ ঝাঁকুনি, জন্তুর মতন দাঁত বার করে হাসি—সমস্ত কিছুর মধ্যে কেমন এক নোংরামি রয়েছে। নরেশ এমন টিটকিরি মেরে কথা বলেছে রথীনের সঙ্গে যেন নরেশশালা কোন [illegible]কেটা। লোকটা বড় নোংরা। ইতর। রথীনকে খোঁচা মেরে জ্বালাতে চায়—মজা করতে চায়।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজের কাজ গুছোতে এসেছে রথীন, ঝঞ্ঝাট ঝামেলা পাকাতে চায় না, নয়ত নরেশকে একতরফা রোয়াবি মারতে হত না, জব্দ হয়ে যেত। খিস্তি খেউড় রথীনও জানে। কলকাতা শহরে ট্যাক্সি চালিয়েছে সে, কলোনিতে থেকেছে, চা বাগানে দিন কাটাচ্ছে। রথীনেরও চোখ আছে, ট্যাক্সিঅলার চোখ বাপ্, সে আশপাশ অনেক কিছু দেখতে পায়।

রিকশা চলতে শুরু করেছিল।

খানিকটা পথ এগিয়ে এল রিকশা। কমল বলল, "সকালে আপনাকে দেখেছি, আলাপ হয়নি। আমার নাম কমলকুমার গুপ্ত। কলকাতা থেকে এসেছি।"

বাধ্য হয়েই রথীনকে তার পরিচয় দিতে হল।

"চা বাগানে থাকেন ? আসামের দিকে ?"

"না, ডুয়ার্স।"

"ও ! কাছেই হল খানিকটা। আমার এক বন্ধু চা-বাগানে ছিল। ভাল লাগেনি। পালিয়ে এসেছে।"

"কোন বাগান ?"

"এবার মুশকিলে ফেললেন। মাস দু-তিন থেকেই পালিয়ে এসেছিল ফণী। চা-বাগানের নাম-টাম মনেও থাকে না। ও ছিল সোনাগুড়ি টি এস্টেটে বা ওইরকম কিছু হবে— !"

"আপনি কলকাতায় কোথায় থাকেন ?" পাল্টা জিজ্ঞেস করল রথীন।

"ফার্ন রোড।"

"কলকাতাতেই আমি বেশি ছিলাম।"

"কোনদিকে ?"

"সেন্ট্রালে ছিলাম, আবার শেষে সিঁথির দিকে।"

"ফার্ন রোড আর সিঁথি। একেবারে এ-মুখে আর ও-মুখে।"

বাজারের এলাকা ছাড়িয়ে গেল রিকশা। রাস্তায় আর ইউনিয়ন বোর্ডের ডিবে বাতি নেই। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। রিকশাঅলার বাতিটা সাইকেল-ল্যাম্প। ঠাণ্ডা বাতাস লাগছিল। কুয়াশা জমছে মাঠে। গাছতলায়, ঝোপঝাড়ের মতন মাঝে মাঝে দেহাতিদের দু-চারটে কুঁড়ে। এক আধ-ফোঁটা কুপির আলো মিটমিট করছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কমল বলল, "নরেশবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ?" ইচ্ছে করেই বলল কমল। রথীনকে বাজাতে চাইল যেন।

রথীন বিরক্তির সঙ্গে বলল, "হয়েছে। একটা জোকার।"

কমল ঘাড় ঘোরাল না, আড়চোখে রথীনকে দেখল। তার চোখে যে ধরনের ই ভি লেন্স লাগানো আছে তাতে সাধারণ দৃষ্টির চেয়েও তার দৃষ্টিশক্তি বেশি, এবং এই ঝাপসা অন্ধকারেও সে অনেক ভাল দেখতে পায়।

"পাটনার লোক।" কমল বলল, "টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড।"

রথীন বলল, "বেশি কথা বলে। বক্কেশর। ভাঁড়।"

কমল মনে মনে হাসল। "হ্যাঁ, বকবক করে একটু। সব মানুষ তো সমান হয় না। যার যেমন স্বভাব।"

"লোকটার স্বভাব অত্যন্ত বাজে।"

"বাজে !"

"মদ খায় খাক. যার তার সঙ্গে ঝগড়া করে। আজ সকালে ও বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া করেছে।"

"কখন ?"

"আপনি জানেন না ?"

"না।"

"নিচে নেমে বাড়ির যারা কাজকর্ম করে তাদের গালাগালি করেছে। ম্যানেজারকে শাসিয়েছে। একটা মেয়ে—কী নাম—ওই যে ম্যানেজারের অফিস ঘরে যায়—তাকে খারাপ কথা বলেছে।"

কমল জানত না। সে যখন বড় ম্যানেজারের ঘরে যায়—ম্যানেজারকে দেখে একবারও মনে হয়নি, তিনি উত্তেজিত বা বিরক্ত।

"কেন, গালমন্দ করেছে কেন ?"

"জোর করে এ-বাড়ির মালিকানির সঙ্গে দেখা করবে ও। ওকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি।"

কমল কোনো কথা বলল না। ঝগড়া করেছে শুনে এই রকমই কিছু সে অনুমান করছিল। নরেশকে একদিন কিছুক্ষণের জন্যে দেখে চট করে তার সম্পর্কে কোনো ধারণা করে নেওয়া উচিত নয়। অনেক মানুষ আছে, ওপরটা যাদের খোলস; ভেতরটা একেবারেই অন্যরকম। বিশেষ করে সেই সব মানুষ যারা হাবেভাবে স্বভাবে বেশিরকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়, খানিকটা হামবড়া, সংসারে কোনো কিছুই পরোয়া করে না—এমন একটা ঢঙ নিয়ে চলাফেরা করে। এদের মতন মানুষ যদি নির্বোধ হয় তবে অন্য কথা, নয়ত এরা মারাত্মক হতে পারে। নরেশকে ঠিক নির্বোধ বলে মনে হয়নি কমলের।

তবে ওপর ওপর থেকে নরেশকে দেখলে মনে হতে পারে, তার ধৈর্য কম। সে যে-কোন সময় দপ করে চটে যেতে পারে। হয়ত প্রসন্ননাথের সঙ্গে নরেশের কথা কাটাকাটি হয়েছিল। প্রসন্ননাথ নরেশের গলাবাজি শোনার মানুষ নন।

নরেশ কি একটু বেশি অধৈর্য হয়ে উঠেছে? একদিকে এই বাড়ির একটা কাজের মেয়েকে টাকা গুঁজে দিচ্ছে নিজের কাজ বাগাবার জন্যে, আবার আসল জায়গায় ঝগড়া বাধাচ্ছে— ! এ দুটোই যেন কেমন। একটার সঙ্গে অন্যটার মিল নেই। তাছাড়া বড় ম্যানেজারের সঙ্গে সরাসরি গণ্ডগোল বাধানো বোকামি। প্রসন্ননাথের ক্ষমতা এ-বাড়িতে অনেক। মানুষটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার ফল ভাল হবে না।

মনে মনে কী ভাবছে বুঝতে না দিয়ে একেবারে সাধারণ কথা তুলল কমল। বলল, "আপনি কি স্টেশনের দিকে বেড়াতে এসেছিলেন?"

খানিকটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল রথীন। শেষে বলল, "হ্যাঁ।"

"আমিও ওই মতলবে এসেছিলাম। এখানে আর কী করা যাবে?"

"চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা।...ভাল লাগছিল না।"

"জায়গাটা ভালই।" কমল সহজ গলায় বলল, "বেড়াবার মতনই।"

"চেঞ্জার জায়গা।"

কমল মাথা নাড়ল। গল্প করার ঢঙে বলল, "বাঙালিদের বাড়ি-ঘর এদিকে আর বোধহয় বেশি নেই।"

রথীন কোনো জবাব দিল না।

আর একটু এগোতে না এগোতেই আচমকা ফট্ করে এক শব্দ হল। একেবারে ফাঁকায়, শব্দটা জোরই শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে রিকশাঅলা গাড়ি থামিয়ে দিল।

রিকশার একটা চাকা গিয়েছে। টিউব টায়ার দুইই গেল বোধহয়। যা পাথর ওঠা রাস্তা, টায়ার টিউবের দোষ কী!

রিকশাঅলা নেমে পড়েছিল। চাকা দেখছিল।

কমলরাও নেমে পড়ল।

রিকশাঅলা রাগে গজগজ করতে শুরু করল। কালকেই সে এই চাকাটার লিক্ সারিয়েছে। আর আজ আবার ফেটে গেল। লাখিয়াশালাকে সে দেখে নেবে। পয়সা কি মাঙনায় আসে। লাখিয়া এক নম্বরের ফাঁকিবাজ, চোট্টা।

এই রিকশা ঠেলে এখন তাকে ফিরতে হবে। "বলুন তো বাবু, কী মুশকিল কি বাত হল!"

কমল বলল, "কী আর করবে! চাকা পাংচার কখন হবে কেউ কি জানতে পারে? তুমি ফিরে যাও। আমরা বাকি রাস্তা হেঁটেই চলে যাব।"

রথীন বলল, "এখনও অনেক রাস্তা।"

"মাইলটাক হবে। বড় জোর সোয়া মাইল।"

রথীন বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে রিকশা পাওয়া যাবে না?"

"বলতে পারছি না। এই জায়গা আপনার মতন আমার কাছেও নতুন।"

রিকশাঅলা এগিয়ে যেতে বলল। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ হবে না। এই সময় এদিকে খুব একটা রিকশা আসে না। সিজন টাইম হলে বাবুদের ভিড় থাকে, এই রাস্তায় রিকশাও পাওয়া যায় রাত আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত। সওয়ারি নিয়ে ফেরে স্টেশন থেকে।

কমল রিকশাঅলাকে ক'টা টাকা দিল।

রথীনও দিতে যাচ্ছিল কমলের দেখাদেখি; কমল হাত তুলে বলল, "দিয়ে দিয়েছি। চলুন হাঁটা যাক।"

রথীন যেন দ্বিধায় ছিল। শেষে বলল, "আপনি কি হাঁটতে পারবেন এতটা রাস্তা? পা..."

"পারব। আমি খোঁড়া নই পুরোপুরি। জখম আছে পায়ে।"

ততক্ষণে রিকশাঅলা তার রিকশার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে স্টেশনের দিকে।

রথীন বলল, "বড্ড অন্ধকার।"

কমল বলল, "আমার কাছে টর্চ আছে। আপনার কাছে নেই?"

মাথা নাড়ল রথীন।

কমলের পকেটে ছোট টর্চ ছিল। বার করে জ্বালল। রাস্তায় ফেলল। বলল, "মফস্বল শহরে বিকেলের পর টর্চ ছাড়া বেরুবেন না।"

দু-জনে হাঁটতে লাগল।

কমলের বাঁহাতে অ্যালুমিনিয়াম স্টিক ; ডান হাতে টর্চ।

রথীন বলল, "মশাই, একলা এলে তো বিপদে পড়ে যেতাম। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে ফিরতে হত।"

কমল কিছু বলল না। হাসল।

রথীন যেন ভদ্রতাবশে সিগারেটের প্যাকেট বার করে কমলকে বলল, "নিন, একটা সিগারেট খান। চলে তো ?"

কমল বলল, "দু-হাত জোড়া। আপনি তাহলে টর্চটা নিন।"

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে দু-জনে এগিয়ে চলল। টর্চ রথীনের হাতে।

রথীন বলল, "পায়ে আপনার কী হয়েছিল ?"

"ভেঙে গিয়েছিল।"

"কেমন করে ?"

"ট্যাক্সির ধাক্কা খেয়ে।"

রথীনের বুকের মধ্যে যেন কিছু লাফিয়ে পড়ল। ভয় ? না, উদ্বেগ ? ট্যাক্সি : রথীন নিজেও একসময়ে ট্যাক্সি চালিয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট করেছে দু-একবার। তবে ছোটোখাটো। কারুর হাত-পা সে ভেঙে দেয়নি। ট্যাক্সির কথাটা তুলল কেন লোকটা ? কোনো মতলব নেই তো ?

"কোথায় ভেঙেছিল ?" রথীন বলল।

হাঁটুর ওপরটা দেখাল কমল। হাল্কাভাবে বলল, "কপালে ছিল। মাস কয়েক বিছানায় পড়ে থাকতে হল।"

রথীন কিছু বলল না। হাঁটতে লাগল। লোকটা কি সত্যি কথা বলছে ? রথীনকে ধোঁকা মারছে না তো ? কমল কি তাকে আগে দেখেছে ? ভদ্র কথাবার্তা কমলের। আচরণও ভাল। তবে প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। ধূর্ত, না ভয়ংকর কে জানে !

মুখে মিষ্টি কথাবার্তায় নরম হলেই মানুষ সাদা সরল হয় না। রথীন সেটা জানে। জীবনে অনেক দেখেছে।

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই হাঁটতে লাগল রথীন। সে বুঝতে পারছিল না, পা ভাঙার হাজারটা কারণ থাকতে ট্যাক্সির কথাই তুলল কেন কমল ! কেন ?

নিজেই আবার বিরক্ত হল নিজের ওপর। কী মুশকিল, এতে ঘাবড়াবার কী রয়েছে ? ট্যাক্সির ধাক্কায় কত লোকের হাত-পা ভাঙছে রোজ, কত লোকের মাথা ফাটছে। এতে ঘাবড়াবার কী রয়েছে ?

তবু রথীন বলল, "কোথায় হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্ট ? কলকাতায় ?"

"খাস কলকাতায়। চৌরঙ্গি পাড়ায়।"

রথীনের গলা শক্ত হয়ে গেল। কী ব্যাপার ? রথীন নিজেই যে ওইসব এলাকায় একসময় ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরত। কমল কি তাকে দেখেছে কোনোদিন ?

অন্যমনস্কভাবে রথীন বলল, "কত দিন হল ?"

"তা মন্দ কি! বছর পাঁচেক।"

রথীন শব্দ করে নিশ্বাস ফেলতে গিয়েও সাবধান হয়ে গেল। যাক হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল এবার। পাঁচ বছর হলে ভাবনার কিছু নেই। রথীন আর তখন ট্যাক্সি চালাত না। তাকে ওসব অঞ্চলে দেখা যাবার কথা নয়।

হাঁটতে হাঁটতে রথীন আশেপাশের অন্ধকার দেখল। টর্চ না থাকলে এই অন্ধকারে হাঁটা সত্যিই মুশকিলের ছিল। কালকেই একটা টর্চ কিনবে রথীন। কেনা উচিত। আগে মনে পড়লে আজই স্টেশনের বাজার থেকে কিনে নিত। 'জ্যোতি স্টোর্স' থেকে সে যখন এক প্যাকেট নতুন ব্লেড, একটা ক্রিম আর ডট্ পেন কিনল—তখনই কিনে নিতে পারত। আসার সময় ব্লেডের প্যাকেট ফেলে এসে আজ সে দাড়ি কামাতে পারেনি। পুরনোতেই কাজ চালিয়েছে। এদিককার বাতাস বড় রুক্ষ। গাল-হাত-পা চড়চড় করে বলে একটা ক্রিমও কিনে নিল। টর্চের ব্যাপারটা তার খেয়াল ছিল না।

কিছু সময় চুপচাপ থাকার পর কমল বলল, "এই বাড়িটা—আমরা যেখানে উঠেছি—'রত্ননিবাস' বেশ ইন্টারেস্টিং, কী বলেন ? এত লোক এখানে কী করে কে জানে !...তবে অতিথিসেবা ভালই করছে, মশাই !"

রথীন বলতে যাচ্ছিল, সেবা দেখছেন এখন, পরে যখন লাশ নামবে, তখন বুঝবেন। বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর কথা মনে পড়ল রথীনের। পার্বতী সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে, খুব সাবধানে থাকবে, কাউকে বিশ্বাস করবে না। কলকাতা থেকে যে খোঁড়া লোকটা নতুন এসেছে, তার ব্যাপারেও সাবধান।

রথীন সাবধানেই আছে। কিন্তু হঠাৎ যদি কমলের সঙ্গে স্টেশনে দেখা হয়ে যায়, সে কী করতে পারে !

কমল কিছু ভাবছিল। বলল, "এখানে ঘুম-টুম কেমন হচ্ছে আপনার ?"

রথীন একটু অবাক হল। "কেন ?"

"নতুন জায়গায় আমার ঘুম হতে চায় না। ভেবেছিলাম কাল ভালই ঘুম হবে। ট্রেন-জার্নি গিয়েছে। রাত্তিরে ঠিক ঘুম হল না। ছেঁড়া ছেঁড়া।"

রথীন চমকে উঠল। সর্বনাশ। লোকটা কি কাল জেগে ছিল সারা রাত ? পার্বতী কাল তার ঘরে এসেছিল নিঝুম রাতে। অন্তত আধ ঘণ্টা ছিল। কথাবার্তা বলেছে তারা। কমল আর তার ঘরের মধ্যে যদিও দেওয়াল আছে—তবু

দেওয়ালেরও তো কান থাকে। কমল কি কিছু দেখেছে ? আন্দাজ করেছে ?

রথীন ভয় পেল বোধহয়। সন্দিগ্ধ হল। লোকটা হঠাৎ ঘুমের কথা তুলল কেন ? কিছু বোঝাতে চাইল আভাসে।

ঘাড় ফিরিয়ে রথীন কমলকে নজর করল। তারপর বলল, "আমার কাল সন্ধে থেকেই মাথা ধরে গেল। ট্যাবলেট খেলাম। রাত্তিরে ঘুমের ওষুধ। মড়ার মতন ঘুমিয়েছি।"

"ঘুমের ওষুধ ! খান নাকি আপনি ?"

"নেহাত দরকার হলে।"

"আগে জানলে, মশাই, আপনার কাছ থেকে একটা চেয়ে নিতাম। কী ওষুধ খান ? মানে, নাম ?"

রথীন ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ঘুমের ওষুধ সে এক আধবার নিশ্চয় খেয়েছে। কিন্তু সে ডাক্তারের কথা মতন। নামটাম জানে না, মনেও রাখেনি।

রথীন কী বলবে না বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "নামটাম জানি না। ডাক্তার দিয়েছিল।"

"তা ঠিক। অনেকে ঘুমের ওষুধটাকে একটা নেশা করে নেয়। রোজই খেতে শুরু করে দেয়। খুব খারাপ।...আজকাল মুড়ি-মিছরির মতন ওষুধ খাওযা হচ্ছে। যে যা পারে খায়। অ্যাবিউজ অফ্ মেডিসিন।...যাক্ গে, আমারও খেয়াল ছিল না, নয়ত বাজার থেকে গোটা দু'য়েক ঘুমের বড়ি এনে রাখতাম। ...আজ রাত্তিরে দরকার হলে, একটা নেব আপনার কাছ থেকে।"

রথীনের হাতের টর্চের আলো যেন রাস্তার মধ্যে স্থির হয়ে গেল। তাকাল রথীন। দেখল কমলকে। ধরা পড়ে যাবার পর ভয় পেলে যেমন বোধবুদ্ধি হারিয়ে যায়, রথীনের সেই রকম হল।

ঘুমের ওষুধ রথীনের কাছে নেই। সে ঘুমের ওষুধ খায় না। এই লোকটা যদি আজ রাত্রে এসে বলে, দিন তো একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিই—তখন রথীন কী করবে ?

নিজের ফাঁদে নিজেই জড়িয়ে পড়ল নাকি রথীন ? কোথায় সে ঘুমের ওষুধ পাবে ? কে দেবে তাকে ? পার্বতী ? পার্বতীর সঙ্গে দেখা হবে আজ এমন কী কথা আছে ? আর দেখা হলেও পার্বতী কোথায় ঘুমের ওষুধ পাবে ? রত্ন নিবাসে কে আছে ঘুমের ওষুধ খায় ? পার্বতী কি সেই ওষুধ চেয়ে আনবে ? না, চুরি করবে !

রথীনের মনে হল, তার গলা আর ঘাড়ের কাছটায় ঘামছে।

কমল বলল, "কী হল ? দাঁড়িয়ে পড়লেন ?"

"না, কিছু না। চলুন।"

রত্ননিবাসের যে-দিকটায় প্রসন্ননাথ থাকেন, সে-দিকের ছাঁদছিরি খানিকটা অন্য রকম। খাঁজকাটা দেখলে মনে হয়, কোনো সময়ে মূল বাড়ির সঙ্গে এই অংশটা আলাদাভাবে যোগ করা হয়েছিল। বাড়ির পেছন দিক ছুঁয়ে, কোণ ঘেঁষে, 'দ' অক্ষরের চেহারার মতন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অংশটা। মূল বাড়ির সঙ্গে যোগ রয়েছে অবশ্য।

দোতলার পশ্চিম ঘেঁষে ফাঁকা ছাদের শেষ প্রান্তে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তার গা ছুঁয়ে দু-তিনটি ঘর। অনেকটা আড়াই তলার মতন দেখায়। এই ঘরগুলো এ-বাড়ির ছাঁদের নকল নয়, খানিকটা সাধাসিধে ধরনের, চৌকো ধরনের ঘর, দরজা জানলা অত বড় নয়, খড়খড়ির বদলে শুধুই কাঠের জানলা ; অর্ধেক কাঠ, বাকিটা কাচ। দরজার পাল্লা মজবুত, কিন্তু বাহারী নয়।

প্রসন্ননাথ একসময়ে এখানে থাকতেন না। রত্ননিবাসের পেছন দিকে 'আউট হাউস' ছিল। একতলা বাড়ি। খারাপ বাড়ি নয়। সেখানে থাকতেন। তখন তাঁর স্ত্রী বেঁচে ছিল। মেয়েও ছিল, আরতি।

সুহাসিনী মারা গেল। মেয়েও গেল একদিন। তারপর আর ওই 'আউট হাউসে' তিনি মন বসাতে পারলেন না। জায়গা পালটালেন।

এসব কম দিনের কথা নয়। 'আউট হাউস'-টা এখন জঙ্গলে আগাছায় সাপখোপের উপদ্রবে পোড়ো অবস্থায় রয়েছে। মাঝে মাঝে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আগাছা সাফ করতে হয়।

প্রসন্ননাথ এখন যেখানে আছেন সেখান থেকে পেছন দিকে তাকালে 'আউট হাউস'টা দেখা যায়। কখনও কখনও কেমন যেন হয়ে যায় প্রসন্ননাথের ; তিনি ওই ঝোপঝাড় আগাছায় ভরা 'আউট হাউস'টা দেখতে দেখতে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে নিজের এখনকার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন।

সুহাসিনীর একটা দোষ ছিল, রাত্রে শুতে এসে প্রথমে প্রসন্ননাথের পায়ে নিজের শাড়ির আঁচল চাপা দিত। দু-মুহূর্ত পরেই উঠিয়ে নিত। নিয়ে কপালে হাত ছোঁয়াত প্রসন্ননাথের, কপালে, বুকে ; তারপর স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ত।

মেয়ে থাকত পাশের ঘরে, নানিমার সঙ্গে। নানিমা ছিল আরতির মায়ের বেশি। সম্পর্কে সুহাসিনীর মাসি। বিধবা। মাঝবয়েসী। কাজেকর্মে অতটা চটপটে না হলেও আরতিকে মানুষ করায় তার ত্রুটি ছিল না।

মেয়ের জন্মের পর সুহাসিনীকে সূতিকায় ধরেছিল। মরে যেতে যেতে সুস্থ হয়ে উঠল সুহাসিনী, শরীর স্বাস্থ্য ফিরল আবার বারো আনা, শ্রী এল

চোখ-মুখের, কিন্তু কিসের এক গোপন ব্যাধি বাসা বাঁধল বুকে। মেয়েকে সামলাতে পারত না। নানিমাকে আনা হয়েছিল সুহাসিনীর অসুখের সময় থেকেই।

সূতিকাটা বোঝা যায়। নিতান্তই হাতুড়েপনা আর অযত্নের জন্যে। কিন্তু সে-অসুখ তো সেরে গিয়েছিল। বুকের ব্যাধিটা কেমন করে হল। যক্ষ্মা নয়, হাঁপানিও নয়। অথচ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট বাড়তে বাড়তে সুহাসিনীর এমন অবস্থা হল যে, সে প্রায় অক্ষম হয়ে গেল সাংসারিক জীবনে।

মারাও গেল আচমকা। স্নান সেরে এসে কাপড় ছেড়ে চুল আঁচড়ে সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়াচ্ছিল, হঠাৎ বিছানায় এসে শুলো, আর তার পরেই সে নেই।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রসন্ননাথ যে ভীষণ বিচলিত হয়েছিলেন, এটা বোঝা যায় তাঁর নানান ব্যবহার থেকে। কাজেকর্মে নিস্পৃহ উদাসীন হওয়ার চেয়েও বড় কথা, তিনি হঠাৎ পরলোকচর্চায় ঝুঁকে পড়লেন। মৃত্যুর পর আত্মাদের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে নিজেই পাগল হয়ে যাবার জোগাড় করেছিলেন। সামলে নিলেন শেষ পর্যন্ত। শোকের ক্ষতও সময়ে মিলিয়ে আসে।

হোমিওপ্যাথি বায়োকেমিকে শখ ছিল না প্রসন্ননাথের। স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর কী ধারণা হয়েছিল হাল আমলের ডাক্তারি শাস্ত্র সম্পর্কে কে জানে—প্রসন্ননাথ হোমিও শাস্ত্রটায় মন বসালেন। বই আনালেন একরাশি, বাক্সকয়েক ওষুধ। তারপর তাঁর ডাক্তারি পাঠ শুরু হল।

এই নেশাটা এখনও আছে। বরং বলা যায় দশ গুণই বেড়ে যেত, যদি না 'রত্ননিবাসের' ম্যানেজারি করতে হত।

বাইরের লোকজন এ-বাড়িতে আসতে পারবে না এমন কোনো নিয়ম নেই। তবে সাধারণত লোকে আসে না। আসে না সঙ্কোচবশে, হয়ত অস্বস্তিকর কারণে, ভয়ে। এক আধজন অবশ্য এসেও পড়ে বড় ম্যানেজারবাবুর কাছে। কিংবা তিনি কোনো কাজে বাজারের দিকে গেলে কেউ কেউ তাঁকে ছেঁকে ধরে।

আজ ফাগুলাল বলে একটা লোক বিকেলে এসেছিল। বলল, তার বউয়ের বুকের দুধ শুকিয়ে ব্যথা হয়েছে, জ্বর হয়েছে, বাচ্চা দুধ খেতে পাচ্ছে না।

প্রসন্ননাথ তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্স নামিয়ে নিয়ে তখনই কোনো ওষুধ দিলেন না। বললেন, "কাল সকালে এসো। আজ বাচ্চাকে ওই দুধে মুখ দিতে দেবে না। জরুকে বলবে, জামা-উমা সাফ রাখতে।"

ফাগুলাল বলল, "আগার দরদ্ আরও বেড়ে যায় তো?"

প্রসন্ন বলেন, "বাড়তে পারে। ডর পাবার কিছু নেই। কাল এসো।"

ফাগুলাল চলে গেল।

ফাগুলাল এ-বাড়িতে মাঝেসাঝে আসে। প্রসন্ননাথ মানুষটার গুণাগুণ জানেন। জেলখাটা দাগী চোর। খুনের মামলাতেও জড়িয়ে পড়েছিল একসময়ে। বেঁচে গিয়েছে কপালজোরে। চুরি-চামারিতে পাকা হাত। এখন ফাগুলাল সুখনবাবুর বাড়ির কেয়ারটেকার, দরোয়ান—যা বলো তাই। বাড়িটা শ'পাঁচ গজ দূরে। ছিল পাটনার এক বাঙালি উকিলের বাড়ি। সুখনবাবু কিনে নিয়েছেন। তিনি থাকেন ধানবাদে। ব্যবসাদার মানুষ।

ফাগু দাগী হলেও, টাকার বশ। বিশ্বাসী। স্বভাব খানিকটা কুকুরের মতন। মালিকের কাছে নিরীহ, অন্যের কাছে ভয়ংকর।

তবে ফাগুলালের আগের বিক্রম কিছু আর নেই। বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে। চাকরি নিয়েছে সুখনবাবুর। তার বউয়ের এটা বোধহয় দু-নম্বর বাচ্চা।

প্রসন্ননাথ সন্ধেবেলায় সামান্য পুজোপাঠ করেন। পুজোপাঠ বলতে তিনি কিছুক্ষণের জন্যে বসেন আসন পেতে। তাঁর একটা ছোট ঠাকুরঘর আছে। সেখানেই বসেন। কালীভক্ত মানুষ।

নিত্যদিনের মতন আজও ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফাগুলালের বউয়ের ওষুধের কথাই প্রথমে তাঁর মনে পড়ল। ফাগুর বউয়ের বিশেষ কিছু হয়নি। ময়লা, অপরিষ্কার থাকার দরুন, নোংরা জামাটামা থেকে ইনফেকশান হয়েছে স্তনের বোঁটায়। হয়ত দুধের সঙ্গে রোগটা ছড়িয়ে গিয়েছে। সদ্যপ্রসূতা বউ।

মনে মনে কোন ওষুধ দেবেন ভেবে নিচ্ছিলেন। ফাগুর বউ অ্যালাপাথি ওষুধ খেলে কাল বিকালেই আরাম পেত। ওরা চট করে ডাক্তারের কাছে ছুটতে চায় না। দেহাতি টোটকা-টুটকি করে। শেষে ছোটে এখানকার কবিরাজ বৈজুর কাছে। কেউ কেউ সাহস করে প্রসন্ননাথের কাছেও চলে আসে। তবে কম।

প্রসন্ননাথের হাতযশ আছে। রত্ননিবাসের মানুষগুলো তো তাঁর ওষুধই খায়। কর্তামা বাদে। ওঁর বেলায় প্রসন্নের নিজের উৎসাহ নেই, সাহসও নেই। কর্তামায়ের পছন্দ কবিরাজী। ম্যানেজারের ওষুধে তাঁর বিশ্বাস নেই। দায়ে অদায়ে এই শহরের ডাক্তারই তাঁর ভরসা।

বারান্দা থেকে সরেই আসছিলেন প্রসন্ননাথ। সরে আসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর চোখে কী যেন ধরা পড়ল। তাকিয়ে থাকলেন তিনি। আউট হাউসের কাছে অন্ধকারে ওরা দু-জন কারা? খানিকটা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন জায়গায় রয়েছে যে তাদের চোখে পড়ার কথা নয়। অন্তত মূল বাড়ি থেকে।

প্রসন্ননাথের চোখের দৃষ্টি মরা নয়। অন্ধকার না হলে চট করেই তিনি চিনে

ফেলতে পারতেন। চশমার কাচ মুছে নিয়ে আবার তাকালেন!

বারান্দা থেকে সরে গেলেন না প্রসন্ননাথ। অপেক্ষা করতে লাগলেন। কতক্ষণ আর ওরা এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ? কতক্ষণ ? বাড়ির দিকে ফিরলেই প্রসন্ননাথ ধরতে পারবেন, ওরা কারা ?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ওরা ছাড়াছাড়ি হয়ে এগিয়ে আসতেই প্রসন্ননাথ দু-জনকেই ধরে ফেলতে পারলেন।

মেয়েটা নন্দা। নন্দাই আগে বাড়ির দিকে চলে গেল।

সামান্য পরে যে এগিয়ে আসতে আসতে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল—প্রসন্ননাথ তাকেও চিনতে পারলেন। নরেশ মজুমদার।

আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার ছিল না।

নিজের ঘরে এসে প্রসন্ননাথ ঘরের বাতির আলো অল্প বাড়িয়ে নিলেন। পার্বতীকে ডাকলেন। সাড়া পেলেন না।

পার্বতীর এ-সময় ওপরে থাকার কথাও নয়। নিচে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ত। কিংবা সেলাই ফোঁড়াই করছে নিচে বসে। নিচেই ওর থাকার ঘর। প্রসন্ননাথ নিজের মহলের নিচেই ওকে রেখেছেন।

প্রসন্ননাথ বিছানায় বসলেন।

নরেশ আর নন্দাকে এভাবে দেখা যাবে প্রসন্ন ভাবেননি।

এই বাড়ির অন্দরমহল আর বাইরের মধ্যে কোনো সরাসরি পরদা নেই। এখন অন্তত নয়। তবু একটা নিয়ম মানা হয়। অন্দরমহলের মেয়েরা প্রয়োজন ছাড়া বাইরের লোকের কাছে বেরোয় না।

নন্দার সঙ্গে নরেশের প্রয়োজনটা কী হতে পারে ? কেন অজানা অচেনা একটা লোকের সঙ্গে সে এইভাবে লুকিয়ে অন্ধকারে দেখা করছে ? নরেশ আর নন্দার মধ্যে কি কোনো পুরনো জানাশোনার সম্পর্ক আছে ?

প্রসন্ননাথের সুপারিশে কিংবা তাঁর খোঁজ খবরের পর নন্দা এ-বাড়িতে আসেনি। শেফালি তাকে এনেছে। শেফালির লোক নন্দা।

উটকো লোকজনকে এ-বাড়িতে কোনো দিনই ঢোকাতে চাননি প্রসন্ননাথ। শেফালির বেলায় অবশ্য তা বলা যায় না। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখেছিল শেফালি। পঁচিশ তিরিশটার বেশি জবাব আসেনি বিজ্ঞাপনের। হয়ত দূরে এসে কাজকর্ম করতে চায়নি অনেকেই। অসুস্থ অক্ষম এক অতিবৃদ্ধার দেখাশোনার দায়িত্ব স্থায়ীভাবে নেবার আগ্রহও বোধহয় ছিল না অনেকেরই। ফলে পঁচিশ তিরিশ জনের মধ্যে থেকে শেফালিকেই বেছে নিতে হয়েছিল। প্রসন্ননাথ, ডাক্তারবাবু আর স্বয়ং কর্তামা—তিনজনে আলোচনা করেই

শেফালিকে বেছে নিয়েছিলেন।

নন্দার বেলায় তা হয়নি। শেফালি নিজেই কর্তামাকে বলে নিজের খুশি মতন লোক আনিয়েছিল।

প্রসন্ননাথ ব্যাপারটায় খুশি হননি।

শেফালি যদি তার নিজের মতলবে লোক আনতে পারে এ-বাড়িতে, তবে প্রসন্ননাথ তো একটা নয়, তিনটে লোক আনতে পারেন।

না, রেষারেষি করে নয়। শেফালির সঙ্গে প্রসন্ননাথের আকাশ-পাতাল তফাত। পার্বতীকে নিজের কাজকর্মের জন্যে তিনি রেষারেষি করে নেননি, খানিকটা প্রয়োজনে খানিকটা দুর্বলতা বশত নিয়েছিলেন। মেয়েটা তাকে 'বাবা বাবা' বলে ডাকত। এ-শহরে এসে উঠেছিল 'মাধব কুঞ্জে'। একদিকে আশ্রম মতন, অন্যদিকে গুটিতিনেক বিধবার আখড়া 'মাধব কুঞ্জ'। বাড়ির মালিক লাহিড়িবাবু কলকাতার হাওড়া শহরে বসে লোহা লক্কড়ের কারবার করেন। টাকার কুমির। পুজোর সময় লাহিড়িবাবু তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে আসেন। পেছনে আসে গোটা দুই গাড়ি, দাস-দাসী। ধনী লোকের শখ, বাড়ির এক প্রান্তে আলাদাভাবে একটু মন্দির আর বিধবাদের আস্তানা করে দিয়েছেন। বিধবাদের ওপর বাবুর মায়া রয়েছে।

পার্বতী এসে উঠেছিল 'মাধব কুঞ্জে'। সেখান থেকে এ-বাড়িতে। মনোরমাদিদি ওকে একদিন এনেছিলেন প্রসন্ননাথের কাছে। একটা হাতের কনুই ফুলে ব্যথায় মরছে। এনেছিলেন, চিকিৎসার জন্যে। মেয়েটা প্রথম দিন থেকেই 'বাবা' বলে ডাকতে শুরু করল।

ব্যথা কমল, ফোলা চলে গেল, কিন্তু মেয়েটা মাঝে মাঝে আসতে লাগল। প্রসন্ননাথকে ধরল, কাজের জন্যে। বিধবাদের ফরমাশ খাটতে আর পারছে না সে।

শেষ পর্যন্ত প্রসন্ননাথ পার্বতীকে নিজের কাজের জন্যেই নিলেন। মাঝ-বুড়ি আশার মা বলে যে ছিল, সে আর থাকতে চাইছিল না।

নিজের মর্যাদা, অধিকার সম্পর্কে প্রসন্ননাথ বরাবরই সচেতন। তিনি অন্যদের মতন, এ-বাড়িতে প্রতিপালিত নন। তাঁর থাকা, খাওয়া, সংসার প্রসন্ননাথের নিজস্ব। পার্বতীকে আশ্রয় তিনি নিজে দিয়েছেন, তার খাওয়া-পরার খরচ, মাইনে প্রসন্ননাথই দেন। কারুর কিছু বলার নেই। থাকতে পারে না।

পায়ের শব্দ পেলেন প্রসন্ননাথ।

ভেবেছিলেন পার্বতী। পার্বতী নয়, ময়না।

"তুমি?"

ময়না কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। বলল, "দিদিমামণি জিজ্ঞেস করছিলেন—আপনি কি কবিরাজমশাইয়ের কাছে চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন ?"

"চিঠি লিখে রেখেছি। কাল সকালের ট্রেনে লোক যাবে।"

"শেফালিদির চিঠি— ?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

"ডাক্তারবাবু আজ আসেননি !"

"কাল আসবেন। আজ আটকা পড়ে গিয়েছেন। খবর দিয়েছেন।"

ময়না একটু দাঁড়িয়ে থাকল। কিছু যেন বলবে।

প্রসন্ননাথ তাকিয়ে থাকলেন।

ময়না বলল, "আমি দিদিমণিকে বলেছি।" ময়না বিদ্যা দেবীকে কখনও বলে দিদিমামণি, কখনও দিদিমণি, কখনও বা শুধু মণি।

প্রসন্ননাথ ময়নার মুখ দেখছিলেন। "কী বলেছ ?" তিনি অনুমান করলেন, ময়না আজ সকালের বৃত্তান্তই বলেছে।

ময়না বলল, "সকালে ওই লোকটা যা করেছে বললাম।" ময়না নরেশকে সম্মান দেখিয়ে 'ভদ্রলোক' বলল না, 'করেছেন'-ও বলল না।

প্রসন্ননাথ বললেন, "কে ছিল ঘরে ? শেফালি ?"

"না ; কেউ ছিল না। দিদিমণি একলাই ছিল।"

"শেফালি কোথায় ছিল ?"

"জানি না। নিজের ঘরে শুয়েছিল বোধহয়।"

"নন্দা ?"

"ছিল না।"

"কোথায় ছিল সে ?"

"জানি না।"

প্রসন্ননাথ একটু ভাবলেন। "কখন কথা বলেছ কর্তামায়ের সঙ্গে ?"

"এই তো খানিকটা আগে।"

মোটামুটিভাবে বোঝা গেল, প্রসন্ননাথ ভুল দেখেননি। নন্দাই ছিল মেয়েটা।

"উনি কী বললেন ?" প্রসন্ননাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"দিদিমণি বলল, কাল আপনার সঙ্গে লোকটার ব্যাপারে কথা বলবে।"

"আজও আমায় ডেকেছিলেন। শেষে বললেন, মাথাটা ঘুরছে, ভাল লাগছে না কথা বলতে..."

ময়না বলল, "লোকটা ভীষণ খারাপ। অসভ্য। আমায় যা খুশি বলল,

অর্জুনদাকেও খারাপ কথা বলল। যাকে যা মুখে এল বলে গেল।"

প্রসন্ননাথ শান্তভাবে বললেন, "ওর তাড়া বেশি।" গলার স্বরে মৃদু কৌতুক ছিল হয়ত।

"ইতর!"

"লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি যদি পায় ইতর হতে দোষ কোথায়?"

ময়নার চোখ রাগে লালচে হয়ে উঠেছিল। বলল, "হাত বাড়ালেই যেন সম্পত্তি! গাছের ফল। সোনার ছাদ মাথায় এসে পড়বে!...কত দেখলাম।" বলে ঠোঁট কুঁচকে তাচ্ছিল্যের ভাব করল। মোটা ভোঁতা নাকও ফুলে উঠল সামান্য। নরেশের ওপর তার রাগ আর ঘৃণা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

প্রসন্ননাথ যেন ময়নার মন ভোলাবার জন্যে বললেন, "যার যেমন স্বভাব। ওই ছোকরা রগচটা, হামবড়া গোছের।...ওর কথা ছেড়ে দাও। ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।...ভাল কথা, পার্বতী কোথায়? ডাকলাম—সাড়া পেলাম না?"

ময়নার মাথায় তখনও নরেশ ঘুরছিল। আজ সকালে লোকটা এমন বিশ্রীভাবে কথা বলেছে তার সঙ্গে, যেন ময়না এ-বাড়ির ঝি-দাসী। শুধু ধমকধামক মেরে কথাই বলেনি তার চোখেমুখে, মদ্দা কুকুরের খেপাখেপা ভাবও ছিল। হারামজাদা যেন চোখ দিয়েই গিলে খাচ্ছিল ময়নাকে।

নরেশের কথা ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্কভাবে ময়না বলল, "একটু আগে যে দেখলাম।"

"কোথায়?"

"নিচে যাচ্ছিল।"

"নিচে?"

"বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে যাচ্ছিল।"

একতলায় মানে রত্ননিবাসের নিচের তলায়। প্রসন্ননাথ বুঝতে পারলেন না, পার্বতীর একতলায় যাবার কোন্ দরকার ঘটল? দরকার যে একেবারেই ঘটে না তা নয়। নিচের তলায় পেছন দিকে এই বাড়ির দাসদাসীর থাকার মহল। রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও নিচে। রান্না, ভাঁড়ার, কয়লা, কাঠ সবই নিচে। তাছাড়া বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতন এ-বাড়িতে সংসারের লোকের চেয়ে দাসদাসী কাজের লোকই বেশি। তার কারণও রয়েছে। কাজকর্ম সাত সতেরো রকম, লোক ছাড়া চলে কেমন করে?

পার্বতী হয়ত নিচে থেকে কিছু আনতে গিয়েছে। যায়ও। গল্পগুজবও করতে যায়। ওরা ওকে পছন্দও করে। হাসি গান মজা করে পার্বতী। সবাই ওর মাসি

কিংবা মামা।

প্রসন্ননাথ এটা নজর করে দেখেছেন, রত্ননিবাসে পার্বতীর অবস্থা অনেকটা কাজেব লোকের মতন। অর্থাৎ সে রাঁধুনি মেয়ে, কাজের মেয়ে। শেফালি, ময়না—এরা বিশেষ গা-মাখা ভাব দেখায় না পার্বতীকে। তাদের মানে লাগে বোধহয়। নিচে দাসদাসী মহলে পার্বতীর আসা-যাওয়া সহজ। পার্বতীর তাতে মনে লাগে কিনা কে জানে!

প্রসন্ননাথের মনে হয় পার্বতীর বেলায় খানিকটা ঈর্ষাও ওপরতলায় কাজ করে। মেয়েটা দেখতেও মোটামুটি ভাল। শেফালির চেয়ে, ময়নার চেয়ে। শেফালি হল সাধারণ, মাঝারি। খানিকটা রুক্ষশ্রী। ময়নার গড়ন ভাল, শরীর আঁটোসাঁটো, শক্ত। রঙ বেশ ময়লা। এর বাইরে যা আছে ময়নার তা অন্য কারোও নেই। ওর মধ্যে এক ধরনের আদিমতা রয়েছে। চেহারায়। স্বভাবেও।

ময়না চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, বলল, "পার্বতীকে ডেকে দেব ?"

"থাক্। আসবে নিজেই।...তুমি বরং কর্তামাকে গিয়ে বলো, কাল যেন সকালেই আমায় ডেকে পাঠান। দরকার আছে।"

"এখন আর যাব না। চোখ বুজে শুয়ে আছেন। তন্দ্রায় রয়েছেন হয়ত। ঘুমোতে পারেন না। ওষুধ খেয়েও ঘুম আসে না।"

"কাল সকালেই বলো।"

ঘাড় হেলিয়ে ময়না বলল, "বলব।" বলে চলে গেল।

অল্পক্ষণ বসে থাকলেন প্রসন্ননাথ। তারপর উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে জল গড়িয়ে খেলেন নিজের হাতেই। তেষ্টা পেয়েছিল।

আবার নিজের শোবার ঘরে ফিরে এলেন।

নরেশ সম্পর্কে ভাবছিলেন। ছোকরাকে আজ সকালে তিনি খানিকটা শিক্ষা দিয়েছেন। চেঁচামেচি, গালমন্দ, বাগাড়ম্বর তিনি পছন্দ করেন না। ছোকরা জানে না, ময়না, অর্জুন, ভগীরথ কিংবা বেচারী ঝুনুর মায়ের গোত্রের মানুষ প্রসন্ননাথ নন।

নরেশ প্রথমে প্রসন্ননাথেব কাছেই এসেছিল। যখন শুনল, আজ তার সঙ্গে বাড়ির মালিকানির দেখা হবে না—তখন চটে গিয়ে দু-চারটা বাজে কথা বলেছিল। প্রসন্ননাথ তার জবাব প্রায় দেননি। শুধু বলেছিলেন, "আপনার সুবিধে দেখার চেয়ে আমরা আমাদের সুবিধে আগে দেখব। একজন বৃদ্ধা অসুস্থ মহিলার কথা আমরা আগে ভাবব, না আপনার কথা ?"

নরেশ বড় ম্যানেজারের গলার স্বর থেকেই বুঝতে পেরেছিল, মাটি বড়

শক্ত।

রাগের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে সে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল জোর করে। বাধা পায়। আর তখনই ময়না, অর্জুন—যাকে পেয়েছে সামনে গালমন্দ চেঁচামেচি করেছে।

বাধ্য হয়েই প্রসন্ননাথকে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তারপর তিনি একটি কি দুটি মাত্র কথা নরেশকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, আর কথা বাড়ালে নরেশকে এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, তাকে আর এখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

নরেশ চুপ করে গেল।

ওই ছোকরা সম্বন্ধে প্রসন্ননাথ নিজেই সন্তুষ্ট নন। তাঁর ধারণা, ছোকরা জুয়াচোর। কিংবা জাল। ও যে ভীষণ ধুরন্ধর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কতটা ধূর্ত তা এখনও বোঝা যায়নি।

ধন সম্পত্তি অর্থের লোভ মানুষকে কি না করতে পারে। ভোগ এবং বাসনা, কাম এবং ক্রোধ থেকে কে নিবৃত্তি পায়!

না, সেদিক থেকে দেখলে নরেশের কোনো দোষ প্রসন্ননাথ দেখতে পান না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ছোটখাট বিষয়-আশয়ের কথা বাদ দিলেও শ্রীমতী বিদ্যাবতী দাসীর যা সম্পত্তি এখনও রয়েছে—তার দাম প্রায় লাখ চল্লিশ। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও নয় নয় করেও ছ'সাত জায়গায় বিদ্যাবতীর টাকা খাটছে। তার পরিমাণও একেবারে কম নয়।

ভাগ্যবশে কোনো রাস্তার ভিখিরি এত টাকা আর সম্পত্তি যদি পেয়ে যায়—সে কেন ছাড়বে?

কিন্তু এই ভিখিরি কে? নরেশ, রথীন, না কমলকুমার? হয়ত কেউ নয়। আগেও তো নরেশদের মতন লোক এসেছে এ-বাড়িতে। এসেছে, এসে ভুল করেছে।

প্রসন্ননাথ পায়ের শব্দ পেলেন।

"পার্বতী?"

পার্বতী দাঁড়াল। তারপর ঘরে এল।

প্রসন্ননাথ দেখলেন, পার্বতী হাঁপাচ্ছে। যেন ছুটতে ছুটতে এসেছে।

"কোথায় গিয়েছিলে?" প্রসন্ননাথ পার্বতীকে লক্ষ করছিলেন।

পার্বতী যেন থতমত খেয়ে গেল। বলল, "নিচে।"

"তোমার কাপড় ছিঁড়লো কেমন করে?"

পার্বতীর শাড়ির আঁচলের একটা জায়গা ছিঁড়ে ফেসে গিয়েছে। শাড়ি সামলাতে সামলাতে পার্বতী বলল, "খোঁচা লেগে।"

প্রসন্ননাথ কিছু বললেন না। কিন্তু লক্ষ করলেন, পার্বতীর কাঁধের কাছে গাছের শুকনো পাতা আটকে আছে।

প্যাসেজে দেখা। একেবারে মুখোমুখি।

দাঁড়িয়ে পড়ে কমল স্বাভাবিকভাবে হাসল। নরেশ বলল, "গুড্ ইভনিং মিস্টার।"

কমল বলল, "এখন আব ইভনিং নেই। আটটা বাজতে চলল।"

"ড্যাম্ !...ওদিকে কোথায় ?"

"কোথায় নয়। বাথরুম...."

"আসুন আমার ঘরে।"

কমল তার ঘরের খোলা দরজা দেখাল। "আপনি যান ; আমি আসছি।"

নরেশ তার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

পাশাপাশি ঘর। কমলের এক পাশে নবেশ, অন্য পাশে রথীন।

নিজের ঘবে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল কমল। এখন আটটা কি সোয়া আটটার মতন। রথীন আর কমল অনেকক্ষণ আগেই ফিরে এসেছে। ঘণ্টাখানেক তো হবেই। নবেশ তার নেশাব পাট চুকিয়ে এই ফিরল বোধ হয়। আজ তার সাজসজ্জা কম জমকালো ; প্যাণ্ট আর কলাব তোলা ঘন নীল রঙের গেঞ্জি।

ঘরের দরজা বন্ধ করে কমল নরেশের ঘরে এল। এসে দরজা ভেজিয়ে দিল।

ততক্ষণে নরেশ তার সাজ পালটেছে। পাজামা পরা হয়ে গিয়েছে, হাফহাতা পাঞ্জাবি গায়ে চড়াচ্ছিল। বলল, "আমার ঘরে প্রথম পা দিলেন, বসুন।" নরেশের গলায় সামান্য কৌতুক।

কমল নজর করে নবেশের ঘর দেখল। প্রায় তার ঘরের মতনই। বড় বড় দুই জানলা। ঝুল বারান্দা নেই।

নরেশ নিজেই বলল, "লোকাল লিকার খেয়ে পেটে ঠাস মেরে গিয়েছে। ফিলিং প্রেগন্যান্সি...." বলতে বলতে জোরে হেসে উঠল। পেটে থাপ্পড় মারল। "ধেনোর বাবা ! 'রাম'-এর বাবা দশরথ হতে পারে। গুড়টুড় দিয়ে তৈরি কি না কে জানে !"

"আজ কি লোকাল খেতে গিয়েছিলেন ?"

"না মিস্টার, যাইনি। এখানেই হল।"

"এখানে ? ঘরে বসে ?"

"ঘরে বসে। আরে ছিছি। মন্দিরে গোহত্যা। এই বাড়ি একটা টেম্পল। দেবদেবীরা থাকেন। ঘরে বসে মাল খাবার জো আছে !"

কমল তাকিয়ে থাকল।

নরেশ বলল, "দরোয়ানের ঘরে বসে খেয়েছি। আউটসাইড দিস্ গণ্ডি" বলে আঙুল দিয়ে বাড়ির গণ্ডি বোঝাল। হাসল।

কমল অবাক হয়ে বলল, "দরোয়ানের ঘরে বসে ?"

নরেশ বলল, "দরোয়ান কত ভদ্দরলোক হতে পারে, ওবিডিয়েন্ট—আপনি গোবিন্দকে দেখলে বুঝতে পারবেন। বেটাকে টাকা দিয়ে বলেছিলাম—স্টেশনের বাজার থেকে এনে দিতে। কানাইবাবুর দোকান থেকে। বেটা আমাকে লোকাল মেডের লোভ দেখাল।...তবে কোনো অসুবিধে হল না। ওর ঘরের পেছন দিকে চাতালে চারপাইয়ায় বসে বসে উইথ্ ওয়াটার চালিয়ে দিলাম। ঝাল চানার সঙ্গে।"

কমল বুঝতে পারল। নরেশ আজ নিজে স্টেশন যায়নি। তার খোরাক সে দরোয়ানকে দিয়ে আনিয়ে নিয়ে দরোয়ানের ঘরে বসেই খেয়েছে। পানীয় এবং পান দুইই আনিয়েছিল নরেশ। কুলঙ্গির মধ্যে পানের দোনা পড়ে আছে এখনও। নরেশের ঠোঁটও পানের রসে লাল।

কমল গত কালই শুনেছে, এ-বাড়ির দরোয়ানকে বিকেলের পর বড় একটা দেখা যায় না। নেশাভাঙ করতে বেরিয়ে যায়। নরেশ ঠিক লোককেই ধরেছে। রতনে রতন চেনে। মদখোররা মদোদের আরও ভাল চেনে। এক ডালের পাখি।

নরেশ বলল, "আজ মেজাজটা ভাল নেই। তারপর যা পেটে পড়ল—ফেঁপে মরছি, যদি না ঘুমোতে পারি !"

"আপনারও কি ঘুমের রোগ ?"

"একেবারেই নয়। মিস্ত্রিমজুর মানুষ। খাটি, খাই, নাক ডাকিয়ে ঘুমোই।"

"তা হলে আর দুশ্চিন্তা কিসের ?"

"মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে। সকাল থেকে।...কিছু জানেন না ?"

"না।" কমল মাথা নাড়ল। ইচ্ছে করেই।

"আজ একহাত হয়ে গিয়েছে। ওই বেটা বুড়ো, ব্লাডি ওল্ডকে নিয়েছি একহাত। তারপর যে কটাকে সামনে পেয়েছি।"

যেন কিছুই জানে না, কমল বলল, "হয়েছিল কী ?"

"আরে এরা পয়লা নম্বরের শয়তান। জোচ্চোর। চিট্। এরা ভেবেছে আমি শালা কুত্তা। মুখের সামনে মাংস ঝুলিয়ে রেখে আমায় নাচাবে। আই অ্যাম নট্ এ ডগ্। আর যদি কুত্তাই হই, আমি ফেরোসাস্। ওরা আমার দাঁতের ধার জানে না। গলার টুঁটি যখন ছিঁড়ে ফেলব, বুঝতে পারবে।"

কমল মুখে কিছু বলল না। মনে মনে হয়ত মজা পেল। নরেশ খানিকটা নাটকীয় স্বভাবের। কথাবার্তার মধ্যেও নাটকের ভাব আছে। তবে হ্যাঁ, নরেশকে দেখলে বোঝা যায় ওর মধ্যে কোনো পশুসুলভ হিংস্রতা রয়েছে। টুঁটি ছেঁড়া একেবারে অসম্ভব নয়।

গায়ের হাফ হাতা পাঞ্জাবিরও খানিকটা গোটাতে গেল নরেশ উত্তেজনা বশে। ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করল। হঠাৎ যেন খানিকটা খেপে গিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেট বার করে কমলকে দিল। বলল, "ওই ব্লাডি রাস্কেল বুড়োকে আমি সাফ বলেছি, তার কলকাঠি নাড়া আমি ধরতে পারছি। ও-ব্যাটাই আসল শয়তান। বুড়ির সঙ্গে দেখা করানোর ইচ্ছে ওর নেই। বাগড়া মারছে।"

"কেন?"

"ওর নিজের ইন্টারেস্টের জন্যে?"

কমল সিগারেটের প্যাকেটটা বিছানা থেকে তুলে নিল। বলল, "ওঁর কিসের ইন্টারেস্ট?"

কমলের কথা শুনে নরেশ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের ভাব দেখে মনে হল, সে বলতে চাইছে, কী বলছেন মশাই আপনি? আপনার মাথা ঠিক আছে তো? বোকা বুদ্ধুর মতন বাত বলবেন না।

নরেশ বলল, "ওর ইন্টারেস্ট নেই? আপনি বলেন কী? এত বড় সম্পত্তি যার মুঠোয় সে কি কাঁচকলা চোসার জন্যে বসে আছে?"

কমল একটা সিগারেট বার করতে করতে বলল, "কত বড় সম্পত্তি?"

"জানি না," নরেশ মাথা নাড়ল। "আপনি জানেন?"

কমলও মাথা নাড়ল।

"ধুর মশাই, আপনিও তো আমার মতন। কিছুই জানেন না।"

কমল মুখে একটু হাসল। বলল, "সম্পত্তির হিসেব রাখার কথা আমাদের নয়, নরেশবাবু। কেমন করে জানব, বলুন? আমরা এসেছি পাবার আশা নিয়ে। কী পাব—ঈশ্বরই জানেন।"

নরেশ এবার কী মনে করে কাছে এসে বিছানায় বসে পড়ল। কমলের প্রায় পাশেই। বসে নিজেও একটা সিগারেট নিল প্যাকেট থেকে। নিয়ে কমলের

সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটাও ধরাল। কিছু ভাবছিল।

"আপনার কোনো ইনফরমেশন্ নেই ?" নরেশ বলল। সরাসরি তাকিয়ে থাকল কমলের দিকে। মনে হল নরেশ কমলের ব্যাপারে সন্দেহ করছে।

কমল নরেশের মুখ থেকে মদের গন্ধ পাচ্ছিল। নরেশের চোখ লালচে হয়ে আছে। গতকালের মতন নাও হতে পারে। কমল মাথা নাড়ল। "না।"

নরেশও মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "আমারও নেই। তবে চেষ্টা করছি।"

কমল কী মনে করে একটু হাসল। "কোন্ মেয়ের কথা বলছিলেন—তার কাছ থেকে নাকি ?"

"নন্দা !....ও ড্যাম্—" নরেশ নিজের পায়ে থাপ্পড় মারল। "নন্দা কী জানবে ! জাস্ট্ একটা আয়া।"

"তবে ?"

"আছে। চেষ্টা করছি।...চেষ্টা করছি।....কিন্তু মশাই, এই ব্যাপারটা সিক্রেট। বলতে পারব না।....আপনাকে আমি কথা দিয়েছি, এই শালা রাজত্ব পাবার খেলায় আমরা ভদ্দরলোকের মতন খেলব। ফ্রি ফর অল। তবে, এমন সময় আসতে পারে যখন আপনি আমায় সরাতে চাইবেন, আমিও চাইব আপনাকে হঠাতে। সেটা লাস্ট্ লিমিট। তখন নো মারসি, নো ফ্রেন্ডশিপ ! তার আগে দেখি, আপনার দাবি কতটা টেঁকে ?"

কমল সিগারেটের ধোঁয়া গিলে দু মুহূর্ত বসে থাকল। পরে বলল, "আপনার নিজেরটা টিকবে ?"

নরেশ লাফ মেরে উঠে পড়ল। বলল, "সিওর। আমি কি ফালতু এসেছি ? আমার কাছে যা আছে তাতে ওই বুড়িকে আর কথা বলতে হবে না। বোবা মেরে যাবে। নাড়িনক্ষত্র টেনে বার করে দেব বুড়ির। ওর ঠিক জায়গায় আমি কোপ মারব। আপনি দেখবেন।....শুধু রাস্কেল বুড়োটার প্যাঁচে বুড়ির সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।....ঠিক আছে, কত দিন বুড়ি শরীর খারাপ নিয়ে থাকবে ! একদিন দু দিন। তারপর.... ?"

কমল উঠে দাঁড়াল। "আপনি খুবই চেষ্টা করছেন। দেখুন কী হয়। নন্দা না কী—ওই মেয়েটাকে দিয়ে সুবিধে করতে পারছেন না তাহলে ?"

নরেশ বিরক্ত হয়ে ওঠার মতন করে বলল, "কোথায় পারছি ! মনিবের ভয়েই মরছে নন্দা।"

"মনিব ?"

"আরে ওই নার্সটা—শেফালি চামেলি—কি যেন। বুড়ির তালাচাবি। ও মাগিই নাকি বুড়ির রুটিন ঠিক করে দেয়। অলমোস্ট এভরিথিং। কানে কানে

মন্তর-টন্তরও দেয়। বুড়ির ওপর জোর কন্ট্রোল।···আপনি দেখেছেন শেফালিকে ?”

“না।”

“আমি দেখেছি। আদুরে বেড়ালের মতন দেখতে।···নন্দা বলছিল, ওই শেফালির তিনটে চোখ। কুত্তির নাক্। গন্ধে গন্ধে সব বুঝে ফেলে। দারুণ চালাক। বদমেজাজি, কড়া ধাতের। মেয়েছেলেটি সুবিধের নয় মশাই ! নিজের ব্যাপার ভালই বাগাতে পারে। আবামসে আছে।···আমি তো ওই শেফালি ছুঁড়িকেই ম্যানেজ করতে চাইছিলাম—নন্দাকে টাকাপয়সা খাইয়ে। হচ্ছে না। একটা টোপ আবার দিয়ে রাখলাম—দেখা যাক কী হয় ?”

কমল জিজ্ঞেস করল না, কিসের টোপ ? কী টোপ ?

“চলি।” কমল চলে আসার জন্যে পা বাড়াল।

নরেশ বলল, “একটা কথা আপনাকে বলি। আপনি এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারলেন না। বসে বসে সময় কাটাচ্ছেন। নেচার দেখছেন। পথঘাট গাছপালা পাখি··· । আর্টিস্ট মানুষ। দেখুন, যত পারেন মহুয়া পলাশ দেখুন। তা দেখুন—আমার তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই বাড়িটা বসে বসে হাওয়া খাওয়ার জায়গা নয়। দিস্ ইজ্ এ ডেনজারাস প্লেস। এখানে একবার ঢুকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া মুশকিল। বি কেয়ারফুল!”

কমল যেন কিছুই জানে না, নিরীহ গলায় বলল, “কেন, প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া মুশকিল কেন ? এটা কি বাঘ সিংহের গুহা ?”

“বাঘ তো ভাল, এ হল ঘোগের বাসা !···সাবধানে থাকবেন।”

কমল মাথা নাড়ল সামান্য। মনে হল, উপদেশটা মেনে নিল।

চলে গেল কমল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল নরেশ। দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। বিছানায় গিয়ে বসল একবার। বসেই উঠে পড়ল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা বাতাস। শীতের ছোঁয়া রয়েছে। নরেশের শীত করছিল না। শরীর এখনও গরম রয়েছে ভেতরে। দিশি—একেবারে দেহাত জিনিস তার বরাবর না চললেও অপছন্দ নয়। মুখের স্বাদ বদলায়। তবে আজ দরোয়ান গোবিন্দ যা খাওয়াল তেমন জিনিস আগে বড় একটা খায়নি। শালা, শরীর আনচান করে ছাড়ল। একবার জৌনপুরে ব্রিজেশ বেটা তাকে এক চিজ খাইয়েছিল—খেয়ে এমনই অবস্থা যে দু-দুটো দিন একেবারে নাঙ্গাবাবা হয়ে থাকতে হল।

গোবিন্দ যা খাইয়েছে তার সঙ্গে ব্রিজেশের খাওয়ানো জিনিসের তুলনা চলে না। সে ছিল মারাত্মক, আর এ অনেক হালকা পাতলা। তবু নরেশের ধারণা,

কোনো কিছুর মিশেল ছিল, নয়ত শরীরের ভেতরটা এমন হত না।

ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারল নরেশ যখন সে নন্দার সঙ্গে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল। শুকনো কথাবার্তার চেয়েও তখন তার শরীর ছটফট করছিল—অন্যরকম শারীরিক চাঞ্চল্য এসে গিয়েছিল।

আজ নন্দা দারুণ সাফসুফ হয়ে এসেছিল। ধোয়া গা, এত্ত বড় করে বাঁধা খোঁপা, সাদা জামা, রঙিন শাড়ি, পাউডারের গন্ধও আসছিল গা থেকে। নরেশ নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। আদুরে খেলা করতে শুরু করে দিল। নন্দা ভয় পেয়ে নরেশকে টানতে টানতে আরও আড়ালে নিয়ে গেল, একটা পোড়ো বাড়ির আড়ালে।

নন্দার ভয় দেখে নরেশ বিরক্ত হচ্ছিল। আম জাম কাঁঠাল কুল পেয়ারা গাছে ভরতি এত বড় বাগান, এত আগাছা, আর এমন অন্ধকার—এখানে কোন শালা কাকে দেখে। পেছন থেকে এসে চুপিচুপি ছোরা গিঁথে দিলেও ধরার উপায় নেই।

তা নরেশ খানিকটা নন্দার সঙ্গে আদুরে খেলা খেলল। জন্তু-জানোয়াররা যেমন মদ্দামাদির খেলা খেলে। নিছক খেলা। তারপর আর নরেশের ভাল লাগছিল না। বুকের তলায় পেটের কাছে অস্বস্তি হতে শুরু করল।

কাজের কথা তুলল নরেশ।

নন্দা বলল, 'দিদির সঙ্গে আপনি কথা বলুন।'

'কেমন করে ?'

'ভোরের দিকে দিদি বাগানে বেড়ায়। ধুমসি হয়ে যাচ্ছে যে!'

শেফালি ভোরবেলায় বাগানে ঘোরে নরেশের জানা ছিল না। বলল, 'কোন দিকে ঘোরে ?'

'বাড়ির পেছন দিকে এই দিকটায়।'

'একলা ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি তখন কোথায় থাক ?'

'বুড়ির কাছে, পাশের ঘরে।'

নরেশ কিছু ভাবল, তারপর আচমকা বলল, 'শেফালিরানী মাঝে মাঝে কাকে চিঠি লেখে কলকাতায় ?'

নন্দা থতমত খেয়ে গেল। ভয় পেল। বলল, 'আমি তো জানি না।'

নরেশ যেন আদর করে নন্দার গলায় হাত রাখল। জড়িয়ে নিল। 'মিথ্যে

কথা বলো না। তুমি জানো।'

'না না, আমি জানি না।'

'তুমি জান। তুমি আজই একটা খাম নিয়ে গিয়ে দরোয়ানকে দিয়েছ, ডাকে দিতে। ঠিক কিনা?'

নন্দা আর কথা বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে ভয়ের গলায় বলল, 'কে বলল আপনাকে?'

'দরোয়ান।'

ধরা পড়ে যাবার পর নন্দা বোধ হয় সাহস পেল সামান্য। বলল, 'আমি লেখাপড়া জানি না। বাংলা পড়তে পারি। দিদি ইংরিজিতে ঠিকানা লেখে। কাকে লেখে কেমন করে বুঝব! আমায় হুকুম করে দরোয়ানকে দিয়ে আসতে, দিয়ে আসি। এ-বাড়ির চিঠিপত্তর নিয়ে দরোয়ান রোজ ডাকঘরে যায়। তাই তাকে দিয়ে আসি।'

'হাতে হাতে না দিয়ে এলে হয় না? অফিসঘরে রেখে এলেও তো রোজকার চিঠিচাপাটি রেজিস্ট্রি মানি অর্ডার যায়। যায় না?'

নন্দা কোনো কথা বলল না।

নরেশ নন্দার পিঠের দিকটা জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার দিদির নামেও চিঠি আসে? আসে না?'

'মাঝে মাঝে। বাড়ির চিঠি।'

'সেই পুরনো চিঠি আমাকে একটা এনে দেবে। কালই চাই।'

নন্দা যেন আঁতকে উঠল।

নরেশ বলল, 'তোমার কোনো ভয় নেই। আমি আছি। যদি চাকরি যায়—আমি তোমায় নিয়ে যাব। আমার কাছে থাকবে।'

নন্দাকে তারপর ছেড়ে দিল নরেশ। টাকা গুঁজে দিল হাতে—যেমন দেয়।

এই দু তিন দিনেই নরেশ বুঝতে পারছে শেফালি পাকা সোনা নয়। তার মধ্যে খাদ আছে। কতটা খাদ—নরেশ অবশ্য জানে না। তবে আছে।

আজ তার দিনটা খারাপ ভাবে শুরু হলেও সন্ধের গোড়া থেকে ভালই যাচ্ছে। সকালের শুরু দিয়ে দিন বোঝা যায় না সব সময়। নরেশের সকাল যত খারাপ ভাবেই শুরু হোক না, আজ সে খানিকটা লাভবান।

দরোয়ান গোবিন্দ বা গোবিন্দ-এর ঘরের পেছন দিকে চাতালে চারপাইয়ার ওপর বসে মদ্যপান করতে করতে নরেশ গোবিন্দকে ওস্কাচ্ছিল। সোজা কথা তার কাছ থেকে কিছু খোঁজখবর বার করতে চাইছিল।

নরেশ চমৎকার দিলদরিয়া মেজাজে গোবিন্দ-এর সঙ্গে গল্প করছিল যেন ওই

লোকটা তার বন্ধু। কোনো ভেদাভেদ নেই।

নরেশের যে অন্য মতলব, দরোয়ান কি অতটা বোঝে?

কথায় কথায় নরেশ বুঝতে পারল, গোবিন্দ দেওঘরের লোক। একসময় কুণ্ডার এক বড় লোকের বাড়িতে কাজ করত। তার সেপাই হওয়ার শখ ছিল বরাবরই। জোয়ান বয়েস, পালোয়ানি চেহারা, কুস্তি লড়ত আখড়ায়, হনুমানজির নাম করে গায়ে মাটি মাখত আখড়ায়। লাঠি খেলাও শিখেছিল।

সেপাইয়ের চাকরি পাইয়ে দেবার নাম করে তার এক চাচা তাকে দানাপুর নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তাকে একটা চোর চোট্টা, হারামিদের দলে ভিড়িয়ে দেয়।....তিন বছর সে দানাপুরে ছিল। ওখান থেকে একদিন পালিয়ে চলে গেল নিজের দেশে দেওঘরে। গিয়ে দেখল, তার না আছে বাপ, না মা। ছুকরি বউ জোয়ানি হয়ে দেশে ভাগলপুরে ভেগে গেছে।

তারপর বাবুজি ঘুরতে ফিরতে ইধার উধার ঘুমতে ঘুমতে এই বাড়িতে চলে এলাম।

নরেশ যতটা পারে অন্তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল গল্প করতে করতে। আর গোবিন্দও ফাঁক ফোকর খুঁজে আড়ালে গিয়ে দু চার ঢোঁক গিলে নিচ্ছিল।

নরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি বরাবর এখানে দরোয়ানগিরি করছ?'

মাথা নাড়ল গোবিন্দ। সে আগে এ-বাড়িতে কখনো-সখনো টমটম হাঁকাত। দেওঘরের লোক, টাঙা চালাতে জানত আগেই। তবে এ-বাড়িতে তার কাজ ছিল চাপরাশির। ছোট ম্যানিজারবাবুর সঙ্গে সে ইধার উধার যেত। মিট্টি কারখানায়, শিসা কারখানায়। চামড়ার থলি করে পাঁচ দশ হাজার কাঁচা টাকাও বয়ে নিয়ে যেত ম্যানিজারবাবুর সঙ্গে। একলাও গিয়েছে কতবার।

মিট্টি কারখানা কী?

নরেশ খোঁজখবর করে বুঝল, এ বাড়ির টাকা-পয়সার কিছু কিছু বাইরের ক্লে মাইন্স, গ্লাস ফ্যাক্টরিতে খাটত একসময়।

গোবিন্দ কথা বলতে বলতে ছোট ম্যানেজারের জন্যে হা-হুতাশ করল অনেক। ভালো আদমি ছিল ছোট ম্যানিজারবাবু। শিকারের শখ ছিল। বন্দুক চালাতে পারত।

এ-বাড়িতে বন্দুক আছে? নরেশ জানতে চাইল।

দো বন্দুক।

ছোট ম্যানেজারের সঙ্গে বড় ম্যানেজারবাবুর ঝগড়া হল, বাবুজি।

ছোট ম্যানিজারবাবু নোকরি ছেড়ে চলে গেল। গোবিন্দ-এরও কপাল পরশুড়ল। সে ছোট ম্যানেজারের পেয়ারের লোক ছিল—এই দোষে তাকে

চাপরাশি থেকে দরোয়ান করে দিল বড় ম্যানেজার। এখন তার আর কী কাজ! ডাকঘরে যাওয়া, এক আধদিন বাজারে যাওয়া কাজ পড়লে, ডাগ্‌তারবাবুকে চিঠটি দিয়ে আসা। তবে ডাকঘরের কাজটাই তাকে রোজই প্রায় করতে হয়। চিঠি থাকুক না থাকুক—একটা চিঠি থাকলেও যেতে হয়।

নরেশ কিছু বলার আগেই গোবিন্দ নিজেই বলল, আজ বাবুজি—একঠো চিঠটি ছিল। তবিয়ত খারাপ। ত্‌ভবি যেতে হল। বড়া দিদিমণির চিঠটি। জরুরি চিঠ্‌টি।

বড় দিদিমণি কে?

শেফালির কথা বলল গোবিন্দ।

নরেশ প্রথমে খেয়াল করেনি। পরে কৌতূহল হল। সুযোগ ছাড়ল না। কথার ফাঁকে জেনে নিল, শেফালির চিঠি সরাসরি দরোয়ানের হাতে দিয়ে যায় নন্দা। আর মাঝে মাঝে শেফালির নামেও চিঠি আসে। ডাকঘরের মুনশি পিয়নকে বলা আছে শেফালির চিঠি এলে আলাদা করে দিতে—অফিসের চিঠির সঙ্গে নয়। শেফালির হুকুম।

সন্দেহ হল নরেশের। শেফালির বেলায় এত চাপাচুপি কিসের? হুকুম কেন?

নরেশ অবশ্য জানতে পারল না, শেফালি কাকে চিঠি দেয়।

হতে পারে আত্মীয়স্বজনকে।

কিন্তু নিজের আত্মীয়স্বজনকে চিঠি দিলে এত লুকোচুরির কী আছে?

নরেশকে জানতে হবে, শেফালি কাকে চিঠি দেয়?

সামন্ত ডাক্তার মানুষটিকে দেখতে পাকা পেয়ারাফলের মতন। গোলগাল; বেঁটে। ধবধবে রঙ গায়ের। মাথায় টাক; ঘাড়ের কাছে কয়েকটি সাদা চুল। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। দু পাটি দাঁতই বাঁধানো। এখানকার লোকে বলে, শেতল ডাক্তার।

সবে ধন নীলমণির মতন শেতল ডাক্তার এতদিন এখানে বিরাজ করছিলেন। হালে একজন ছোকরা ডাক্তার এসে পড়েছে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে। বিহারী ছোকরা। ফলে শীতল বা শেতল ডাক্তারের পশার কমেছে সামান্য। তবে সে মারাত্মক কিছু নয়।

খাপরার ছাদ দেওয়া এক ফালি ঘরে বসে শেতল ডাক্তার একসময় প্র্যাকটি শুরু করেছিলেন। সে কি আজকের কথা! তখন এই শহরেই বা ক'জন লো থাকত! শেতল ছিলেন নিজেই ডাক্তার নিজেই কম্পাউন্ডার। তবে কষ্ট করে

কেষ্ট মেলে। ডাক্তার কষ্ট করতে করতে কেষ্ট লাভ করলেন। মানে পয়সা। আজ পঁচিশ তিরিশ বছরে শেতল ডাক্তার টাকার ছোটখাট কুমির হয়ে বসেছেন। দোতলা বাড়ি, দুই বউ। এক বউ সন্তানহীনা, অন্যজনের দুটি মেয়ে। বড় বউ বেশির ভাগ সময় গুরুর আশ্রমে গিয়ে থাকেন। দেওঘরে।

রত্ননিবাসের কাছে শেতল ডাক্তারের কিছু ঋণ রয়েছে, কৃতজ্ঞতা। প্রায় গোড়া থেকে রত্ননিবাসের পয়সা খেয়েছেন। সাহায্য পেয়েছেন। ও বাড়ির দয়া দাক্ষিণ্য না পেলে কী হত বলা যায় না। প্রয়োজনে অর্থ সাহায্যও পেয়েছেন।

মানুষটি যতই না অর্থলোভী হোন, রত্ননিবাসের চৌহদ্দিতে ঢুকলেই আচারে আচরণে একেবারে বদলে যান। তখন তাঁকে মনে হয় মাটির মানুষ, অতি সজ্জন। সরল।

সামান্য বেলা করেই এসেছিলেন শেতল ডাক্তার। তিনি জানেন, যে রোগীটিকে তিনি দেখতে যাচ্ছেন, বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার আগে গেলে তাঁকে দেখা যাবে না।

শেতল ডাক্তার ভাল করেই বোঝেন, নব্বুই বছরের বৃদ্ধাকে নতুন করে দেখার আর কিছু নেই। যে-গাছ অনেক আগে থেকেই শুকিয়ে মরতে শুরু করেছে, তাকে বাচাঁবার চেষ্টা কবা বৃথা। জীবনের ক্ষয় আছে, স্বাভাবিক নিয়মেই। বৃদ্ধা বিদ্যাবতীকে যতদিন পারা যায টিকিয়ে রাখা ছাড়া করার আর কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, মনে মনে তিনি স্বীকার করেন, সাধারণ জীবনীশক্তির চেয়ে যথেষ্ট বেশি জীবনীশক্তি বৃদ্ধার আছে। নয়ত নব্বুই বছর বয়েস পর্যন্ত তিনি বাঁচতেন না। এই বয়েসেও ওঁর স্মৃতিশক্তি এবং মানসিক বোধবুদ্ধি লোপ পায়নি—এটাই বড় আশ্চর্যেব। তবে একেবারে আশ্চর্যেরই বা কী আছে! শারীরিক স্বাভাবিক ক্ষয় যে মানসিক জড়তা আনবেই সর্বক্ষেত্রে এমন নয়। শেতল ডাক্তারের জেঠামশাই পঁচানব্বুই বছর বয়েসে কুম্ভমেলা করতে গিয়েছিলেন একলাই। এক এক মানুষের এক এক ধাত।

বিদ্যাদেবীকে দেখাশোনা শেষ করে শেতল ডাক্তার বললেন, খুব নরম গলায়, "মা, এখন আপনার কিসের কষ্ট হয়?"

বিদ্যা বললেন, "ঘুম হয় না। মাথাটা কেমন ভারি লাগছে।"

"একটু প্রেশার রয়েছে। তেমন কিছু নয়। ঘুম হলে হয়ত থাকত না। পেটটাও সামান্য ফেঁপে রয়েছে।" বলে শেতল ডাক্তার শেফালির দিকে তাকালেন, "ঘুমোবার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না?"

শেফালি কেমন অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। বলল, "দিই। রোজ দিই না। গত পরশু দিয়েছিলাম। কাল ওঁর শরীর দুর্বল লাগছিল। সন্ধেবেলায় দেখলাম

তন্দ্রার ঘোরে রয়েছেন, ভাবলাম এমনিতেই দুর্বল, ঘমুঘুম ভাব রয়েছে....তাই।

শেতল ডাক্তার এমনভাবে শেফালির দিকে তাকালেন, মনে হল যেন বললেন—তুমি ডাক্তার, না আমি ডাক্তার ? তোমার মাতব্বরি করার কথা নয়।

মুখে কিছু বললেন না শেতল ডাক্তার। বিদ্যাবতীর দিকে তাকালেন। "মা, এমনিতে আপনি ভাল আছেন। ঘুমের ওষুধটা খাবেন। রোজ। অন্তত এখন দিন সাতেক বাদ দেবেন না।"

বিদ্যাবতী বললেন, "তোমার দেওয়া ঘুমের ওষুধ খেয়েও আজকাল দু-চার ঘণ্টা ভালো ঘুম হয় না।"

শেতল বললেন, "ওষুধ পালটে দিচ্ছি।" বলে শেফালিকে বললেন, "কোনটা চলছিল ?"

শেফালি নাম বলল ওষুধের।

শেতল বিদ্যাবতীর দিকে তাকালেন। "ওষুধ আমি পালটে দিচ্ছি। এটাতে ঘুম হবে। আর-একটা ওষুধ দিয়ে দেব, প্রেশার কমবে। খাওয়া দাওয়া আপনি খুবই কম করেন। আর-একটু করবেন।"

বিদ্যাবতী বললেন, "আজকাল মাঝে মাঝে ভুল দেখছি শেতল।"

শেতল হেসে বললেন, "না মা, আপনি ভুল দেখছেন না। সে-অবস্থা আপনার হয়নি। আপনার চোখ-মাথার গোলমাল হয়নি।"

উঠে পড়লেন ডাক্তার। "আসি মা।....ওষুধ আমি পাঠিয়ে দেব।"

শেতল ডাক্তারের ব্যাগ গুছিয়ে দিয়ে শেফালি এগিয়ে গিয়ে নন্দাকে দিল। বলল, "পতিতকে দাও গিয়ে। নিচে পৌঁছে দেবে।"

বারান্দা ফাঁকা হয়ে গেল। শেতল ডাক্তার নিচে নেমে গেলেন। নন্দা গেল পতিতকে ডাক্তারবাবুর ব্যাগ পৌঁছে দিতে।

বিদ্যাবতী হঠাৎ শেফালিকে বললেন, "কাল সন্ধেবেলায় আমার ঘুমঘুম ভাব ছিল। তুমি কোথায় ছিলে ?"

"আমার ঘরে। মাথা ধরেছিল ভীষণ। শুয়ে ছিলাম।"

"নন্দা ?"

"এখানেই কোথাও ছিল। কেন ?"

"না ; আমার মনে হল তোমরা কেউ আমার ঘরে এসেছিলে।"

শেফালি মাথা নাড়ল। "আমি রাত্তিরে এসেছিলাম। নন্দা প্রায়ই আপনার ঘরে যায়। ও হয়ত গিয়েছিল।"

"তাই হবে।....ময়নাকে খবর দাও, প্রসন্নকে পাঠিয়ে দিতে বল।"

শেফালি চলে গেল।

প্রসন্ননাথ কথা বলতে বলতে শেতল ডাক্তারের সঙ্গে রিকশা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ডাক্তারের রিকশা ভাড়াটে রিকশা নয়, নিজের রিকশা। খানিকটা বাহারী। এক সময় ডাক্তার একটা পুরনো মোটর বাইক কিনে রোগী দেখে বেড়াতেন। পড়ে গিয়ে হাতে চোট পাবার পর বাইক বেচে দিয়েছেন।

নিজের রিকশায় উঠতে উঠতে ডাক্তার বললেন, "কাউকে পাঠিয়ে দেবেন তাহলে। আমি ডিসপেন্সারিতেই থাকব।...." বলতে বলতে ডাক্তারের চোখ পড়ল দূরে গাছতলায়। বললেন, "ওই—ওটি কে সিংহিমশাই ?"

প্রসন্ননাথ দেখলেন। বললেন, "কমলবাবু। কলকাতা থেকে এসেছেন। আমাদের অতিথি।"

শেতল ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত দেখলেন কমলকে। তারপর প্রসন্ননাথের দিকে তাকালেন। চোখের তলায় যেন লুকোনো ধূর্ততা ছিল। "আচ্ছা—আপনাদের সেই লিগ্যাল নোটিশ— ?"

"হ্যাঁ।"

"একজন শেষ পর্যন্ত ?"

"না, তিনজন।"

"তি-ন ! আর দু জন ?"

"আছে কোথাও।"

ডাক্তার মাথা নাড়লেন। "চলি সিংহিমশাই ! পরে দেখা হবে।"

প্রসন্ননাথ ফিরে আসছিলেন, দেখলেন ময়না সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। উনি কাছে আসতেই ময়না বলল, "দিদিমামণি ডাকছেন।"

প্রসন্ননাথ বললেন, "তুমি যাও। আমি আসছি।"

নিজের অফিসঘরে এসে প্রসন্ননাথ একটু দাঁড়ালেন। হাতের নেভানো চুরুট রেখে দিলেন টেবিলের ওপর রাখা ছাইদানিতে। তারপর টেবিলের বড় ড্রয়ারের চাবি খুলে কিছু কাগজপত্র বার করে নিলেন। ড্রয়ার বন্ধ করলেন আবার। ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বারান্দাতেই ছিলেন বিদ্যাবতী। প্রায় শোওয়া-অবস্থায়, বালিশের আড়াল দিয়ে ঘেরা। চোখ আধ বোজা। কাছে এলেন প্রসন্ননাথ।

"মা !" প্রসন্ননাথ ডাকলেন।

বিদ্যাবতী ঘাড় তুললেন। "প্রসন্ন ?"

"আপনি খোঁজ করছিলেন ?"

বিদ্যাবতী মাথা নাড়লেন একটু। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "জিতেন কবিরাজকে খবর দিয়েছ ? কবে আসবে ?"

"লিখেছি যত তাড়াতাড়ি আসতে পারেন।"

"সামন্তকে আর ডেকো না। কী ছাইপাশ খাওয়ায়!"

প্রসন্ন কিছুই বললেন না।

বিদ্যাবতী বললেন, "কে আছে এখানে?"

"কেউ নেই।"

"কেউ যাতে না আসে, বারণ করে দাও।…কাউকে বলো, তোমায় একটা চেয়ার মোড়া কিছু এনে দিতে।"

"আমি দাঁড়িয়েই আছি।"

"কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। কথা আছে। তুমি বসো।" প্রসন্ননাথ নিজেই একটা চেয়ার টেনে আনলেন।

বিদ্যাবতী হাত উঠিয়ে নাড়লেন, ইশারায় বোঝালেন, কাছে এসে বসতে। তফাতে বসে কথা বললে তাঁর কানে শুনতে অসুবিধে হয়। নিজেও জোরে কথা বলতেও পারেন না যে অন্যে তাঁর কথা শুনতে পাবে।

কাছেই বসলেন প্রসন্ননাথ।

বিদ্যাবতী বললেন, "এদিকে যেন কেউ না আসে।"

প্রসন্ন মাথা নাড়লেন। তাঁর নজর থাকবে।

সামান্য চুপচাপ। তারপর বিদ্যাবতী বললেন, "বলো; শুনি।"

"আপনার শরীর…"

"কালকের চেয়ে ভালই বোধ করছি। শরীরের কথা ভেবে বসে থাকলে কাজ হবে না, প্রসন্ন। এইভাবেই যা করার করতে হবে।"

প্রসন্ননাথ চারপাশ তাকালেন। কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। বিদ্যাবতী বোধ হয় আগেই হুকুম দিয়ে রেখেছেন, প্রসন্নের সঙ্গে কথা বলার সময় কেউ যেন এদিকে এসে বিরক্ত না করে।

বিদ্যাবতী বললেন, "তিনজন এল শেষ পর্যন্ত!…আগে কে এসেছে?"

"পাটনার এক ছোকরা। নরেশ…।"

বিদ্যাবতীর অগোচরে কিছুই রাখা হয় না। শুনেছেন তিনি নরেশের কথা। বললেন, "নরেশ কী যেন?"

"মজুমদার।"

"কথাবার্তা বলে দেখেছ?"

"কথাবার্তা বলেছিলাম প্রথম দিন—" বলে হাতের কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন।

বিদ্যাবতী বললেন, "কাগজ রাখো।…তোমার নিজের কী মনে হয়?"

প্রসন্ননাথ সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "ছোকরাকে আমার ভাল লাগেনি, মা।"

"কেন ?"

কেন কেমন করে বলবেন প্রসন্ননাথ ! এ তাঁর ধারণা। বললেন, "মা, আমি একটু-আধটু লোক চিনতে পারি। এই ছোকরাকে দেখে আমার খারাপ লেগেছে। কথাবার্তা ভব্য নয়। কাল একবার গণ্ডগোল শুরু করেছিল। আমাকে একটু কড়া হতে হল বাধ্য হয়ে।"

"ভাল করেছ। তা ছেলেটা কী বলছে ?"

"বলছে, ও বড়বাবুর...." বলতে গিয়ে প্রসন্ন থেমে গেলেন।

বিদ্যাবতী ঘাড় উঁচু করলেন না শুধু একটু কাত করলেন। "দাদার কথা বলছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বলছে, ও বড়বাবুর মেয়ের ছেলে।"

"দাদার মেয়ের ছেলে !....তুমি না ওর চিঠি আমায় পড়ে শুনিয়েছিলে ?"

প্রসন্ন মাথা নাড়লেন। শুধু নরেশ নয়, রথীন, কমলকুমার—সকলেই আসার আগে চিঠি লিখেছিল। নোটিশে লেখাই ছিল, প্রথমে চিঠি লিখে যোগাযোগ করে অনুমতি পেলে তবেই যে যার দাবি সম্পর্কে কথা বলতে আসতে পারে। হয় ব্যক্তিগত যোগাযোগ আবশ্যক, নয়ত আইন মোতাবেক অ্যাটর্নি বা উকিল ব্যারিস্টার মারফত যোগাযোগ করা যেতে পারে। তিনজনের কেউই আইন মোতাবেক যোগাযোগ করেনি। ব্যক্তিগত যোগাযোগ করেছিল চিঠিতে। রত্ননিবাস থেকে তাদের আসতে বলা হয়েছে। জানানোও হয়েছে, এই বাড়িতেই তারা অতিথি হিসেবে এসে উঠতে পারে।

বিদ্যাবতী বললেন, "কী বলেছে মায়ের নাম ?"

"ইন্দুবালা।" প্রসন্ননাথ কাগজ হাতড়াতে লাগলেন।

"বাবার নাম ?"

"চন্দ্রনাথ মজুমদার।"

"কোথায় ছিল ? কোথায় থাকত ওরা ?"

"অনেক জায়গায় থেকেছে। আগ্রা, কানপুর, কাশী। মা বাবা কেউ নেই এখন।....কাশীতেই ওর বাড়ি।"

বিদ্যাবতী চুপ করে থাকলেন। যেন ভাবছিলেন কিছু। শেষে বললেন, "ওর সঙ্গে কথা বলে তোমার কী মনে হয়েছে ?"

প্রসন্ননাথ সামান্য সময় কোনো জবাব দিলেন না। শেষে বললেন, "মা, আমার ধারণা, ছোকরা ধাপ্পাবাজ !"

"কেমন করে বুঝলে ?"

"ওর কথাবার্তা শুনে। কথার মিল থাকছে না।"

"মা বাবার নাম বলতেও গোলমাল করেছে ?"

"না, তা করেনি। তবে মা-বাবার নাম তো শুনেও বলা যেতে পারে।....আপনি কি বড়বাবুর মেয়ের কথা জানেন ?"

বিদ্যাবতী কথার জবাব দিলেন না।

প্রসন্ননাথ বললেন, "মা, বড়বাবুকে আমি চোখে দেখিনি। ছবিতে দেখেছি। আমি এখানে আসার বছর তিন চার আগে তিনি গত হন। আমি আপনাকে একটা কথা বলতে পারি, বড়বাবুর চেহারার সঙ্গে এই ছোকরার কোথাও মিল নেই।"

বিদ্যাবতী মাথা নাড়লেন। "না হতে পারে, প্রসন্ন। মেয়ের ছেলে। দাদামশাইয়ের সঙ্গে চেহারাব মিল না থাকতেও পারে।"

"না থাকল। কিন্তু মা, ও যা বলছে তাও বিশ্বাস করার মতন নয়।"

"কী বলছে ?"

প্রসন্ননাথ কী ভেবে বললেন, "আপনি ওর সঙ্গে কথা বলবেন ? এসে পর্যন্ত পাগল করে মারছে।"

বিদ্যাবতী মাথা নোয়াবার মতন করে নাড়লেন, "বলব।"

"এখন ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার অসুবিধে হবে না ?"

"না। তুমি ওকে ডেকে পাঠাতে বলো।"

প্রসন্নাথ উঠলেন। কাউকে দিয়ে খবর পাঠাবেন নরেশকে।

বিদ্যাবতী শুয়ে থাকলেন যেমন ছিলেন। চোখের পাতা খুলে। রোদ সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পাখির ডাক কানে আসছিল।

দাদার সঙ্গে বিদ্যাবতীর বয়েসের তফাত দু বছরের। দাদা বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়েস হত একানব্বুই। বিদ্যার ঊননব্বুই। দাদা মারা গিয়েছেন কত কাল আগে। কত বয়েস ছিল দাদার ? সত্তর পোরার আগেই শেষ। অথচ মনে হত দাদাই বেঁচে থাকবেন, বিদ্যা থাকবেন না।

প্রসন্ন বারান্দার সিঁড়ির দিকে গিয়ে কাউকে ডাকছিলেন।

ফিরে এসে বললেন, "খবর দিয়েছি, মা।.....একটা কথা।"

"বলো।"

"আমার কি আপনার কাছে থাকার দরকার হবে ? ছোকরা এলে আমি না হয়

অফিসঘরে চলে যাব। পরে আবার আপনি ডাকলে হাজির থাকব।"

বিদ্যাবতী বললেন, "না, তুমি থাকবে। সব কথা আমি ভাল শুনতে পাই না। খেয়াল করে কথা বলতেও পারি না।" বলে একটু চুপচাপ থাকলেন, বললেন, "প্রসন্ন, ডাক্তার কবিরাজ যে যাই বলুক, আমি বুঝতে পারছি, আমার দিন একেবারেই ফুরিয়ে এসেছে। আজকাল আমি কত যে মরা মানুষের মুখ দেখি স্বপ্নে!"

প্রসন্ননাথ কথা বললেন না প্রথমে। নব্বুই বছরের এই বৃদ্ধার মুখে এখন মৃত্যুর কথা শোনায় আশ্চর্যের কিছু নেই। বেলা অবসানে গাছের পাখিও বোঝে আর নয়, এবার নীড়ে ফেরার সময়। কথাটা প্রসন্নর নয়, বিদ্যাবতীর। বিদ্যাবতী যে কত কিছু জানেন প্রসন্ননাথের বুঝতে সময় লেগেছে। উনি নিরক্ষর নন। নিজের মতন করে বিদ্যাচর্চা করেছেন, আর বাড়িতে বসেই। সেসব পুরনো কথা। ক্ষুরধার বুদ্ধি ওঁর। দৃষ্টি সর্বত্র। কিন্তু বয়েস একে একে সবই হরণ করে নিচ্ছে।

প্রসন্ননাথ শেষে বললেন, "মা, ওই ছোকরা যেসব কথা বলবে—আপনার সামনে বসে আমি তা শুনতে পারব না।"

"কেন? তুমি কি ছেলেমানুষ?"

মাথা নাড়লেন প্রসন্ন। বললেন, "মায়ের সামনে বসে ছেলে ওই সব কথা শুনতে পারে না। আপনি আমার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা···· । আপনার সামনে····"

প্রসন্নকে থামিয়ে দিলেন বিদ্যাবতী। বললেন, "প্রসন্ন, তুমি কোনোদিনই বোকা ছিলে না। নিজের চোখে তুমি দেখেছ অনেক। জীবনের নোংরা দিকগুলো কতকাল চাপা দিয়ে রাখা যায়! একদিন তা ধরা পড়ে। তুমি তো রামায়ণ মহাভারত গীতা পড়েছ! কর্ণ যে কুন্তীর ছেলে এই কথাটা কি চাপা থাকল শেষ পর্যন্ত?"

প্রসন্নাথ বুঝতে পারলেন, আপত্তি করে লাভ নেই। তাঁকে এখানেই বসে থাকতে হবে। মাথা নিচু করে প্রসন্ননাথ বললেন, "মা, বড়বাবু কি আগ্রার দিকে আসা-যাওয়া করতেন?"

বিদ্যাবতী অল্পক্ষণ পরে সাড়া দিলেন। "শুনেছি, যেতেন। কেন?"

"এই ছোকরা বলছে, ওর মা বড়বাবুর মেয়ে।"

"বলছে?"

"বড়বাবু কি আগ্রায়. কাউকে বিয়ে করেছিলেন?"

বিদ্যাবতী মাথার দিকের কাপড় ওঠালেন সামান্য। রোগা সরু চামড়াসার আঙুলগুলো সাদা হাড়ের মতন দেখাচ্ছিল। বিদ্যাবতী বললেন, "দাদার গান

বাজনার শখ আর নেশা ছিল। আগ্রা, লখনউ, বেনারস যেতেন মাঝে মাঝে। থাকতেনও দু চার মাস।"

প্রসন্ননাথ বললেন, "মা, আমার কথায় অপরাধ নেবেন না।....ওই ছোকরা—নরেশ বলছে, আগ্রায় থাকার সময় বড়বাবু একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন....

"না। দাদা বাইরে গিয়ে আইনত কাউকে বিয়ে করেননি।"

"বড়বাবুর স্ত্রী...."

"লীলাবতী। নাটনপুরের রাজবাড়ির মেয়ে। ষোলো বছর বয়েসে বউ হয়ে এ-বাড়িতে আসে। উনিশ বছর বয়েসে মারা যায়। বউদির কোনো ছেলেপুলে হয়নি।"

লীলাবতীর কথা প্রসন্ননাথ শুনেছেন। এ বাড়িতে একটা ছবি আছে লীলাবতীর। বিয়ের এক আধ বছর পরে তৈরি করানো। বুক পর্যন্ত আঁকা। অজস্র গহনা পরা নিরীহ শান্ত মুখশ্রীর একটি ছবি। এখন সে ছবির রঙে ময়লা জমে কালো হয়ে গিয়েছে। বিদ্যাবতীর শোবার ঘরের পাশের বড় ঘরে এই ছবি এখনও টাঙানো আছে। একসময় মা ওই ঘরে বসে প্রসন্ননাথের সঙ্গে দরকারি কথাবার্তা বলতেন।

"ছোকরা বলছে—তার কাছে কিছু ছবি আছে।" প্রসন্ননাথ বললেন।

"ছবি ?"

"বড়বাবু আর আগ্রার একটি মেয়ের ছবি।"

"তুমি দেখেছ ?"

"না, আমি দেখিনি। আমায় দেখায়নি।"

"ও কী বলতে চাইছে ?"

"বলছে, বড়বাবু আর্য সমাজমতে বিয়ে করেছিলেন।"

"প্রমাণ ?"

"আমায় কিছু দেখায়নি।"

পায়ের শব্দ না পেলেও প্রসন্ননাথের চোখ ছিল বারান্দার দিকে। দেখলেন, অর্জুন আসছে। তার সঙ্গে নরেশ।

প্রসন্ননাথ বললেন, "ছোকরা আসছে, মা !"

নরেশ এগিয়ে এল।

কাছাকাছি এসে যেন খানিকটা ইতস্তত করল। চারপাশে তাকাল। এত বড় খোলামেলা বারান্দা, বারান্দার নকশা-করা পুরনো রেলিং, ওপর থেকে নামা

খড়খড়ির ঝাঁঝি, এদিক ওদিকে বারান্দার কোল ঘেঁষে রাখা গামলার মতন ফুলের টবে দু একটি লতানো গাছ তার চোখে অন্যরকম লাগলেও, এই ফাঁকা নিস্তব্ধ পরিবেশে বিদ্যাবতীকে যে অবস্থায় সে শুয়ে থাকতে দেখল তাতে অবাক না হয়ে পারল না। নরেশ বোধ হয় এ-রকম দৃশ্য দেখবে ভাবেনি। তার মনে হল, আচমকাই, মানুষ মারা যাবার পর যেভাবে তাকে ঘরের বাইরে এনে শোওয়ানো হয়—ওই বুড়িকেই সেইভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে। বুড়ি বেঁচে আছে তো ?

অর্জুন চলে যাচ্ছিল, প্রসন্ননাথ বললেন, "একটা বসার জায়গা এগিয়ে দিয়ে যাও।"

অর্জুন চেয়ার এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। নরেশ আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে বিদ্যাবতীকে দেখতে লাগল।

প্রসন্ননাথ বিদ্যাবতীকে বললেন, "মা, পাটনার সেই ছেলেটি এসেছেন।"

বিদ্যাবতী ইশারায় প্রসন্ননাথকে কী যেন বোঝালেন।

প্রসন্ননাথ বুঝলেন। নরেশকে বললেন, "বসুন।"

নিজের হাতেই ঘাড়ের দিকের বালিশ গুছিয়ে বিদ্যাবতী একটু উঁচু হলেন। নরেশকে দেখার চেষ্টা করলেন। কোনো কথা বললেন না।

নরেশ সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। এতক্ষণ বসেনি। এবার বসল।

বিদ্যাবতী নরেশকে দেখতে দেখতে শেষে বললেন, "তোমার নাম কী ?"

নরেশ নিজের নাম বলল।

"তোমার বাবার নাম, মায়ের ?"

"চন্দ্রনাথ মজুমদার। মায়েব নাম ইন্দুবালা মজুমদার !"

"তুমি কি মা-বাবার একমাত্র...."

"হ্যাঁ, একমাত্র সন্তান। আমার এক ছোট বোন হয়েছিল। বছর খানেকের মধ্যেই মারা যায়। আমি তখন খুব ছোট—তিন চার বছরের। বোনের কথা আমার মনে পড়ে না।"

বিদ্যাবতীর যেন কানে শুনতে অসুবিধে হচ্ছে, ইশারা করে বোঝালেন এগিয়ে বসতে।

চেয়ার এগিয়ে নিল নরেশ। শব্দ হল।

প্রসন্ননাথের চোখ অত্যন্ত সতর্ক। বারান্দায় নজর রয়েছে, আবার নরেশকেও লক্ষ করছিলেন। কান সজাগ।

বিদ্যাবতী বললেন, "কোথায় থাকতে তোমরা ?"

নরেশ বলল, "অনেক জায়গায় ছিলাম আমরা। আগ্রায়, মিরজাপুরে, কানপুর, বেনারস...."

"আগ্রায় কত দিন ছিলে ?"

"আমার মনে নেই।"

"মনে নেই ?"

"না। আমার মা, মায়ের মা—দিদিমা আগ্রায় থাকত। মায়ের বিয়ে হয় আগ্রায়। তারপর দু এক বছর পরে মা-বাবা আগ্রা ছেড়ে চলে আসে।"

"তুমি তখন হয়েছ ?"

"হ্যাঁ, কোলের বাচ্চা।"

"আগ্রার কোথায় থাকত তোমার মা, দিদিমা—বলতে পার ?"

নরেশ বলল, "পুরনো আগ্রায়। চক্ মহল্লার কাছে। কোথায় থাকত জানার চেয়ে আমার দিদিমার নামটা জেনে নিন।" এমনভাবে বলল নরেশ, যেন বিদ্যাবতীকে চমকে দিতে চাইছে। বলল, "আমার দিদিমার নাম ছিল গোরি। আপনারা যাকে গৌরী বলেন। দিদিমা…" নরেশ থামল। বিদ্যাবতীকে একদৃষ্টে দেখছিল।

বিদ্যাবতী কানে শুনলেন মাত্র। মনে হল না, এই নাম তিনি আগে শুনেছেন।

নরেশ অবাক হল। বুড়ি তার সঙ্গে মজা করছে নাকি ? বুড়ির মুখ যেন মোমের ছাঁচ। ছাঁচটা অবশ্য ফেটে গিয়েছে। কোথাও তোবড়ানো, কোথাও বসা। রেখায় রেখায় ভর্তি। চোখের দিকে না তাকালে বুড়িকে মৃত বলে মনে হয়।

কিন্তু এত সহজে নরেশ জব্দ হবার ছেলে নয়। বুড়িকে সে ছাড়বে না। প্রচণ্ড ঝড়ের ঘায়ে গাছ যেমন করে নড়ে ওঠে—সেইভাবে বুড়িকে সে শেকড়সুদ্ধ নাড়িয়ে দিতে পারে। নরেশ বলল, যেন বিদ্যাবতীকে বেসামাল করে দিতে চাইছে, "চুনিবাঈজির নাম শুনেছেন ?"

প্রসন্ননাথ নরেশকে দেখলেন কয়েক মুহূর্ত, চোখে বিরক্তি। তারপর বিদ্যাবতীকে লক্ষ করলেন।

বিদ্যাবতীর মুখের ভাব একই রকম। চুনিবাঈজির নাম তিনি শুনেছেন বলে মনে হল না।

নরেশ ভেবেছিল চুনিবাঈজির নামে বুড়ি অন্তত নাড়া খাবে। আশ্চর্য, বুড়ির বিন্দুমাত্র তাপ-উত্তাপ উত্তেজনা নেই। নরেশের মাথায় রাগ চড়ে যাচ্ছিল।

"আপনি কিছুই শোনেননি ? চুনিবাঈজির নামও নয় ?"

বিদ্যাবতী বললেন, "তোমার মায়ের নাম ইন্দুবালা বললে, না ?"

"মায়ের নাম ইন্দুবালা। দিদিমার নাম গোরি।" নরেশের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। রুক্ষভাবেই বলল, "চুনিবাঈজির বাড়ির কাছে আমার দিদিমা

থাকত। তারই একটা বাড়িতে। চুনিবাঈ দিদিমাকে খুব ভালবাসত। এক বাঙালি ভদ্রলোক চুনিবাঈয়ের আগ্রার বাড়িতে গিয়েছিল একবার....।"

"কী নাম ?"

"মহেন্দ্রকুমার রায়।"

বিদ্যাবতী মাথা হেলালেন। "আমার দাদা।"

"জানি। উনি আমার দিদিমাকে বিয়ে করেছিলেন। মিথ্যে কথা বলে। ভুলিয়ে।"

"বিয়ে করেছিল আমার দাদা ? কেন ?"

নরেশ শ্লেষের গলায় বলল, "সেটা আপনার দাদাই বলতে পারতেন।....শুনেছি, আমার দিদিমা দেখতে সুন্দরী ছিলেন।"

সাধারণভাবেই বিদ্যাবতী বললেন, "তোমার দিদিমা কি নাচগান করত ?"

নরেশ রূঢ় গলায় বলল, "না। আমার দিদিমা বাঈজি ছিল না। দিদিমার মামা চুনিবাঈজির বাড়িতে তবলা বাজাত। তবলচি। মামার একটা দোকানও ছিল বাজারে, গানবাজনার যন্ত্র মেরামতির। দিদিমার মা-বাবা ছিল না। বুড়োমামাই সব।" নরেশ একটু থেমে যেন দম নিয়ে নিল। "চুনিবাঈয়ের বাড়িতে আপনার দাদার সঙ্গে দিদিমার মামার আলাপ। মহেন্দ্র রায় দিদিমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে....।"

বিদ্যাবতী বললেন, "এসব গল্প তোমায় কে বলেছে ?"

নরেশ বলল, "গল্প নয় ; আমার কাছে প্রমাণ আছে।"

"প্রমাণ ?"

"ছবি। ফোটো। মহেন্দ্র আর গোরির।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিদ্যাবতী বললেন, "প্রমাণ সঙ্গে করে এনেছ ?"

নরেশ জামার পকেট থেকে মাঝারি ধরনের একটা খাম বার করল। "কাছেই রয়েছে।"

বিদ্যাবতী প্রসন্ননাথকে ইশারায় দেখালেন, "ওকে দাও।"

"আপনি দেখবেন না ?"

"দেখব।"

নরেশ দুটো ছবি বার করে প্রসন্ননাথের দিকে এগিয়ে দিল।

প্রসন্ননাথ ছবি দুটো নিয়ে বিদ্যাবতীকে দিলেন। দেবার সময় একপলক চোখ পড়েছিল ওপরের ছবিতে।

বিদ্যাবতী মুখের সামনে এনে ছবি দুটো দেখলেন। অনেক পুরনো ফোটো।

ঝাপসা। একটা ছবিতে দাদা আর একটি মেয়ে। পাশাপাশি। গায়ে গায়ে। পুরো মাপের ছবি নয়। কোমর পর্যন্ত রয়েছে। অন্য ছবিটায় দেখা যাচ্ছে মহেন্দ্র একটা চেয়ারে বসে আছেন। সিংহাসনের মতন দেখতে চেয়ারটা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। তার একটা হাত চেয়ারের পিঠের ওপর রাখা।

দুটো ফোটোই বিদ্যাবতী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর চোখ তুলে বললেন, "ছবি দুটো আমার কাছে থাক। পরে ভাল করে দেখব।"

নরেশ যেন একটু মুচকি হাসল। "রাখতে পারেন। ওটা কপি। আমার কাছে আরও দু সেট আছে। আসলটাও।"

বিদ্যাবতী বললেন, "এই ছবি থেকে কিছু প্রমাণ হয় না। তুমি বলছ—আমার দাদা তোমার দিদিমাকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের প্রমাণ কোথায়?"

নরেশ বুড়ির চালাকি আর বুদ্ধির তারিফ করল মনে মনে। বলল, "ওই ফোটো দুটো তবে প্রমাণ নয়?"

"না", মাথা নাড়লেন বিদ্যাবতী। "বিয়েটা ছেলেখেলা নয়, তার কোনো না কোনো প্রমাণ থাকবে। কী হিসেবে বিয়ে হয়েছিল? কোথায়? কবে?"

নরেশ থতমত খেয়ে গেল। সামলে নিয়ে বলল, "আপনি সাল তারিখ সময় চাইছেন?"

"বিয়েটা কোনমতে হয়েছিল?"

"আচারি বিয়ে। নব আর্যসমাজের একটা—কী বলব—একটা অংশের চলতি নিয়ম মতন। সমাজের লোক থাকে। অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে হয়। মালা বদল হয়।"

বিদ্যাবতী এমন বিয়ের কথা শোনেননি। বললেন, "তার প্রমাণ আছে?"

"হাতের কাছে নেই। জোগাড় করে দেব।"

"চুনিবাঈ কী ছিল?"

"মুসলমান। দিদিমারা হিন্দু। এতে কী আসে যায়?"

সামান্য চুপচাপ। বিদ্যাবতী যেন ভাবছিলেন কিছু।

প্রসন্ননাথ অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। এত বেশি কথাবার্তা একনাগাড়ে বলা উচিত নয় মায়ের। উনি আজকাল বড় একটা একটানা কথা বলতে পারেন না। ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

প্রসন্ননাথ বললেন, "মা, এখন না হয় থাক। কাল শরীর খারাপ গিয়েছে। আজও ডাক্তারবাবু দেখে গেলেন। পরে কথা বলবেন...."

বিদ্যাবতীও বুঝতে পারছিলেন, তাঁর ক্লান্তি লাগছে। মাথা নাড়লেন। বললেন, "পরেই কথা হবে—", বলে নরেশকে আচমকা বললেন, "তোমার মা

বাবার ছবি আছে?"

"আছে। সঙ্গে নেই ঘরে আছে।"

"তোমার দিদিমার বিয়ে হয়েছিল কত বছর বয়েসে? ছবি দেখে মনে হল, কম বয়েস।"

নরেশ বলল, "আমার দিদিমার বিয়ে হয়েছিল উনিশ কুড়ি বছর বয়েসে। তাই শুনেছি। আমার মা দিদিমার একটিমাত্র সন্তান। বিয়ের পরের বছর মা হয়।"

"এখন থাক। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব।" বিদ্যাবতী ক্লান্ত বোধ করছিলেন।

প্রসন্ননাথ নরেশের দিকে তাকালেন। উঠতে বললেন ইশারায়।

নরেশ উঠে পড়ল। বলল, "আমি এখানে বেশিদিন বসে থাকতে পারব না। চাকরি করে খাই। পাটনার অফিসের কাজ নিয়ে এসেছি। সেখান থেকে ছুটি নিয়ে এখানে এসেছিলাম। আমাকে পাটনা ফিরে যেতে হবে। তারপর কাজ শেষ করে নিজের জায়গায়, বেনারসে।"

বিদ্যাবতী বললেন, "তেমন তাড়া থাকলে ফিরে যেও। প্রসন্ন চিঠি লিখে তোমায় যা জানাবাব জানাবে।"

বৃদ্ধাকে ভাল করে নজর করতে করতে নরেশ বলল, "আমার দাবি আপনি মেনে নিচ্ছেন না?"

"এখন পর্যন্ত নয়! প্রমাণ পেলেই মেনে নেব।"

"প্রমাণ আমি জোগাড় করে দেব।"

"বেশ তো।"

নরেশ চলে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলল, "যদি সমস্ত প্রমাণ আপনার কাছে হাজির করি—এই সম্পত্তি আমার হবে?"

বিদ্যাবতী বললেন, "অন্য কোনো ভাগিদার না থাকলে তোমার হবে!"

"অন্য ভাগিদার আবার কারা? ওই ল্যাংড়া কলকাতার আর্টিস্ট? না, চা বাগানের সাদা ঢেঁড়সটা?"

"ওরাও ভাগিদার হতে পারে। কে বলতে পারে, তুমি, না ওদের মধ্যে কেউ সত্যি সত্যি আসল ওয়ারিশান?"

"আমি নকল নই।"

"ওরাও নকল না হতে পারে, বাছা। তিনজনের দাবিই যদি ন্যায্য হয়—এই সম্পত্তি তিনজনের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। না হলে, যার দাবি ন্যায্য সে একাই পাবে। অনেক লক্ষ টাকার সম্পত্তি, পুরো পেলে গোটা রাজত্ব।"

নরেশ জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল—কত লক্ষ টাকার। করল না। সতর্ক হয়ে

গেল। একবার দেখে নিল বিদ্যাবতীকে। পা বাড়াল।

নরেশকে বারান্দার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন প্রসন্ননাথ।

বিদ্যাবতী চোখ বুজে শুয়েছিলেন।

অপেক্ষা করে প্রসন্ননাথ ডাকলেন, "মা ?"

সামান্য অপেক্ষা করে বিদ্যাবতী সাড়া দিলেন। "প্রসন্ন !"

"মা, আপনি কাজটা ভাল করলেন না।"

"কেন ?"

"ওই ছোকরা মিথ্যে কথা বলছে।"

"বলতে পারে।"

"তবু আপনি বললেন, ওর দাবি আপনি মেনে নেবেন।"

"অমন কথা আমি বলিনি। বলেছি, ও যা বলছে—তার প্রমাণ দিতে হবে।"

প্রসন্ননাথ মাথা নাড়লেন। অসন্তুষ্ট যেন। বললেন, "মা, আমি জানি না, ও কিসের প্রমাণ দেবে ! তবে ধূর্ত ফন্দিবাজ ছেলে। দু একটা প্রমাণ নিশ্চয় ও জোগাড় করে রেখেছে। সেটা মিথ্যে হয়ত। এত বড় সম্পত্তি একা পাবার লোভে ওই ছোকরা কী করবে কে জানে !"

বিদ্যাবতী বললেন, "প্রসন্ন, বয়েস হয়ে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। মানুষমাত্রেই লোভী। তবে সেই পুরনো কথাটা ভুলে যেও না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

প্রসন্ননাথ চুপ করে গেলেন।

বিদ্যাবতীর যেন তন্দ্রা এসেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আচমকা বললেন, "একটু হিসেব করে বলো তো—দাদা বেঁচে থাকলে আজ তার বয়েস হত বিরানব্বুই। আমার চেয়ে বছর দুই-আড়াইয়ের বড় ছিল। দাদার জন্ম সালটা কবে যেন ?"

প্রসন্ননাথ হিসেব করলেন না, মোটামুটি তিনি জানতেন। বললেন, "বড়বাবুর জন্মসাল বোধহয় আঠারোশ সাতানব্বই।"

"হবে ওইরকম।....দাদার বিয়ে হয় চব্বিশ বছর বয়েসে। বউদি মারা যায় বছর তিনেক পরে।"

"তখন আপনাদের সম্পত্তির পরিমাণ এত ছিল না।"

"না, না, কেমন করে হবে ! আমাদের তখন শুধু জমিদার বলে কদর ছিল। মস্ত জমিদারি, রঘুনাথগঞ্জের রাজবাড়ি বলত লোকে। বাবা মারা যাবার পর দাদার আমলে আমাদের ঘরে মা লক্ষ্মী যেন (দশ হাতে সদয়) হলেন। দাদার বুদ্ধি ছিল, সাহস ছিল, চেষ্টা ছিল। কয়লা ছুঁয়ে দাদা কত সোনা করল জান না,

প্রসন্ন ! ষষ্ঠীপুর, ধম্মপুর—তিন তিনটে কয়লাকুঠি। তার ওপর ইজারা, পোড়া ইটের কারখানা.... ।”

প্রসন্ননাথ সব ইতিহাস জানেন না। কিছু জানেন। বড়বাবু মাটি ছুঁয়ে সোনা করেছিলেন। তাঁর আমলের গোড়াতেই এই বাড়ি ‘রত্ননিবাস’। মায়ের নামে বাড়ি। মায়ের যক্ষ্মা হয়েছিল। ডাক্তারবদ্যি বলেছিল, স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখতে। বাবার পছন্দ ছিল এই জায়গাটা। মায়েরও। বাবা ভিত গড়ে মারা যান। বড়বাবু বাড়ি শেষ করেন। খেয়ালমতন বাড়িয়েছেন, সাজিয়েছেন। অবশ্য প্রসন্ননাথ যখন এলেন এ-বাড়িতে তখন আর বড়বাবু নেই, বাড়ির জমকও মিইয়ে এসেছে।

বিদ্যাবতী বললেন, নিজের মনে মনেই যেন, “দাদার অত গুণ ছিল ; তবু দোষের হাত থেকে রেহাই পেল না।”

প্রসন্ননাথ চুপ করে থাকলেন।

“মানুষের স্বভাব কে বলতে পারে ! গুণ ছিল বলেই দোষ ছিল হয়ত। বউদি বেঁচে থাকলে কী হত কে জানে, মারা যাবার পর দাদা বড় উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী হয়ে উঠল। আর ওই নেশা। গানবাজনা, টাকা ওড়ানো, খানাপিনা.... ।”

প্রসন্ননাথ অপরাধীর গলায় বললেন, “বড়বাবু মাঝে মাঝেই বাইরে চলে যেতেন। আপনিই বলেছেন....”

“হ্যাঁ। থেকে থেকে উধাও। দু চার মাস আর বাড়ি ফেরার নাম নেই। কাশী, লখনউ, কানপুর, কলকাতা করে বেড়াত।”

“কিন্তু আগ্রা ?”

“আগ্রাতেও গিয়েছিল।”

প্রসন্ননাথ কথা বললেন না। সাহস হল না বলার।

বিদ্যাবতী নিজেই বললেন, “এই ছেলেটার কত বয়েস হবে, প্রসন্ন ?”

“ত্রিশ বত্রিশ। তিরিশের কম নয়।”

বিদ্যাবতী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। মনে মনে কোনো হিসেব করছিলেন। শেষে বললেন, “চুনিবাঈয়ের কথা আমি শুনিনি। তবে দাদা আগ্রায় গিয়ে একবার মাসকয়েক ছিল। দাদার তখন কত বয়েস হবে আমি আন্দাজ করতে পারছি না। বয়েস হয়েছে একটু। একেবারে জোয়ান নয়।”

প্রসন্ননাথ বললেন বিনীতভাবে, “ফোটো দেখে কিছু আন্দাজ করা যায় ?”

“দেখব ভাল করে। বছর চল্লিশের খানিকটা কম বলেই মনে হয়। মেয়েটির বয়েস কিন্তু কম। উনিশ কুড়ি। মুখটি দেখতে বেশ।”

প্রসন্ননাথ মনে মনে একটা হিসেব করতে লাগলেন।

"মা ?"

"বলো ?"

"আপনি ছোকরার কথা বিশ্বাস করছেন ?"

"না, বিশ্বাস করিনি। তবে, জগতে কত কিছু হয়, প্রসন্ন। ···হলেও হতে পারে।"

প্রসন্ননাথ মাথা নাড়লেন। "আমি দেখব····"

"কী দেখবে ?"

"পুরনো খাতাপত্র, হিসেব। বড়বাবুর আমলে নানান নামে টাকাপয়সা যেত। তাঁর নামেও খরচ লেখা থাকত। আমি দেখব, আগ্রার ঠিকানায় কোনো টাকা যেত কিনা !"

বিদ্যাবতী বললেন, "দেখো। পাবে বলে মনে হয় না।····সম্পর্ক যদি না রেখে থাকে, তাকে কি আর টাকা পাঠিয়ে সাহায্য করত ?"

প্রসন্ননাথ কোনো জবাব দিলেন না।

বিদ্যাবতী এবার ঘাড় পিঠ তুললেন। "ওদের ডেকে দাও। ঘরে যাব।"

প্রসন্ননাথ বললেন, "আপনি অনেক বেশি কথা বলেছেন আজ। এতটা ধকল সহ্য হবে না। মা।"

"উপায় নেই। আর আমি পারি না, প্রসন্ন! সারাজীবন যত সহ্য করেছি—তুমি তার সিকিও জান না। এবার আমি শান্তি পেতে চাই। ····আমার একটা আশা মিটলো না। এতকাল বাঁচলাম, ভাবতাম, একবার অন্তত ছোটবাবুর দেখা পাব। খোঁজ পাব।····পেলাম না। সে কোথায় গিয়ে মরল, কে জানে ! এও তো অভিশাপ !"

প্রসন্ননাথ কোনো জবাব দিলেন না। শেফালি—নন্দা—যাকে পান—ডাকার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

বিকেলের আলো মরে ছায়া নেমেছে সবে। রথীন নিজের মনেই হাঁটছিল। এই সময়টায় চুপচাপ ঘরে বসে থাকা যায় না। ভালোও লাগে না। খানিকটা ঘোরাফেরা করে এলে তবু একরকম সময়টা কেটে যায়।

স্টেশনের দিকে যাবে বলে রথীন বেরোয়নি। তবু ওই রাস্তা ধরেই হাঁটছিল। মাঠেঘাটে ঘোরার চেয়ে রাস্তাই ভাল। দুপাশের ফাঁকা ফাঁকা বাড়ির দিকে তার নজরও ছিল না। অন্যমনস্ক। খানিকটা বিমর্ষ।

হঠাৎ কে যেন ডাকল তাকে।

দাঁড়াল রথীন। তাকাল। একটা বাড়ির বাগানের আড়াল থেকে কেউ তাকে

ডাকল।

"এদিকে—"

রথীন দু-চার পা এগিয়ে আসতেই পার্বতীকে দেখতে পেল। দেখে অবাক হয়ে বলল, "তুই এখানে ?"

পার্বতী বলল, "তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে এগিয়ে শিউলি গাছের তলা দিয়ে চলে এসো। ছোট একটা কাঠের ফটক আছে। আসার সময় ফটক বন্ধ করে এসো।"

রথীন এগিয়ে গেল। বাড়ির একটানা কম্পাউন্ড ওয়াল, গায়ে গায়ে লতাপাতার ঝোপ উঠেছে। মাঝে মাঝে গাছ। ঝাউ, দেবদারু। বিশ তিরিশ পা এগুতেই শিউলি ঝোপ। ঝোপের পাশে কাঠের ছোট ফটক। হাত তিনেকের ঘুন ধরেছে কাঠে। রথীন ফটক খুলে ভেতরে ঢুকে আবার বন্ধ করল।

পার্বতী ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, "এখানে নয়, ওপাশে চলো।"

রথীন পা বাড়াল। "তুই এখানে ?"

"তোমার জন্যে। তুমি বেড়াতে বেরোও দেখেছি।"

"আমি তোর জন্যে সন্ধেবেলায় জামতলায় যেতাম।"

"জানি। যাতে না যাও তাই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি।"

"এই বাড়িটা...."

"মাধবকুঞ্জ। প্রথমে এসে আমি এখানে থাকতাম। বাড়ির এদিকে পেছনে আশ্রম। রাধা-কৃষ্ণের ছোট্ট মন্দির। দু-তিনজন বিধবা থাকে।"

রথীনকে আর বলতে হল না। সে জানে। পার্বতীর চিঠি থেকেই জেনেছে সব। বলল, "তুই এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবি, আমি ভাবিনি।"

পার্বতী বলল, "কী করব। পরশু দিন আমার পাতানো বাবার চোখে ধরা পড়ে গেলাম। কাল আর আমার সাহস হয়নি জামতলায় যেতে।"

রথীন ভয় পেয়ে গেল। বলল, "পাতানো বাবা—মানে ম্যানেজার ? তোকে দেখেছে জামতলায় ?"

"না। চোখে দেখেনি। সেটাই রক্ষে। আমি যখন তোমার কাছ থেকে আবার ফিরে যাচ্ছিলাম, কুলগাছের কাঁটায় শাড়ির আঁচল আটকে খানিকটা ফেঁসে গিয়েছিল। বুড়োর চোখে পড়ে গেল।"

রথীন যেন সামান্য নিশ্চিন্ত হল। সরাসরি ধরা পড়ার ব্যাপার তা হলে নয়। বলল, "তোকে কী বললেন ?"

"বলল একটা কথাই, কিন্তু এমন চোখ করে দেখছিল যেন দশ রকম সন্দেহ করছে।"

রথীন কিছু বলল না।

পার্বতী আরও পাঁচ সাত পা এগিয়ে একটা বাঁধানো জায়গায় বসতে বলল রথীনকে। জায়গাটা পুরোপুরি নির্জন, গাছপালায় আড়াল।

রথীন বসল। বলল, "এটা কি ?"

"আশ্রমের একেবারে পেছন দিক। চাতাল মতন করে রেখেছে বসার জন্যে।"

"তুই এখানে এলি কেমন করে ?"

"আসি মাঝে মাঝে। বলেই এসেছি। বুড়ো জানে—আমি মনোরমা মাসিকে দেখতে এসেছি।"

রথীন পা ছড়িয়ে বসল। আকাশের দিকে তাকাল একবার। অন্ধকার হয়ে আসছে।

রথীন বলল, "আজ আমার ডাক পড়েছিল বাড়ির মালিকানির কাছে।"

"জানি।"

"জানিস ?"

"বাঃ, জানব না। সবাই আসতে দেখছে তোমাদের। বুড়ি বারান্দায় বসে কথা বলছে অতক্ষণ। না জানার কী আছে ! কাল ওই পাটনার লোকটা এসেছিল। আজ তুমি।"

"আমি ভেবেছিলাম, তোর সঙ্গে জামতলায় দেখা হবে। সব বলব।"

পার্বতী একবার চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে রথীনের হাত নিজের দিকে টেনে নিল। বলল, "কথা বলে কী মনে হল তোমার ?"

"ম্যানেজার কিছু বলেনি ?"

"আমার কাছে বলবে ! তুমি পাগল ! বড় বাড়ির বড় বড় কথা—আমায় বলবে কেন ? আমি কে ? বলে পার্বতী দু-মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "বুড়োকে আমি আগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার এই বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেছি। একটা কথাও বলে না। উলটে বিরক্ত হয়। মুখ ফসকে এক আধটা কথা যা বলে ফেলেছে—তোমায় জানিয়েছি।"

রথীন কিছু ভাবছিল। চুপচাপ থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "তোদের এই বাড়ির বুড়ি যে এই রকম আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সামনে বসে থাকতে ভয় করে। মনে হয়, কী যেন আছে ওর মধ্যে। আশ্চর্য চেহারা রে ! সাদা হাড় দিয়ে তৈরি বুঝি ! তবু, দেখলে মনে হয়—কম বয়েসে বিদ্যাবতী অসামান্য সুন্দরী ছিলেন।"

পার্বতী বলল, "কী কথা হল তোমার সঙ্গে ?"

"আমার যা বলার আমি বললাম। আমিই বেশি কথা বলেছি। উনি কম বললেন। বরং ম্যানেজারই নানা কথা জিজ্ঞেস করেছেন।"

"সব বলেছ ?"

"বলেছি। মায়ের খাতার কথা বললাম। খাতাটা আমি নিয়েই গিয়েছিলাম সঙ্গে করে।"

"বুড়ির কাছে পড়লে ?"

"খানিকটা পড়লাম। উনি মুখেই বলতে বললেন। বললাম।"

রথীনের হাত নিজের বুকের ওপর টেনে নিল পার্বতী। বলল, "কী মনে হল তোমার ?"

রথীন পার্বতীকে দেখছিল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। পার্বতীর মুখের ওপর আঁধারের ছায়া। অস্থির হয়ে উঠেছে পার্বতী। রথীন বলল, "আমি ঠিক বুঝলাম না, পার্বতী। উনি যে ভীষণ অবাক হয়েছেন সেটা বুঝলাম। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আবার এটাও বুঝলাম মায়ের লেখা কাগজগুলোর দাম এঁদের কাছে তেমন নেই।"

"কেন ?"

"যার লেখা তাকে উনি চোখেই দেখেননি। চেনেন না। যাকে চেনেন না—তার হাতের লেখারই বা দাম কী। হাতের লেখা এখানে কোনো প্রমাণ নয়।"

পার্বতী অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "যা ঘটেছে তা তো ঠিক !"

রথীন দ্বিধার গলায় বলল, "উনি যদি না মানেন আমি আর কী করতে পারি। আমি স্পষ্টই বললাম, মায়ের লেখা কথাগুলোই আমার প্রমাণ, অন্য কোনো প্রমাণ আমার নেই। আর প্রমাণ বলতে আছে একটুকরো ছাপা কাগজ। মা নিজেই রেখে গিয়েছিল খাতার মধ্যে। এরপর যদি উনি আমায় ফিরে যেতে বলেন—আমি ফিরে যাব। আমার করার কিছু নেই।"

"কী বলল ?"

"বললেন, এখনই ফিরে যাবার দরকার নেই ; উনি আমার কথা ভেবে দেখবেন।"

পার্বতী যেন আশা পেল। বলল, "তোমার দাবি খানিকটা মেনে নিল বুড়ি !"

"একেবারে উড়িয়ে দিল না।"

পার্বতী রথীনের হাত নিজের গলার কাছে এনে রাখল, তারপর গালে। বলল, "তুমি যাবে না। কেন যাবে ? যাবে বলে এখানে এসেছ ! আর আমিই বা কেন পড়ে আছি এখানে। শুধু তোমার মুখ চেয়ে। তোমার জন্যে।"

রথীন মাথা নাড়ল। বলল, "জানি। কিন্তু আমি কেমন করে প্রমাণ করব, আমি এ-বাড়ির একজন। শুধু মায়ের লেখা কাগজগুলো...."

বাধা দিয়ে পার্বতী বলল, "আমি তোমায় কিছু খবর জোগাড় করে পাঠিয়েছি। আরও দেবার চেষ্টা করছি। তুমি যেও না।"

রথীন বলল, "তোর দেওয়া খবর যদি তেমন হত—দেখতাম। ও খবরে কাজ হবে না রে ! কপালে না থাকলে আমি কী করব, পার্বতী ? যার জিনিস সে যদি না দেয়।"

"আদায় করবে। তুমি কি ভিক্ষে চাইতে এসেছ ? পাওনা আদায় করতে এসেছ ! এদের কাছে মিনমিন করলে তোমায় পাত্তা দেবে না। অন্য যারা এসেছে—তারা কেউ লুঠে নিয়ে চলে যাবে।"

রথীনের হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল। বলল, "কাল রাত্তিরে ওই বাজে লোকটার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নরেশ। মদে চুরচুর হয়ে আছে। আমায় দেখে তামাশা করল, অপমান করল, নোংরা কথা বলল। ও শালাব কাল যেরকম ভাবভঙ্গি দেখলাম, কথা শুনলাম, মনে হল—ও যেন বাজি মাত করে ফেলেছে। আমায় বলল, বসে থেকে লাভ হবে না, কেটে পড়।"

"তোমায় বলল ?"

"বলল, ও নাকি বুড়ির নাতি।" বলে রথীন বড় করে নিশ্বাস ফেলল। "বুড়ি তাকেই সব দিয়ে যাবে। আমায় বলল, পাত চাটতে পড়ে থেকো না, নিজের চা-বাগানে ফিরে যাও। না গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে।"

পার্বতীর মাথায় রক্ত উঠে গেল। "তোমায় বলল আর তুমি শুনলে মুখ বুজে। কিছু বললে না ?"

"মাতালকে কী বলব !"

"হারামজাদার মুখে জুতো মারতে পারলে না ! নাতি !" পার্বতী দাঁতে দাঁত চেপে বলল। থামল। আবার বলল রুক্ষভাবেই, "কাল কী হয়েছে আমি জানি না। আমার বাবাকে দেখলাম, ভীষণ গম্ভীর, রাগে মুখ থমথম করছে। বুড়ির নাতিকে দেখে আহ্লাদে গলে যেতে তো দেখলাম না।"

রথীন হঠাৎ বলল, "আজ কেমন দেখলি ?"

"বুঝতে পারলাম না। তবে কালকের মতন গম্ভীর দেখিনি।"

রথীন হঠাৎ বলল, "তুই একবার আঁচ নিতে পারিস না ?"

পার্বতী আঁতকে ওঠার মতন করে বলল, "পাগল ! আমি মরব, তুমি মরবে। পরশুও তোমার জন্যে মরছিলাম। তুমি বললে ঘুমের ওষুধ চুরি করে আনতে। আমি বোকার মতন বুড়ির ঘরে ওষুধ চুরি করতে গেলাম। গিয়ে মনে হল,

কোনটা ঘুমের ওষুধ কেমন করে জানব আমি ! পালিয়ে এলাম। ঘর প্রায় অন্ধকারই ছিল। তবু বুড়ি যদি জেগে থাকত—ধরা পড়ে যেতাম। কপাল ভাল, নন্দা শেফালিদি কেউ তখন এসে পড়েনি।"

রথীন বলল, "বিপদে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। সহজ ব্যাপারটাও মাথায় আসে না। আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কমলবাবু ওষুধ চাইতে এলে আমি যদি বলতাম, এই রে ফুরিয়ে গিয়েছে—ব্যাপারটা মিটে যেত। অকারণ তোকে বিপদে ফেলছিলাম। কমলবাবু অবশ্য ওষুধ চাইতে এল না।"

পার্বতী এবার উঠল। বলল, "আর নয়। এবার ওঠো। তুমি যেভাবে এসেছ পেছন দিক দিয়ে চলে যাও। আমি আমার মতন চলে যাব।....সাবধানে থাকবে। আর কথায় কথায় অত ঘাবড়ে গেলে তোমার কপালে এক কানাকড়িও জুটবে না। নিজের হক পাওনা তুমি হারাবে। হারার খেলা খেলতে আমি আসিনি, খোকনদা। তোমায় জিততে হবে। তুমি চোর-জোচ্চোর নও। সিঁধ কাটতে এ-বাড়িতে আসোনি। ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা আদায় করতে এসেছ ! তুমি কেন কেঁচোর মতন থাকবে !" বলতে বলতে পার্বতী চুপ করে গেল। কান পেতে থাকল কিছুক্ষণ। ঠোঁটে আঙুল তুলে কথা বলতে বারণ করল রথীনকে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পার্বতী ইশারা কবে বলল, "তুমি যাও। সাবধানে।"

পার্বতী আর দাঁড়াল না।

রথীনও সাবধানে ফেরার জন্যে পা বাড়াল।

রত্ননিবাসেই ফিরে এল রথীন।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ঘরের দিকে এগুবার সময় অর্জুনকে দেখতে পেল। আলো পাঠিয়ে দিতে বলল।

কমলকুমারের ঘর বন্ধ। তালা ঝুলছে। নরেশের ঘরেও তালা।

রথীন নিজের ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে উত্তরের বাতাস আসছিল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। ভাবছিল।

সামান্য পরেই পতিত এল। বাতি নিয়ে এসেছে। এ-বাড়িতে এই এক নিয়ম। সকালের দিকে ঘর থেকে বাতি নিয়ে চলে যায়, সন্ধের মুখে তেল ভরে, কাচ পরিষ্কার করে আবার দিয়ে যায়।

বাতি রেখে পতিত চলে যাচ্ছিল, রথীন হঠাৎ বলল, "আমায় এক কাপ চা খাওয়াতে পার ? মাথাটা বড় ধরেছে।"

পতিত বলল, "আনছি।" বলে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে দিল রথীন। ভেজিয়ে দিল।

আলো যেমন ছিল তেমনই থাকল। বাড়িয়ে দিল না রথীন। ঝুল বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশ তারায় তারায় ভরে গিয়েছে। আরও ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার।

রথীন অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরাল।

পার্বতীর কথাই ভাবছিল রথীন। কথাটা ঠিকই বলেছে পার্বতী। রথীন সিঁধ কাটতে এ-বাড়িতে আসেনি। সে চোর-জুয়াচোর নয়। কিন্তু ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা আদায় করতে হলে যেসব মালমশলা থাকা দরকার, রথীনের হাতে তা নেই। জোগাড় করাও অসম্ভব। মা বেচারী নিশ্চয় জানত না, একদিন রথীন নিজের অধিকার আদায় করার জন্যে এইভাবে রত্ননিবাসে এসে দাঁড়াবে। জানলে মা কী করত কে জানে ! হয়ত কিছুই করত না। কেননা মা ধরে নিত, সোনার হরিণের পেছনে তাড়া করার কোনো অর্থ নেই। রথীন তাড়া করতেও যাবে না।

আজকাল মাঝে মাঝে রথীনের মনে হয়, মা সারাটা জীবন অনেক ভুল করেছে। সব চেয়ে বড ভুল, মারা যাবার আগে নিজেদের কথা খাতায় লিখে যাওয়া। তাতে কোনো লাভ হল কি ? কিছুই নয়। উলটে রথীনের অশান্তি বাড়ল। কোনো দরকার ছিল না এসবের। রথীন একেবারে সাধারণ মানুষ হয়েই থাকতে পারত, মিস্ত্রি, মজুর, ছুতোর, ট্যাক্সি ড্রাইভার, দোকানদার—যা হোক কিছু একটা হয়ে তার জীবন কাটিয়ে দিত। লক্ষ লক্ষ মানুষ এইভাবেই জীবন কাটায়। রথীনও কাটাত। কিন্তু মায়ের লেখাগুলোই তাকে ধীরে ধীরে অন্যরকম করে দিল। ফাঁদে পড়ে গেল রথীন। লোভের ফাঁদে নিজের অধিকার আদায় করে নেবার ঝুঁকিতে।

রথীন অবশ্য স্বীকার করে, মা তার ছেলেকে সোনার খনির স্বপ্ন দেখাবার জন্যে খাতায় কিছু লিখে যায়নি। যা লিখেছিল—সবই নিজেদের পরিচয় জানানোর কথা মনে রেখেই। মা নিজে কে ? রথীন কে ? রথীনের বাবা কে ? কেমন করে মায়ের দুঃখের জীবন শুরু হল, কেনই বা, কোথায় মা বঞ্চিত হয়েছে, কার কাছেই বা আশ্রয় পেয়েছে, ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মা কেন বেঁচে থাকতে পারল না—মোটামুটি এই সব কথা মা লিখে গিয়েছিল। বলা যেতে পারে মায়ের লেখাগুলো ছিল একজন মেয়ের দুঃখী জীবনের স্বীকারোক্তি। অকপট আত্ম-পরিচয়। আর সেই সঙ্গে ছিল, সামান্য কয়েকটা উপদেশ। ছেলেকে দিয়েছিল।

মায়ের উপদেশ রথীন ভোলেনি। মাঝে মাঝে তার মনে পড়ে। মা বলেছিল, পরের দান আর ভিক্ষে নিয়ে মানুষ হবার চেষ্টা করবে না। দয়া-অনুগ্রহ নিয়ে

মানুষ হলে নিজের সব কিছু ছোট, নোংরা হয়ে যায়। নিজের পরিশ্রম, বুদ্ধি, বিবেচনা দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। ঈশ্বর তোমায় দেখবেন।

মায়ের ঈশ্বর-ভক্তি বোধ হয় শেষের দিকে খুবই বেড়ে গিয়েছিল। অথচ তার কোনো কারণ ছিল না। মায়ের দ্বিতীয় স্বামী ছিল খ্রিশ্চান। মা নিজেও খ্রিশ্চান হয়ে গিয়েছিল বলে নাকি অন্য কোনো কারণে কে জানে! যে জন্যেই হোক, মা বড় কষ্ট পেয়ে রোগে ভোগে শেষ হয়ে মারা গিয়েছিল। ক্যানসারে।

দরজায় শব্দ হল।

পতিত এসেছিল চা নিয়ে। রেখে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে দিতে ভুললো না।

রথীন বিছানায় বসে চায়ের কাপে মুখ দিল।

সকালের কথাই আবার মনে পড়ল তার।

বিদ্যাবতী আর ম্যানেজার প্রসন্ননাথের সামনে বসে কথা বলতে রথীনের অস্বস্তি হচ্ছিল, ভয় করছিল। নিজের মা-বাবার কথা বলতে তার লজ্জাও করছিল। তবু তাকে বলতে হল। মায়ের লেখা খাতায় যা ছিল, যেমনটি ছিল—সে পড়তে শুরু করার খানিকটা পরে বিদ্যাবতী তাকে থামিয়ে দিলেন।

"খাতাটা তুমি রেখে যেতে পারবে?"

রথীন নিচু গলায় বলল, "এটা আমার মায়ের লেখা।"

"কানে শুনে সব কথা মনে রাখতে পারি না। ভাবতেও পারি না। চোখেও যে ভাল দেখি তা নয় বাছা। তবু রেখে যাও। আমি পরে দেখব।"

রথীন চুপ করে থাকল।

প্রসন্ননাথ বললেন, "আপনার ভয়ের কারণ নেই। খাতা আপনার আপনি ফেরত পাবেন।"

রথীন বলল, "ওটা আমার মায়ের একমাত্র স্মৃতি।"

"জানি। তোমার স্মৃতি আমরা কেড়ে নেব না," বিদ্যাবতী বললেন, "তোমার মায়ের কী নাম ছিল?"

"রেখা।"

"কোথাকার লোক ছিল, কোথায় থাকত?"

রথীন বলল, "মায়ের কথা মা নিজেই লিখে গিয়েছে। বহরমপুরে থাকত। দেশ বাড়ি বর্ধমানের দিকে।"

বিদ্যাবতী একটু চুপ করে থেকে বললেন, "দেখব পরে। তুমি মুখেই বলো এখন।"

রথীন মুখেই বলল। খাতায় যেমনটি লিখে গিয়েছে মা।

সাধারণ পরিবারের মেয়ে ছিল রেখা। বাবা ছিল আদালতের কেরানি। মা মারা যাবার পর বাবা বর্ধমানের গ্রামের বাড়িতেই ফিরে আসে। সেখানেই থাকত। রেখা ছিল বাবার একমাত্র অবলম্বন। বাবা মানুষটি বড় ভাল ছিল রেখার। সরল, সদা সদয়।

একদিন বাবা কোনো কাজে বর্ধমান শহরে গিয়েছিল। ফেরার সময় এক ভদ্রলোককে বাড়িতে নিয়ে আসে। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। সাধু সন্ন্যাসীর মতন দেখতে। পরনে গেরুয়া। কাঁধে ঝোলাঝুলি। পায়ে ক্যাম্বিসের ছেঁড়া জুতো। ভদ্রলোকের গায়ে জ্বর। গায়ে মুখে জল বসন্ত।

ভদ্রলোক রেখাদের বাড়িতে থাকলেন কিছুদিন। সুস্থ হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

মাস কয় পরে আবার এলেন তিনি। এসে বললেন, সাঁইথিয়ার দিকে তিনি এক আশ্রম করেছেন। কুষ্ঠ রোগীদের থাকার। বাবাকে একদিন যেতে বললেন।

বাবাও গেলেন একবার। ফিরে এসে মেয়েকে বললেন, ছোট করে করেছে আশ্রম। খড়ের চালা। জলের কষ্ট। দুটো ভাত ডাল আর কুমড়ো ঝিঙের তরকারি খেয়ে দিন কাটায়। একজন ডাক্তার আসে হপ্তায় একদিন। ওঁর দু একজন মানুষজনের দরকার। যাবি নাকি? আমি ভাবছি, ওখানে গিয়েই থাকব।

রেখার বয়েস তখন বুঝি কুড়ি-বাইশ। তার বিয়ের কথা বাবা ভাবতেন, কিন্তু কিছু করতে পারতেন না। রেখার একটা পা ছিল সামান্য ছোট। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হত।

মাস কয় পরে বাবা মেয়েকে নিয়ে সাঁইথিয়ার দিকে সেই কুষ্ঠ আশ্রমে চলে গেলেন।

সেখানেই একটা খড়ের চালার তলায় রেখারা মাথা গুঁজে থাকতে লাগল। বাবা আশ্রমের কাজকর্ম করত। আর রেখা সামলাত সংসার। নিজেদের। ভদ্রলোকের।

বছর দুই পরে বাবা মারা গেলেন। নিউমোনিয়ায়।

রেখার আশ্রয় হল সেই ভদ্রলোক। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশের কাছে।

কী হয়েছিল কে জানে, ভদ্রলোক ক্রমেই দৃষ্টিশক্তি হারাতে লাগলেন। রেখাই তখন তাঁর একমাত্র ভরসা। কুষ্ঠ আশ্রমের অবস্থাও ভাল নয়।

মানুষের যে কী হয় কে জানে। ভদ্রলোক অতখানি বয়েসে হঠাৎ রেখাকে এমন করে আঁকড়ে ধরলেন যেন রেখাই তাঁর জীবন-মরণ। অমন ভালবাসা

ফেরত দেওয়া যায় না। আর কাকেই বা ফেরত দেবে রেখা। তারই বা জায়গা কোথায় ?

রেখা অন্তঃসত্ত্বা হল। ভদ্রলোকের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। রেখার বয়েস বছর পঁচিশ। বয়েসের তফাত বড় বেশি।

অদ্ভুতই বলতে হবে। ভদ্রলোক এরপর কিসের অনুশোচনায় মরে যেতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টিও তাঁর তখন অতি ক্ষীণ। প্রায় অন্ধ। উনি সে সময় রেখার কাছে নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করেন। তাঁর মা বাবা দাদা দিদি ঘরবাড়ির কথা। সব বলেও তিনি রেখাকে বলেছিলেন, ওখানে কোনোদিন নিজের পরিচয় দিতে যেও না। ওরা তোমায় স্বীকার করবে না। তাড়িয়ে দেবে। আমি সম্পদ-সৌভাগ্য ছেড়ে চলে এসেছিলাম মনের শান্তির জন্যে। সেই মন এই বয়েসে আমাকে কোথায় যে ঠেলে দিল। কেন যে এমন হল আমি জানি না। আমায় তুমি ক্ষমা করো।

উনি একদিন কুয়োর মধ্যে পড়ে গেলেন। কেমন করে কে জানে। হয়ত আত্মহত্যা করেছিলেন। অনুতাপে, অনুশোচনায়।

রেখা তখন পূর্ণগর্ভা।

তার পরের জীবন অন্য রকম। কষ্ট, যন্ত্রণা আর মুখ-মাথা হেঁট করে অন্যের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ানোর।

কলকাতার ডাক্তার দাদু, পাগল দিদিমা, মায়ের নার্সিং শেখা, চাকরি, চাকরি থেকে বরখাস্ত, আবার বিয়ে, শেষে ক্যানসারে মারা যাওয়া—, সবই বলে ফেলল রথীন বিদ্যাবতীদের সামনে।

বিদ্যাবতী মন দিয়ে শুনছিলেন। কথা বলছিলেন কম। প্রসন্ননাথ মাঝে মাঝে এটা ওটা প্রশ্ন করছিলেন।

শেষে বিদ্যাবতী বললেন, "তোমার মা সেই মানুষটির চেহারার কথা কিছু লেখেননি ?"

"কার, শচীন্দ্রবাবুর !"

"হ্যাঁ।"

"লিখেছে। দেখতে সুন্দর ছিল। গালের পাশে আঁচিল ছিল বড়। বাঁ হাতের আঙুল ছিল ছটা। দুটো কড়ে আঙুল। আমার বাবা নাকি পণ্ডিত ছিল, মা লিখেছে।"

"তুমি তোমার বাবার পদবি নাওনি ?"

"মা নেয়নি। নিজের বাপের বাড়ির পদবিই ব্যবহার করত।"

বিদ্যাবতী বললেন, "আমার ছোট ভাই আমার চেয়ে আট ন' বছরের ছোট

ছিল। শচীর—আমাদের ছোটবাবুর গালে আঁচিল ছিল, বাঁহাতের আঙুলও ছটা ছিল। কিন্তু আরও একটা লক্ষণ ছিল তার। তোমার মা লেখেনি ?”

রথীন সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে পারল না।

বিদ্যাবতী খাতাটা চেয়ে নিলেন। বললেন, “আমি দেখব। তুমি এখন নিজের ঘরে যাও।”

প্রসন্ননাথ নিজের অফিসঘরে বসে কাজ করছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলতেই দেখেন, দরজার কাছে কমলকুমার।

কাছাকাছি কেউ নেই। পুব-দক্ষিণের জানলা দিয়ে ঘরে রোদ এসে পড়েছে। একটা ভোমরা ঘরে ঢুকে পড়েছিল কখন। নিজের মনেই উড়ছিল জানলা বরাবর।

প্রসন্ননাথ কিছু বলার আগে একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় সাড়ে আট।

কমলকুমার এগিয়ে এল। “ব্যস্ত রয়েছেন ?”

প্রসন্ননাথ হাসির মুখ করলেন। বললেন, “মাসের শেষ দিক—কতক কাজ থাকে মাস পয়লার, সেরে রাখছি।” বলে হাত বাড়িয়ে ছাইদান থেকে চুরুটের টুকরোটা ওঠালেন। চুরুট নিবে গিয়েছে।

কমল বলল, “আপনার সঙ্গে ক'টা কথা বলতে এলাম। কিন্তু আপনি ব্যস্ত।”

প্রসন্ননাথ কমলকে দেখলেন। এই ছেলেটির ব্যবহার মাপাজোপা। নিঁখুত। মনে মনে তিনি কমলকুমারের সৌজন্যের প্রশংসা করেন। প্রসন্ন বললেন, “এ-কাজ খানিকটা পরে করলেও ক্ষতি নেই। বসুন।”

কমল সামনে এসে বসল। ছড়িটা রাখল কোলের ওপর।

প্রসন্ননাথ চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। বললেন, “সাড়ে ন'টা নাগাদ আপনাকে নিয়ে যাবার কথা। উনি বলে রেখেছেন। ময়না এসে খবর দেবে।”

কমল বলল, “আমার একটা কথা বলার ছিল।”

প্রসন্ননাথ কৌতূহল বোধ করলেন। “বলুন।”

“বিদ্যাদেবীর সঙ্গে কথাবার্তার সময় আপনি সেখানেই থাকেন !”

অবাক হলেন না প্রসন্ননাথ। সাধারণ কথাটা কমলকুমারের কানে পৌঁছনো বিচিত্র নয়। সকলেই জানে। বললেন, “হ্যাঁ।...কে বলল আপনাকে ? নরেশ ?”

কমল সে-কথার কোনো জবাব দিল না। না দিয়ে বলল, “আজও আপনি থাকবেন ?”

প্রসন্ননাথের মনে হল, কমলকুমারের গলার স্বরে কোনো ইঙ্গিত রয়েছে। বললেন, "কেন বলুন তো ?"

কমল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "যদি না থাকেন— ?"

না থাকেন ! কী বলছে, কমলকুমাব ? প্রসন্ননাথের চশমার কাচের একপাশে রোদের আভা ঠিকরে এসে লাগছিল। মুখ সামান্য সরিয়ে নিলেন। ছোকরাকে লক্ষ করলেন। বললেন, "কেন ? আমি না থাকলে আপনার লাভ ?"

কমল মাথা নাড়ল। "আমার আলাদা কোনো লাভ নেই। তবে মনে হয়, আমাদের কথাবার্তা শুনলে আপনি নিজেই অস্বস্তি বোধ করবেন। ভাল লাগবে না।"

প্রসন্ননাথ শান্তভাবে বললেন, "আমি এ-বাডিতে কাজ করি। মায়ের অন্নদাস। তাঁর হুকুমে থাকি।"

কমল বলল, "আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না। এ-বাড়িতে আপনার মর্যাদা কী আমি বুঝতে পারি। যাঁদের অন্ন আপনি খান তাঁদের হুকুম আপনি মানবেন—তাও ঠিক। তবু এমন কথাবার্তা যদি আপনার কানে যায় যা আপনি হয়ত কোনোদিন শোনেননি, জানেন না ; আর যেটা এমনই ব্যক্তিগত...."

কমলকে কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রসন্ননাথ বললেন, "কমলবাবু, ব্যক্তিগত কথা আমি আজ দু দিন অনেক শুনেছি।" বলে সামান্য অপেক্ষা করে বললেন, "এখানে যারা আসে তারা ব্যক্তিগত কথা শোনাতেই আসে। আমাকেও শুনতে হয়। নরেশ, রথীন, তাদের কথা বলেছে.... । আপনিও বলবেন। শুনবো। আমি মালিকের হুকুম মেনেই তাঁর কাছে থাকি।"

কমল অন্যমনস্কভাবে প্রসন্ননাথকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "এই বাড়ির অনেক কথাই আপনি জানেন। সব কি জানেন ?"

"না।"

"জানার চেষ্টাও করেননি ?"

প্রসন্ননাথ তীক্ষ্ণভাবে কমলকে দেখলেন, "আমার পক্ষে যা জানা সম্ভব জেনেছি। আমার জানার বাইরে অনেক জিনিস থাকতে পারে—আমাকে যা জানানো হয়নি, জানানোর দরকার হয়নি।"

কমল বলল, "আমি উঠি। আপনি আমায় ভুল ভাবছেন। আমি শুধু আপনার কাছে অনুরোধ করতে এসেছিলাম, বিদ্যাদেবীর সঙ্গে আমার কথাবার্তার সময় আপনি যাতে না থাকেন। জীবনের অনেক কথার তৃতীয় সাক্ষী না থাকা ভাল।"

কমল উঠে পড়ছিল, প্রসন্ননাথের হঠাৎ কী মনে হল, বললেন, "বসুন।"

কমল বসল।

প্রসন্ননাথ কমলকে দেখলেন। এই ছোকরার মধ্যে কিসের এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। গোপনতাও। প্রসন্ন ঘাড় ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকালেন। ভোমরাটা রোদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে। ঘর নিস্তব্ধ। অন্যমনস্কভাবে কী যেন দেখলেন। তারপর বললেন, "সাক্ষী অনেক কিছুরই থাকে না। কিন্তু আমায় যদি কেউ সাক্ষী করে রাখতে চায় আমার কী করার আছে!"

কমল কোনো জবাব দিল না।

প্রসন্ননাথও চুপ করে থাকলেন।

সামান্য পরে প্রসন্ননাথ বললেন, "আমি আপনার কাছে এখনই কিছু জানতে চাইছি না। কিন্তু এমন কোন্ কথা আছে যার জন্যে আপনি আমায় মায়ের কাছে থাকতে বারণ করছেন!"

কমল বলল, "আছে কিছু...."

"কমলবাবু, আপনি কী বলবেন আমি জানি না। তবে যাই বলুন সেটা হয়ত আমার জানা নেই। ধরুন নরেশের কথা বা রথীনের কথা। এরাও যা বলেছে তাও আমার জানা ছিল না।"

কমল বলল, "ওদের কথার সঙ্গে আমার কথার তফাত আছে।"

মাথা নাড়লেন প্রসন্ননাথ। "খুব বেশি তফাত কী থাকতে পারে। একজন বলছে, সে এই বাড়ির বড়বাবুর নাতি। আগ্রায় কোন বাঈজির বাড়িতে বড়বাবুর আসা-যাওয়া ছিল। নরেশের দিদিমাকে আগ্রাতেই বিয়ে-থা করেছিলেন বড়বাবু।....এই কথাটা কানে শুনতে তো আমার ভাল লাগেনি। তবু আমায় শুনতে হয়েছে!"

কমল কোনো কথা বলল না।

প্রসন্ননাথ নিজেই বললেন, "আর-একজন, রথীন বলছে, সে ছোটবাবুর বুড়ো বয়েসের ছেলে। ছোটবাবু এই বাড়ি ছেড়ে যৌবন বয়েসেই চলে গিয়েছিলেন; বৃদ্ধ বয়েসে তিনি কী হিসেবে মেয়ের বয়েসী একজনকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেন—কে জানে!.....এরা দু'জনেই যা বলেছে তা এ-বাড়ির মানমর্যাদার সঙ্গে খাপ খায় না। আপনি নতুন করে এমন কোন কথা বলতে পারেন যা আমি মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে পারব না!"

কমল যেন একটু সময় নিল; বলল, "আমার ভুল হয়েছিল। আপনি থাকতে পারলে থাকবেন।" কমল উঠে পড়ল। বলল, "আমি ঘরেই আছি।"

কমল চলে যাবার পর প্রসন্নাথ কিছুক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এই ছোকরা ঠিক কী কারণে তাঁর সামনে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না ! প্রসন্ননাথ সামনে থাকলে ওর কিসের অসুবিধে হবে ?

কমল বিদ্যাবতীকে চেনে না। প্রসন্ননাথের চেয়েও তিনি অনেক বুদ্ধিমতী ; তাঁর বাইরের দৃষ্টি আজকাল বেশি দূর পৌঁছোয় না ঠিক, কিন্তু ভেতরের দৃষ্টি কত গভীরে যায় প্রসন্ননাথও বুঝতে পারেন না, কমল কেমন করে বুঝবে !

কমল ঘরেই ছিল।

সামান্য আগে রথীন এসেছিল ঘরে। বেচারিকে মনমরা, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। চিন্তিত। রাত্রে ঘুম না হলে যেমন অবসন্ন, শুকনো, উসকো-খুসকো দেখায় সেই রকম দেখাচ্ছিল।

কমলই স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলছিল ; রথীন প্রায় চুপচাপ ছিল। খানিকটা সময় কাটিয়ে চলে গেল রথীন। যাবার সময় শুধু বলল, "আপনার সঙ্গে এখনও ওঁর দেখা হয়নি।"

কমল বলল, "এখনও হয়নি। আজ হবার কথা।"

"দেখুন।"

প্রায় দশটা নাগাদ ময়না এল কমলের ঘরে। এসে বলল, "আপনাকে যেতে বললেন, মেসোমশাই। দিদিমামণি দেখা করবেন বলে বসে আছেন।"

কমল বলল, "ওঁর শরীর ভাল আছে ?"

"ওই একরকম। আজ একটু ভাল।"

"আমি যাচ্ছি।"

"আপনি আসুন। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।....পতিতদার জ্বর হয়েছে। আমি আপনাকে নিয়ে যাব।"

কমল উঠে পড়ল। হাতের স্টিকটা তুলে নিল। "আমি তৈরি।"

"আসুন।"

বাইরে এসে কমল ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ময়নার সঙ্গে যেতে যেতে কমল বলল, "এ-বাড়িতে কুকুর আছে ?"

"কুকুর !....না।" ময়না অবাক হয়ে বলল। "কেন ?"

"রাত্তিরে একটা ডাক শুনছিলাম।"

"আমরা শুনিনি। বাইরের কুকুর হতে পারে। 'আইভি ভিলা'-য় কুকুর আছে।"

কমল আর কিছু বলল না।

বালিশের স্তূপের মধ্যে বিদ্যাবতী শুয়ে ছিলেন। প্রসন্ননাথ তাঁর কাছাকাছি

দাঁড়িয়ে। আজ বড় বেশি সাদা দেখাচ্ছিল বালিশগুলো। কাচা ওয়াড় পরানো হয়েছে।

কমল আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল। আসার সময় সে এই বিশাল বারান্দার ছবিটা যেন ভাল করে দেখে নিচ্ছিল। ঝাঁঝি, লোহার রেলিং, গামলার মতন বড় বড় মাটির টবে লতানো গাছ, একেবারে শেষ প্রান্তে একটা বড় পাখির খাঁচা।

এই বিশাল বারান্দার একপাশে বিদ্যাবতী এমনভাবে শুয়ে আছেন—মনে হয়, ওঁর কোনো সজীব অস্তিত্ব নেই। রোদ আর ছায়ার মধ্যে কোনো পুরনো আসবাব যেন পড়ে আছে।

ময়না আর নেই। কমলকে বারান্দায় পৌঁছে দিয়ে সে চলে গিয়েছে। খুব নিস্তব্ধ লাগছিল চারপাশ।

কমল এসে দাঁড়াতেই প্রসন্ননাথ বিদ্যাবতীকে বললেন, "মা, ছেলেটি এসেছেন।"

বিদ্যাবতী বললেন, "কই ?"

প্রসন্ননাথ ইশারায় কমলকে কাছে আসতে বললেন।

কমল আরও কাছে এল।

বিদ্যাবতী সামান্য ঘাড়-পিঠ তুললেন। কমলকে দেখলেন।

কমল সৌজন্যবশেই যেন হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। বিদ্যাবতী লক্ষ করলেন। অন্যরা করেনি। নরেশ নয়, রথীন নয়।

প্রসন্ননাথ বললেন, "মা, এঁর নাম কমলকুমার গুপ্ত। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন। বালিগঞ্জের দিকে থাকেন।"

বিদ্যাবতী বললেন, "বসো।"

প্রসন্ননাথ বসতে বললেন কমলকে।

কমল বসল। বসে তার অ্যালুমিনিয়ামের স্টিকটা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে রাখল।

বিদ্যাবতী বললেন, "লাঠি নিয়ে হাঁটো ?"

কমল বলল, "আমার একটা পায়ের গণ্ডগোল আছে।"

"ভেঙে গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ।"

কমলের একটু অসুবিধে হচ্ছিল। তার চোখে যে ডি ভি লেন্স লাগানো আছে, কন্ট্যাক্ট লেন্স—তাতে এত কাছাকাছি থেকে আলোছায়ার মধ্যে বিদ্যাবতীর চোখমুখ অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেখা যায় না। সামান্য সরে বসতে পারলে ভাল হত। আলোর কোনো আভা তার চোখের পাশে এসে লাগছে।

“প্রসন্ন, তুমি বসো,” বিদ্যাবতী বললেন।

প্রসন্ননাথ বললেন, “বসছি। আপনি কথা বলুন।”

বিদ্যাবতী বললেন, কমলকে, “কী নাম বললে, কমলকুমার গুপ্ত ?”

“হ্যাঁ।”

“শুধু গুপ্ত ? না, সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত ?”

“গুপ্তই বলি।”

“বলো, তোমার কথা শুনি।”

কমল বিদ্যাবতীকে কয়েক মুহূর্ত দেখল। এ মুখ অবাক হয়ে দেখার মতন। প্রসন্ননাথের দিকে তাকাল কমল। বলল, “উনি থাকবেন ?”

বিদ্যাবতী ঘাড় হেলালেন। “প্রসন্ন থাকবে। ও আমার কাছেই থাকে।”

কমল সামান্য অপেক্ষা করে বলল, “আপনার সঙ্গে আমি আলাদাভাবে কথা বলতে পারি না ?”

বিদ্যাবতী কমলের মুখের দিকে তাকালেন। “না। প্রসন্ন আমার কাছেই থাকে। অনেক কথা আমি ভাল শুনতে পাই না, মাথায় থাকে না। ও থাকলে আমার সুবিধে।”

কমল অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, “রাধাকমল বলে কাউকে আপনার মনে আছে ?”

বিদ্যাবতী যেন খেয়াল করে শোনেননি। “কী নাম বললে— ?”

“রাধাকমল।”

নামটা শোনার পর বিদ্যাবতী যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, এই নাম তিনি শুনছেন। কেমন নিঃসাড, নির্বাক হয়ে কমলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, উনি যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। যতটা অবাক হয়েছেন তার বেশি ধাঁধায় পড়েছেন।

কমল বলল, “রাধাকমলের পুরো নাম ছিল রাধাকমল চৌধুরী।”

বিদ্যাবতী কোনো কথা বললেন না। কমলকেও আর দেখছিলেন না। চোখের পাতা প্রায় বন্ধ করে শুয়ে থাকলেন।

প্রসন্ননাথ বিদ্যাবতীকে লক্ষ করলেন। মায়ের কি নামটা মনে আসছে না ? উনি চেষ্টা করছেন মনে করার ? নাকি, মা বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছেন !

কমল শান্তভাবে বলল, “ওঁর অবশ্য আরও একটা নাম ছিল। শ্যামাচরণ.... ।”

বিদ্যাবতী হাত তুলে কমলকে কথা বলতে বারণ করলেন।

কমল কথা বলল না।

বিদ্যাবতীও নীরব। চোখের পাতাও খুললেন না।

প্রসন্ননাথ এই বাড়িতে এত বছর কাটালেন। অজস্র খাতাপত্র ঘেঁটেছেন। অনেক পুরনো দলিল-দস্তাবেজ দেখেছেন, কিন্তু কোথাও তিনি শ্যামাচরণের নাম দেখেননি। মাও কোনোদিন বলেননি। মানুষটি কে ? সত্যিই কি শ্যামাচরণ রাধাকমলের অন্য নাম ?

বিদ্যাবতী যেন কিসের এক ঘোর কাটিয়ে বললেন। "চিনি।" গলার স্বর যেন উঠল না বিদ্যাবতীর।

"আপনার স্বামী ! আসল নাম শ্যামাচরণ, নাম বদলে আপনারা রাধাকমল করেছিলেন। আপনাদের পরিবারে শ্যামা নাম রাখা হয় না।"

বিদ্যাবতী হাতের ইশারায় প্রসন্ননাথকে চলে যেতে বললেন।

প্রসন্ননাথ নিজেই কেমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। এ-বাড়িতে কেউ কোনোদিন মায়ের স্বামীর নাম শোনেনি। তিনি বিধবা—এইমাত্র তাঁরা জানেন। মায়ের বিয়ে, স্বামী, শ্বশুরবাড়ির কথা কেউ জানে না। কখনো সেসব প্রসঙ্গ ওঠেনি। কারও সাহস হয়নি ওঠাবার। শুধু পুরনো এক দলিলে মায়ের স্বামীর নাম উল্লেখ করা আছে রাধাকমল।

প্রসন্ননাথ উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন বিদ্যাবতীকে। কমলের দিকেও তাকালেন একবার, তারপর চলে গেলেন।

কমল দেখল, প্রসন্ননাথ বারান্দার শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন।

বিদ্যাবতী বললেন, "তুমি কে ?"

কমল বলল, "আমি আপনাকে সবই বলব। আপনি কিন্তু এখনও বলেননি, রাধাকমল আপনার স্বামী !"

বিদ্যাবতী বললেন, "হ্যাঁ, স্বামী।"

কমল তার চেয়ারটা এমনভাবে সরিয়ে নিল যাতে আলোর আভা তার চোখে ঠিকরে না আসে।

"এ নাম তুমি কেমন করে জানলে ? কে তুমি ?" বিদ্যাবতী বললেন।

কমল বলল, "আমি জানি। আমি আগেরটা জানি, পরেরটাও জানি। আপনি পরেরটা জানেন না।"

"আগেরটা তুমি জান ? কী জান ?"

কমল বলল, "শ্যামাচরণ নামের একটি ছেলের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল। ছেলেটিকে দেখতে ছিল খুব সুন্দর। বাইশ তেইশ বছর বয়েস। তার বাড়ি ছিল নবাবপুরে।....আমি ঠিক বলছি ?"

বিদ্যাবতী পিঠের দিকের বালিশ আরও একটু উঁচু করলেন। অবিশ্বাসের

চোখে দেখছিলেন কমলকে। তাঁর হাতের আঙুল যেন কাঁপছিল।

কমল বলল, "আপনি কিছু বলছেন না?"

বিদ্যাবতী বললেন, "হ্যাঁ, সে খুব সুন্দর দেখতে ছিল। বিয়ের সময় তার বয়েস সবেই একুশ পেরিয়েছিল। বাইশ তেইশ নয়।"

কমল মাথা নাড়ল। "খুঁটিনাটি কথায় একটু আধটু গরমিল হতে পারে। আপনাদের বিয়ে হয়েছিল মাঘ মাসে। ষোলো মাঘ। ত্রয়োদশী তিথিতে।"

বিদ্যাবতী অস্ফুটভাবে কী যেন বললেন।

কমল বলল, "এই বিয়ের একটা শর্ত ছিল। রাধাকমল বা শ্যামাচরণকে বরাবর ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে। সে তাতেই রাজি হয়ে আপনাকে বিয়ে করেছিল।"

অস্বীকার করলেন না বিদ্যাবতী।

কমল অপেক্ষা করল, যেন বিদ্যাবতীকে সময় দিল কথা বলার। উনি কিছু বলছেন না দেখে কমল আবার বলল, "এই বিয়েতে আপনার দাদার আপত্তি ছিল। বাবার ছিল না। কোথাকার কে শ্যামাচরণ—যার না আছে বংশমর্যাদা না আছে অর্থ সে কেমন করে রঘুনাথগঞ্জের জমিদার বাড়ির জামাই হয়!"

বিদ্যাবতী বললেন অস্পষ্টভাবে, "তুমি আমাদের সাবেকি বাড়ির কথাও জান?"

কমল বলল, "বিয়ের সময় আপনার বয়েস ছিল ষোলো-সতেরো। আপনাকে দেখতে ছিল রাজকন্যার মতন। শ্যামাচরণের সঙ্গে আপনাকে রূপে মানিয়েছিল। বংশমর্যাদা নয়, অর্থে নয়। আর গুণের দিক থেকে দেখলেও আপনি ছিলেন গুণবতী। শ্যামাচরণের গুণ বলতে ছিল তাঁর সরলতা, ব্যবহার। মায়া-দয়া।"

বিদ্যাবতী চোখের পাতা বন্ধ করে ছাদের দিকে মুখ তুলে থাকলেন। কমলকে আর তিনি দেখছিলেন না।

"শ্যামাচরণ অবশ্য লেখাপড়া জানতেন। তখনকার দিনে—সে আজ কত বছর হল, সত্তর-পঁচাত্তর বছর—তখনই তিনি কলেজে পড়েছিলেন। কিন্তু পড়া শেষ করে উঠতে পারেননি।"

বিদ্যাবতী বললেন, "ওসব কথা থাক।" কমল বলল, "আপনাদের বিয়ের বছরে যুদ্ধ লেগে যায়। উনিশ শো চোদ্দ সালের কথা। বছর দুই-তিন শ্যামাচরণ শ্বশুর বাড়িতে ঘরজামাই হয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আপনার দাদার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান একদিন।"

বিদ্যাবতী মাথা নাড়লেন। "দাদা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।"

"হয়ত। কিন্তু সকলের কাছে বলা হয়েছিল, শ্যামাচরণ পল্টনে যোগ দিয়ে যুদ্ধে চলে গিয়েছেন।...বছর দুই পরে বলা হল মারা গিয়েছেন।"

বিদ্যাবতী চোখ খুললেন। "তুমি এত কথা জানলে কেমন করে?"

"জানি। আরও জানি। শ্যামাচরণকে শুধু তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, তার পেছনে লোক লাগিয়ে আধখানা জিব কেটে দেওয়া হয়েছিল।"

বিদ্যাবতী যেন সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলেন। "না, না, এ কী বলছ তুমি? দাদা...."

"দাদার কথা পরে বলছি," কমল বলল, "আপনি আমাকে একটা কথা বলুন।...বিয়ের দু বছরের মাথায় আপনার যে ছেলেটি হয়েছিল তার কী হল?"

বিদ্যাবতী যেন এমন কিছু শুনলেন, আতঙ্কে তাঁর গলা দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দ বেরুলো। চোখ বুজে ফেললেন।

কমল বলল, "হারিয়ে গিয়েছিল, না, শ্যামাচরণই তার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল?"

বিদ্যাবতী কাঁপছিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। বললেন, "কাশীতে গিয়েছিলাম আমরা গঙ্গা স্নান করতে। সেখানে হারিয়ে গিয়েছিল।"

মাথা নাড়ল কমল। "না, শ্যামাচরণ তখন কাশীতে। তিনি আপনাদের দেখে ফেলেছিলেন। তারপর আচমকা সুযোগ পেয়ে তাঁর ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যান।"

বিদ্যাবতী আর সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। বুকের কষ্ট। অবশ অসাড় হয়ে আসছিল সমস্ত শরীর। কোনো রকমে বললেন, "তুমি এখন যাও। আমার শরীর খারাপ লাগছে। কাউকে ডেকে দাও। পরে কথা বলব।"

কমল উঠে পড়ে ময়না বা অন্য কাউকে ডাকতে গেল।

স্টেশনের দিকেই গিয়েছিল কমল।

রামগতির সঙ্গে দেখা হল না: গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ফুলানটাঁড়ের দিকে। রামগতির বউ আড়াল থেকে বলল, কিছু বলতে হবে কিনা? কমল বলল, সে এসেছিল বললেই হবে।

স্টেশনের আশেপাশে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা শেষ করে কমল দোকানে বসে চা খেল। তারপর রত্ননিবাসে ফেরার জন্যে রিকশা ধরল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে আসছে।

স্টেশন থেকে বেরুবার মুখেই কমল নরেশকে দেখতে পেল। মাল-বওয়া ভাঙা ভোঁতা একটা লরির আড়ালে পড়ে যাওয়ায় নরেশ তাকে দেখতে পায়নি।

দেখার মতন মনের অবস্থাও তার নয়। সূর্য অস্ত গিয়েছে ; নরেশের মন এখন ছটফট করছে নেশার জন্যে।

রিকশাঅলা বাঁদিকের মোড় নিয়ে রত্ননিবাসের পথ ধরল।

কমল অন্যমনস্ক। সকালের কথাই ভাবছিল। বিদ্যাবতীর সঙ্গে তার কথাবার্তা শেষ হল না। উনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কমল অবশ্য এটা অনুমান করেছিল। বৃদ্ধার পক্ষে এই ভীষণ চমক সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে নিজের জীবনের গোপনতম কাহিনী অন্যের মুখ থেকে শোনা যাবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ভাবার কথাও নয়। সত্তর বছর আগে কী ঘটেছে তাব স্মৃতি মানুষ বড়ো একটা মনে রাখতেও পারে না। এক্ষেত্রে যদিবা মনের কোথাও তার দাগ থেকেই থাকে—তবু বিদ্যাবতী কেমন করে ভাববেন, সামান্য একটা বাইরের ছেলে এসে সেই দাগের ওপর নখের আঁচড় বসাবে ! বিদ্যাবতী ভাবেননি। তিনি এমনও আশা করেননি—সত্তর বছর আগেকার কোনো জের আজও অবশিষ্ট আছে !

কমল বুঝতে পারছে না, বিদ্যাবতী যদি বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে বাকি কথাবার্তার কী হবে। অপেক্ষা করতে হবে কমলকে ! নাকি, আপাতত তাকে কোনো অজুহাত দেখিয়ে সরিয়ে রাখা হবে !

তবে কমলের মনে হয়, বিদ্যাবতী এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ার মানুষ নন। সকালে তিনি যতই বিস্মিত, বিচলিত, হতবাক হোন না কেন, একবারও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠেননি, যা স্বাভাবিক ছিল। উনি প্রাণপণ সহ্য করছেন। বৃদ্ধার মনের জোর কমলকেই অবাক করছিল।

অন্ধকার ঘন হয়ে এল দেখতে দেখতে। হেমন্তের কুয়াশা নামেনি এখনও, পলাশ মহুয়ার জঙ্গল কালো হয়ে গিয়েছে, তারা ফুটেছে আকাশে, বাতাসে নরম শীতের ছোঁয়া।

রত্ননিবাসের কাছে এসে কমল রিকশা থামিয়ে নামল। ভাড়া মেটাল। রিকশাঅলা তার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

বড় ফটকের মাথায় বাঁধা শেকলের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে কমল ভেতরে এল। সামনে তাকাল। অন্ধকারে রত্ননিবাসকে কেমন যেন ভৌতিক বলে মনে হয়। আলোর ফোঁটা অবশ্য চোখে পড়ছিল।

কমল বাড়ির কাছাকাছি সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে আসতেই কাকে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ময়না।

কমল কিছু বলার আগেই ময়না বলল, "আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।"

দাঁড়িয়ে পড়েছিল কমল। দেখল ময়নাকে। গায়ে ছাপা শাড়ি, গায়ে সাদা

জামা। ওর চুল বাঁধার মতন নয় ; বাঁধেও না। ঘাড় পর্যন্ত কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে আছে। চাপা মুখ, বসা নাক।

কমল বলল, "আমার জন্যে ?"

"আপনাকে ডাকছেন," বলে হাত দিয়ে নিচের তলার অফিস ঘরের দিকে দেখাল। দরজা খোলা। আলো জ্বলছে অফিস ঘরে।

"ম্যানেজারবাবু ?"

"হ্যাঁ। আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। আপনি ফিবলেই যেন নিয়ে যাই।"

কমল অফিস ঘবেব দিকে তাকাল। "উনি তো সন্ধেবেলায় অফিসে নামেন না।"

"খুব কম। দরকার না পডলে নয়।"

কমল সিঁড়ি উঠে এগুতে লাগল। তার ছডিব শব্দ হচ্ছিল।

পেছনেই ছিল ময়না। হঠাৎ বলল, "একটা কথা বলব !...আপনি কাল কখন কুকুবের ডাক শুনেছিলেন ?"

কমল ঘাড ফিরিয়ে ময়নাকে দেখল। কুকুব-ডাকের কথাটা ভোলেনি ময়না। বলল, "ঘড়ি দেখিনি।" বলাব মধ্যে ঠাট্টাব ভাব ছিল।

"শেষ রাতে ?"

কমল যেন ভাবল। "না। মাঝ বাতে।"

"আইভি ভিলার কুকুর হতে পাবে। বাঘের মতন দেখতে।...না হলে 'পাহাড়ি'।"

"পাহাড়ি ?"

"একটা জংলি কুকুর। আমাদেব পাডাব এদিকে ওদিকে থাকে। কখনো কখনো আমাদের বাড়িব পেছন দিকেব ভাঙা পাঁচিল দিয়ে ঢুকে পডে। ওকে দেখলেই ভয় করে।"

কমল হাঁটতে হাঁটতে বলল, "জংলি কুকুব অনেকটা নেকডেব মতন।"

"দেখেছেন আপনি পাহাড়িকে ?"

"জংলি কুকুর দেখেছি।"

অফিস ঘরের দরজার কাছাকাছি এসে ময়না গলা নামিয়ে চুপি চুপি কথা বলার মতন করে বলল, "রাত্তিরে বাড়ির নিচে নামবেন না। বাইবেও যাবেন না।....আর বেশি অন্ধকার হয়ে গেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবেন না।"

কমল জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কেন ? তার আগেই জিবে শব্দ করে মুখে আঙুল দিয়ে কথা বলতে বারণ করল ময়না।

ময়না কমলকে নিয়ে অফিস ঘরে ঢুকল।

সকালের মতনই তাঁর নিজের জায়গায় বসে ছিলেন প্রসন্ননাথ। সামান্য তফাতে বাতি জ্বলছে। ঘরের জানলা বন্ধ। প্রসন্ননাথের টেবিলের ওপর খাতাপত্র কাগজ কিছুই খোলা নেই। হাতে চুরুট।

"আসুন," প্রসন্ননাথ ডাকলেন। "বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ?"

"স্টেশনের দিকে।"

"বসুন।....ময়না, মাকে বলো আমরা অফিস ঘরে বসে আছি।"

ময়না চলে গেল।

কমল বুঝতে পারল, এই সন্ধেবেলায় অফিস ঘর খুলে বসে থাকা, আর ময়নাকে পেয়াদার মতন বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার কারণ রয়েছে।

কমল সামনে এসে বসল।

প্রসন্ননাথ কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "আপনার সকালের অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি। কারণটাও বুঝিনি।....যাক্—আপনি মায়ের সঙ্গে একা একাই শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা বলতে পেরেছেন।" বলে প্রসন্ননাথ অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকলেন সামান্য।

কমল বলল, "কথা শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি।"

"জানি। মায়ের কথা থেকে মনে হল।"

কমল প্রসন্ননাথকে লক্ষ করল। "উনি কি আপনাকে কিছু বলেছেন ?"

"না।" মাথা নাড়লেন প্রসন্ন। বললেন, "শুধু বললেন, আজ সন্ধেবেলায় উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। যদি অবশ্য শরীর আরও না খারাপ হয়।"

"ওঁর যেমন ইচ্ছে," কমল বলল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর প্রসন্নাথ বললেন, "একটা কথা আপনাকে বলি। আপনি যদি সকালে আমায় অন্তত আভাসেও বলতেন, মায়ের বিবাহিত জীবনের কথা আপনি তুলবেন, আমি ওঁর সামনে থাকতাম না। আপনি বলেননি।....যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। মায়ের স্বামীর নাম ছাড়া আমি আর কিছু শুনিনি তখন।....না না, আপনার কাছে শুনতেও চাইছি না। যদি কিছু শোনানোর থাকে মা নিজেই আমায় শোনাবেন। তাঁর মুখের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"আপনি ওঁকে খুব বেশি বিশ্বাস করেন!"

"করি।....ও কথা থাক্। আপনাকে একটা জিনিস দেখাই। দেখুন, যদি কিছু উদ্ধার করতে পারেন।"

প্রসন্ননাথ তাঁর বিশাল টেবিলের একপাশের ড্রয়ার খুলে কাগজে মোড়া কী

একটা বার করলেন। কাগজ সরাতেই চোখে পড়ল বোর্ডে বাঁধানো একটা ফটো। বোর্ডের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, অনেক পুরনো, পোকায় কাটা, কোনাগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে।

ছবিটা এগিয়ে দিয়ে প্রসন্নাথ বললেন, "দেখুন তো, এর মধ্যে শ্যামাচরণ বা রাধাকমলকে খুঁজে পান কিনা ?"

কমল ফটোটা নিল। এত পুরনো ফটো যে, রঙ হলুদ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝেই সাদা. দাগ ধরা। চোখ-মুখ একেবারেই অস্পষ্ট। নাক চোখ উঠে গিয়েছে অনেক জায়গায়। শিকারীর বেশে চারজনকে দেখা যায়। মাথায় শোলার হ্যাট, পরনে হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট, পায়ে বুট জুতো মোজা। দুজনের হাতে বন্দুক। বাকি দুজনের হাতে লাঠি।

কমল দেখল। বলল, "আমি বুঝতে পারলাম না।"

প্রসন্ননাথ বললেন, "আমাব খেয়াল বলতে পারেন, কিংবা কৌতূহলও বলতে পারেন। আমি এ-বাড়ির পুরনো কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ, কিছু কিছু পুরনো জিনিস, দু-চারটে ছবি হাতডাতে হাতড়াতে যা পেয়েছি, রেখে দিয়েছি। তার মধ্যে এই ফটোটা ছিল। আজ দুপুরে আমার মনে পড়ল ফটোটার কথা। বিকেলে খুঁজে হাতড়ে বার করলাম।....ওই ফটোর মধ্যে একজন বড়বাবু। একেবারে জোয়ান বয়েসের ছবি। তবু মুখের আদলে ধরা যায়। বাকি তিনজন কে ?"

কমল কী মনে করে বলল, "আপনাদের ছোটবাবু হতে পারেন একজন !"

"না। বড়বাবুর জোযান বয়েসে ছোটবাবু ছোটই ছিলেন, জোয়ান হননি।"

"ছবিটা ওঁকে দেখাননি ? বিদ্যাদেবীকে ?"

"দেখিয়েছিলাম। উনি বললেন, বড়বাবু ছাড়া উনি কাউকে চেনেন না। বাকিরা তাঁর শিকারের বন্ধুবান্ধব।"

"তবে তাই।"

"হয়ত। তবু আপনাকে একবার দেখালাম, যদি শ্যামাচরণ বা রাধাকমলকে ধরতে পারেন।....আপনি কি শ্যামাচরণকে দেখেছেন ?"

মাথা নাড়ল কমল। "একটা ফটো দেখেছি।"

"এর সঙ্গে মিলছে না ?"

"বুঝতে পারলাম না। মুছে যাওয়া ছবি। তার ওপর মাথায় শোলার হ্যাট থাকায় কপাল ঢাকা পড়েছে। চোখের দিকটা কালো...."

"শ্যামাচরণ সম্পর্কে আমাকে বলার মতন কিছু আছে ?"

"মাফ করবেন।"

এমন সময় ময়না এল। বলল, "দিদিমামণি যেতে বলেছে।"

"ঠিক আছে। বলো আসছি।"

ময়না চলে গেল।

দু-চার মুহূর্ত বসে থেকে প্রসন্ননাথ ছবিটা তুলে নিয়ে কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রাখলেন। চাবি বন্ধ করলেন ড্রয়ারের।

"চলুন," প্রসন্ননাথ উঠে দাঁড়ালেন।

কমলও উঠে পড়ল।

ঘরের বাইরে এসে প্রসন্ননাথ বললেন, "ভাল কথা, আপনাকে এখন যে-ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাব সেই ঘরে মা আজকাল আর বড়ো যান না। এক সময়ে রোজই সকালে বসতেন। আমার ডাক পড়ত। কাজকর্মের কথা হত। এখন আর ও-ঘরে বসেন না। এক আধদিন খেয়াল হলে বসেন। ঘরটা মায়ের শোবার ঘরের পাশেই।....সামনের বারান্দা দিয়ে আমরা যাব না। পাশের সরু বারান্দা দিয়ে যাব। আসুন।"

বিদ্যাবতী ঘরেই ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন।

কমলকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রসন্ননাথ বললেন, "মা, আমি যাই।"

"বাইরে থাকো।... দরকার হলে ডাকব।"

প্রসন্ননাথ চলে গেলেন।

কমল ঘরটা দেখছিল। আলো এত কম যে এই বিশাল ঘরের সামান্যই চোখে পড়ে। অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। এ যেন কোনো রাজরাজড়ার বাড়ির নিভৃত কোনো কক্ষ। বড় বড় জানলা। জানলার মাথায় কারুকর্ম। খড়খড়ি আর মোটা কাচের পাল্লা। দেওয়াল জুড়ে নানান সামগ্রী। বাঘের মুখ, হরিণের শিং, বড় বড় ছবি দু-তিনটে, এক জোড়া খাপে ঢাকা তলোয়ার, পুরনো নকশার জিনিস কিছু কিছু, সেকেলে বসার জায়গা, মস্ত মস্ত দেরাজ, রকমারি মোমদান। এমনকি খড়বালি পোরা একটা কুকুর শুয়ে আছে। মনে হয় জ্যান্ত।

বিদ্যাবতী বড় সোফার মতন একটি আসনে শুয়ে ছিলেন।

কমলকে বসতে বললেন। কাছে এসে।

কমল কাছাকাছি জায়গায় বসল।

অল্প চুপচাপ থাকার পর বিদ্যাবতী বললেন, "ভেবেছিলাম পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। দেখলাম, তাতে অস্থিরতা বাড়বে আমার। শরীর আরও খারাপ হবে। যা শোনার শুনে নেওয়াই ভাল।"

কমল কোনো কথা বলল না।

বিদ্যাবতী বললেন, "আমাকে বেশি কথা বলিও না। যা বলার তুমি বলো,

আমি শুনবো।"

কমল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আপনারা কাশী গিয়েছিলেন পুজোর আগে। সঙ্গে আপনার দাদা ছিলেন না। বাড়ির অন্য মেয়েরা ছিলেন, কর্মচারীরা ছিল। মহালয়ার দিন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আপনার ছেলে হারায়। বা চুরি যায়।"

বিদ্যাবতী বললেন, "দিনটাও তুমি জান?"

"আরও জানি," কমল বলল। "শ্যামাচরণ যে কাশীতে আছেন আপনাদের জানা ছিল না। তিনি তখন কাশীতে বাঙালিটোলায় একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। দুঃখকষ্টেই তাঁর দিন কাটত। জিব-কাটা মানুষ, কথা বলতে পারতেন না, অদ্ভুত শব্দ বেরুতো মুখ দিয়ে। ভদ্রলোক নিজের পেট চালাবার জন্যে লেখা নকলের কাজ করতেন। ওঁর হাতের লেখা ছিল ছাপার অক্ষরের চেয়েও সুন্দর। কাশীর নাম করা জনা কয়েক পণ্ডিত আর জ্যোতিষী ওঁকে দিয়ে লেখা নকলের কাজ করাতেন।"

বিদ্যাবতী মাথা নাড়লেন। "ওঁর হাতের লেখা মুক্তোর মতন ছিল।"

"ছেলে হারানোর কথাই বলি," কমল বলল, "আপনারা কাশী যাবার পর দৈবাত একদিন শ্যামাচরণ আপনাদের দেখতে পেয়ে যান। আপনারা ওঁকে দেখেননি। সঙ্গে আপনার ছেলে ছিল।...শ্যামাচরণের তখন কী যে হয়ে যায়—উনি ঠিক করেন, নিজের ছেলেকে উনি চুরি করবেন।"

বিদ্যাবতী কোনো কথা বললেন না।

কমল নিজেই বলল, "কাশীতে পুজোর আগে বাঙালিদের ভিড় হয়। তখনও হত। সেবারও হয়েছিল। মহালয়ার দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে আপনাদের স্নানের সময় আপনার ছেলে চুরি হয়ে যায়। খোঁজ খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। আপনারা ভেবে নিয়েছিলেন, হয় গঙ্গায় পড়ে ডুবে গিয়েছে, না হয় হারিয়ে গিয়েছে।"

বিদ্যাবতী দু চোখ বুজে ফেললেন। যেন সেই দিনের কথা তাঁর মনে পড়ছিল, তিনি ছেলে হারানোর স্মৃতি ছবির মতন দেখছিলেন।

"আপনাদের ছেলের নাম ছিল স্বর্ণকমল। রাধাকমলের সঙ্গে মিলিয়ে স্বর্ণকমল। তাকে আপনারা ডাকতেন, সোনা বলে।"

বিদ্যাবতী চোখের পাতা বন্ধ করেই বললেন, "তাও তুমি জান? তারপর?

"তার পরের কথা তো অনেক। বলতে শুরু করলে শেষ হবার নয়। তবু কতকগুলো কথা জানিয়ে রাখি," কমল বলল, "শ্যামাচরণ কাশীতে বেশিদিন থাকেননি। তাঁর ভয় হত, ছেলে চুরির দায়ে পুলিশে না ধরে। সুখময় শাস্ত্রী নামে

এক জ্যোতিষী ও পণ্ডিতের কাজ করতেন শ্যামাচরণ। তাঁর পরামর্শে কাশী থেকে পালিয়ে তিনি গয়ায় চলে যান। গয়ায় শ্যামাচরণের এক বন্ধু থাকতেন। দিনুবাবু। রেলে চাকরি করতেন ভদ্রলোক। গয়াতেই শ্যামাচরণ মারা যান কলেরা রোগে। দিনুবাবুদের কোনো সন্তান ছিল না। শ্যামাচরণের ছেলেকেই তাঁরা মানুষ করেন।"

বিদ্যাবতী বললেন, "সেই ছেলের তখন বয়েস কত ?"

"বোধ হয় চার-পাঁচ। শ্যামাচরণের ভাগ্যে স্ত্রী, সন্তান—কোনোটাই ছিল না। পেয়েছেন, হারিয়েছেন। তাঁর ছেলেরও মন্দ কপাল। যাব কাছে মানুষ হচ্ছিল—সেই ভদ্রলোক বদলির চাকরি নিয়ে পাঁচ জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত গোমোয় এসে মারা গেলেন। স্বর্ণকমলের বয়েস তখন বছর চোদ্দ। দিনুবাবুর পুরো নাম ছিল দিনেশ গুপ্তা। পুরো বাঙালি নয়, আধ-বাঙালি। স্ত্রী ছিলেন বাঙালি। স্বর্ণকমলকে পাছে কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়, পদবী পালটে গুপ্তা করে দিয়েছিলেন। গুপ্তা থেকে গুপ্ত।"

বিদ্যাবতী বললেন, "ছেলেটির কী হল ?"

কমল নিস্পৃহ গলায় বলল, "বিশেষ কিছু হয়নি। লেখাপড়ায় মাথা ছিল না, স্বভাবটাও বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল। খেপাটে গোছের ছিল। রেলের লোকো কারখানায় হাতুড়ি পিটতো। নেশাভাঙ রপ্ত করে ফেলেছিল ভালভাবে। জুয়াটুয়াও খেলত। সাত ঘাটের জল খেতে লাগল। একটা কাজ ধরে, ক' মাস পরে ছেড়ে দেয়, না হয় তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে এসে পড়ল কলকাতায়। বিয়েও করেছিল। থাকত বস্তিতে। টি বি হয়ে মরে গেল। আর তার বউ ভদ্দর লোকদের বাড়িতে ঝিগিরি করত।"

"ছেলেমেয়ে ?"

"একটি ছেলে। দু বেলা মা-ছেলের ভাত জুটত না ভাল মতন। মুড়ি, বাতাসা, শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়ে, ভিজে ছোলা খেয়ে কত দিন কেটেছে। চিট বিছানা, ভাঙা তক্তপোশের ওপর শুয়ে শুয়ে রাত কেটেছে মা আর ছেলের। ছেলেকেও দু পাঁচ টাকা রোজগারের চেষ্টা করতে হয়েছে। মুটেগিরি থেকে সাইকেলের দোকানে চাকরি····।"

বিদ্যাবতী একটা হাত চোখের ওপর তুলে নাক চোখ কপাল চাপা দিয়ে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। সমস্ত ঘর নিঃশব্দ। আলো যেন আরও ম্লান হয়ে এসেছে। সাজানো বাঘের মুখের ছায়া পড়ছিল দেওয়ালে। নকল কুকুরের চেহারাটা অন্ধকারে ওত পেতে বসে থাকার মতন স্থির দেখাচ্ছিল।

শেষে বিদ্যাবতী বললেন, "তোমার নাম কমলকুমার ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার স্বামীর নামের কমল, ছেলের নামের কমলের সঙ্গে তোমার নামের কমলও জড়িয়ে রেখেছ!"

"রাধাকমল, স্বর্ণকমল, কমলকুমার…" কমল যেন ম্লান মুখে হাসল একটু।

"তুমি সোনার ছেলে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার মা বেঁচে আছে?"

"না। মা অনেক দিন হল মারা গিয়েছে।"

বিদ্যাবতী কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। পরে বললেন, "তুমি বলছ, তোমরা বস্তিতে মানুষ হয়েছ, তোমার মা ঝিগিরি করেছে, তুমি মুটেগিরি করেছ। তোমায় দেখলে তো তা মনে হয় না। তুমি এইভাবে কথা বলতে, এ-রকম সহবত-আচরণ কার কাছে শিখেছ?"

কমল বিদ্যাবতীকে লক্ষ করতে করতে বলল, "'একাজি'; আমার গুরুর কাছে। তিনি আমায় সব শিখিয়েছেন।"

"কে 'একাজি'?"

"আপনি চিনবেন না।"

বিদ্যাবতী যেন কিছু ভাবছিলেন। বললেন, "তুমি যা বলেছ তার অনেকটাই সত্যি। কাশীতে আমার ছেলে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। বাকিটা যদি সত্যি না হয়?"

কমল বলল, "আপনি প্রমাণ চাইছেন?"

বিদ্যাবতী মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, চাইছেন।

কমল বলল, "সে-রকম কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই।…আমার বাবা ছন্নছাড়া মানুষ ছিল, মদ আর জুয়া বাবাকে ভিখিরি করে ফেলেছিল। তবু একটা জিনিস বাবা নষ্ট করেনি। শ্যামাচরণকে বিয়ের সময় আপনাদের বাড়ির রেওয়াজ-মতন একটা রুপোর চাবি দেওয়া হয়েছিল। জোড়া চাবির একটা আপনার কাছে, অন্যটা শ্যামাচরণের কাছে। আপনার চাবিতে ছোট করে খোদাই করা আছে 'রাধা' আর শ্যামাচরণের বা রাধাকমলের চাবিতে খোদাই করা আছে 'বিদ্যা'। এই জোড়া চাবি দিয়ে যে বাক্সটি খোলা যায়—সেটি আপনার কাছে গচ্ছিত আছে। তার মধ্যে কী আছে তাও আমি বলে দিতে পারি।"

বিদ্যাবতী এমনভাবে চমকে গেলেন যেন তিনি চোখের সামনে শ্যামাচরণের প্রেতাত্মাকে দেখতে পেলেন হঠাৎ।

কমল বলল, "দানপত্র। যৌতুক হিসেবে আপনার বাবা ভূসম্পত্তি ও অন্য

অন্য যা যা দান করেছিলেন মেয়ে-জামাইকে, তার কথা।"

বিদ্যাবতীর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল।

কমল বলল, "শ্যামাচরণের কথা জানতে আমি অনেক কষ্ট করেছি। 'একাজি'—অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। তিনি কত কী যেন দেখতে পেতেন। আমায় বলেছিলেন নিজেকে জানতে-চিনতে। কাশীতে আমি অনেক ঘুরেছি। সুখময় শাস্ত্রী নামের সেই জ্যোতিষী, তখন তিনি অথর্ব, অক্ষম—আমাকে আমার ঠাকুরদার লেখা কয়েকটা চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিগুলোতে শ্যামাচরণের সব কথাই আছে। এগুলো গয়া থেকে লেখা হয়েছিল সুখময় শাস্ত্রীকে।"

বিদ্যাবতী নীরব। নিঃসাড়।

ছায়া-জড়ানো ঘরের দেওয়াল থেকে অন্ধকার যেন ক্রমশই গড়িয়ে আসছিল। ভৌতিক চেহারা নিয়ে কতকগুলো বড় বড় ছবি দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। বড়বাবু, লীলাবতী....। বিদ্যাবতীর মা, বাবা।

বিদ্যাবতী হঠাৎ বললেন, "আমি উঠবো। তুমি আজ এসো। চাবি আর চিঠিগুলো আমায় দেখিও কাল।"

কমল উঠে দাঁড়াল।

বিদ্যাবতী বললেন, "প্রসন্ন বাইরে আছে। তুমি দরজার কাছে গিয়ে ওকে ডাকো। তোমায় পৌঁছে দেবে।"

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল বিদ্যাবতীর। শেতল ডাক্তারের দেওয়া নতুন ঘুমের ওষুধ ছাড়াও জিতেন কবিরাজ কিসের এক বড়ি দিয়েছে, পুঁতির মতন দেখতে—দুইই খাচ্ছেন বিদ্যাবতী। তাতে দু তিন ঘণ্টা হয়ত ঘুম হয়, বাকি সময়টা আচ্ছন্নের মতন পড়ে থাকেন। বিদ্যাবতী জানেন, এ-বয়েসে এর বেশি ঘুম হবার নয়। হয় না।

ঘুম ভাঙার পর বিদ্যাবতী বুঝতে পারলেন, এখন শেষ রাত। এই ঘর, এই বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে তিনি অনেক কিছুই অনুমান করতে পারেন। ঘরের অন্ধকারের ঘনতা, শুক্লপক্ষের দিন জানলার কাছে লুটোনো চাঁদের আলোর উজ্জ্বলতা, বাইরের গাছপালার স্তব্ধ ভাব, আচমকা বাতাসের ঝাপটা লেগে ডালপালা নড়ে উঠার শব্দ, কি বারান্দায় খসখস করে কী উড়ে গেল তার আওয়াজ—এ সবই তাঁর অনুভূতিকে এমন অভ্যস্ত করে তুলেছে যে তিনি মোটামুটি রাত্রের সময় এবং অবস্থাটা অনুমান করতে পারেন।

বিদ্যাবতী বুঝতে পারলেন, এখন শেষ রাত। ভোর হবার মুখে পাখির ডাক শোনা যাবে। জানলার দিকের অন্ধকার হালকা হয়ে আসতে আসতে ফরসা

দেখা দেবে, তারপর আলোর আভা। শেষে রোদ।

ঘুম ভাঙার পর বিদ্যাবতী তাঁর নরম, তুলো-মেশানো, হাল্কা কাঁথা বুকের ওপর আরও টেনে নিলেন। শীত শীত করছিল। চোখের পাতা আবার বন্ধ করলেন।

এটা খুবই আশ্চর্যের যে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত তাঁর যেসব কথা মনে আসছিল, এখন আবার সেই কথাগুলোর সঙ্গে নতুন করে আরও কত কী জোড়া লেগে গেল।

শ্যামাচরণকেই তাঁর মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল নিজের বিয়ের কথা। এসব এত পেছনের কথা, এমন এক অতীতের কথা যে, চেষ্টা করলেও যেন অত পুরনো স্মৃতি আর স্পষ্ট করে মনের মধ্যে ধরা যায় না। কখনো কখনো এক আধটা ঘটনা হয়ত বিদ্যুতের মতন চমকে উঠে মনের কোনো প্রান্তে ঝিলিক দিয়ে গেল, বাকি সব বিবর্ণ, আবছা। তবু মুছে আসা রেখার মতন সেই অতীতকে মনে পড়ে বইকি।

নিজের বিয়ের কথা বিদ্যাবতীর কিছু মনে আছে, কিছু না-থাকার মতন। শ্যামাচরণকে মনে আছে, তবে তাঁর চেহারা এখন আর উজ্জ্বলভাবে মনে করতে পারেন না। তাঁর স্বামী যে রূপবান ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই রূপ উগ্র ছিল না। শান্ত ছিল। তাঁর গায়ের রঙ বিদ্যাবতীর চেয়ে হয়ত সামান্য অপরিষ্কার ছিল, কিন্তু সরল চোখ, ছেলেমানুষের মতন হাসিভরা মুখ, বিনীত হাবভাব, নরম গলার স্বর—সকলেরই পছন্দ ছিল। এক যা ছিল না—তা হল দাদার—বড়বাবুর।

শ্যামাচরণকে বাবা কেমন ভাবে পেয়ে গিয়েছিলেন সে এক ছোট ইতিহাস। বিদ্যাবতী স্বামীর মুখে শুনেছেন, বাবা যেবার মুঙ্গেরে যান নিজের কোনো কাজেকর্মে, সেবার তিনি শ্যামাচরণকে হঠাৎ দেখেন। বৈজুবাবুর বাড়িতে। দেখে তাঁর খুব ভাল লেগে যায়। ছেলেটি লেখাপড়া জানা, আদি বংশকৌলীন্য থাকলেও শ্যামাচরণের না ছিল আত্মীয়জন, না কোনো পিছুটান। বৈজুবাবুর এস্টেটে কাজ করত ছেলেটি। বিশ্বাসী, কর্মপটু।

বাবার এত ভাল লেগে যায় শ্যামাচরণকে যে তিনি বৈজুবাবুর কাছ থেকে ওকে চেয়ে নেন। নিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

বাবা-মা বরাবরই চেয়েছিলেন মেয়েকে তাঁরা পরিবারের বাইরে যেতে দেবেন না। এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন—যে ঘরের ছেলের মতন হয়ে থাকবে। ঘর জামাই। তাঁদের দরকার ছিল নিঃসম্পর্কীয় সদ্বংশের একটি ছেলে। শ্যামাচরণ সেদিক থেকে তাঁদের চাহিদা মিটিয়ে দেবার মতন পাত্র ছিলেন।

দাদার তাতে আপত্তি ছিল। আরও আপত্তি ছিল, বিষয়-সম্পত্তির ওপর বাইরের লোকের নাক গলানো।

দাদার আপত্তি, অপছন্দ—কোনোটাই কাজে লাগেনি। বাবা মেয়ের বিয়ে দিলেন নিজের পছন্দমতন ছেলের সঙ্গে। আর শর্তও থাকল। শ্যামাচরণকে রায়বাড়িতেই স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। শ্যামাচরণের নামও পাল্টে দেওয়া হল, রাধাকমল। সত্যিই শ্যামা নাম রায়বাড়িতে রাখা যায় না।

বিদ্যাবতীর তখন কী বা বয়েস। ষোলো সতেরো। বয়েসের তুলনায় বিদ্যাবতীর জ্ঞানবুদ্ধি অনেক প্রখর ছিল। স্বামীকে গ্রহণ করতে, ভালবাসতে, এমন কি তাঁকে অবলম্বন করতে আটকায়নি। বিদ্যাবতী খুশি হয়েছিলেন।

এক একজন মানুষের মাথায় যে কী ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়—বোঝানো মুশকিল। বিদ্যাবতীরও বরাবর ধারণা ছিল, তিনি পিতৃগৃহ এবং এই পরিবেশ থেকে তফাতে গিয়ে থাকতে পারবেন না। মেয়ে হলেও তিনি পিতৃ-পরিবারের। নিজের জীবনের সঙ্গে অন্য জীবন যোগ হতে পারে, কিন্তু যেখানকার গাছ তিনি সেখানকার মাটি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গেলে তিনি বাঁচবেন না। রায়-বাড়ির মাটির সঙ্গে তাঁর জীবন এবং অস্তিত্বের শিকড় এমনভাবে গভীরে ছড়ানো যে বিদ্যাবতীর পক্ষে স্থানান্তর সম্ভব নয়। বলা উচিত এই মনোভাব ছিল 'আবেশজ'। শ্যামাচরণ ঠাট্টা করে ইংরিজিতে বলতেন, অবসেসান।

বিদ্যাবতী ইংরিজি জানতেন না। শ্যামাচরণ জানতেন। শ্যামাচরণ স্ত্রীকে ইংরিজি অক্ষর চেনাতেন, বানান, মানে শেখাতেন। বিদ্যাবতীর অবশ্য তাতে মন ছিল না। তিনি বাংলা বইটই পড়তেন, সংস্কৃত শ্লোক শিখতেন। স্বামীকে জব্দও করতেন মাঝে মাঝে।

বিয়ের পর বিদ্যাবতী স্বামী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ তোলেননি। তোলার কারণ ছিল না। সুশ্রী সুন্দর সরল স্বামী, হাসিখুশি তাঁর স্বভাব, অগাধ ভালবাসা তাঁর—বিদ্যাবতী কানায় কানায় সুখী ছিলেন। একমাত্র দুঃখ যা ছিল—শ্যামাচরণ কঠিন হতে পারতেন না। পুরুষ মানুষ হিসেবে দুর্বল ছিলেন। নরম প্রকৃতির। তাতে বিদ্যাবতীর সুখে অবশ্য ভাটা পড়েনি।

এই সুখে প্রথম খোঁচা লাগল বিয়ের বছরখানেক পরে। শ্যামাচরণকে ক্ষুণ্ণ মনে হল। বড়বাবুর আচরণে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

সেই প্রথম শ্যামাচরণ স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'বিদ্যা, আমি বোধ হয় ভুল করেছি।'

'কেন?'

'তোমার মতন স্ত্রী না পেলে আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতাম।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'বড়বাবু আমাকে সহ্য করতে পারছে না। অপমান করে কথা বলে।'

বিদ্যাবতী স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, আলগা কথাবার্তা গায়ে ন মাখতে। আর যদি মাখতেই হয় বড়বাবুর কাছে মাথা নিচু না করতে। বড়বাবু বরাবরই বদমেজাজি। কিন্তু মানুষ খারাপ নয়।

এরপর থেকে দেখা গেল শ্যামাচরণ ক্রমশই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, এমন কি মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। বিদ্যাবতী তখন সন্তানসম্ভবা। স্ত্রীর জন্যে শ্যামাচরণের চিন্তা ছিল। তিনি সব কথা বলতেন না। চেপে রাখতেন।

কিন্তু কতকাল আর মানুষ সহ্য করতে পারে। বিরোধ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শেষে একদিন এমন এক ঘটনা ঘটল যে শ্যামাচরণকে শান্ত রাখা গেল না।

বড়বাবুর সম্পর্কে বিদ্যাবতীর অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল। দাদার বুদ্ধি, কর্মশক্তি, পরিশ্রম-ক্ষমতা, জেদ, অহংকারবোধ, আভিজাত্য—বিদ্যাবতীকে বরাবরই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দাদাকে তিনি ভালবাসতেন, দাদার গুণমুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাবতী জানতেন, বড়বাবুর চরিত্রে যদি দশ আনা গুণ থাকে, ছ'আনা দোষ আছে। আর এই দোষ সামান্য নয়। তাঁকে উপেক্ষা করাও যায় না। জেনেও বিদ্যাবতী সেসব উপেক্ষা করে থাকতেন।

বাবা গত হয়েছেন। বিদ্যাবতীর সন্তান হয়েছে। শ্যামাচরণের সঙ্গে বড়বাবুর এমন এক বিরোধ বেধে গেল যে, বড়বাবু শ্যামাচরণকে বিষ নজরে দেখতে লাগলেন। শ্যামাচরণও আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

যে ঘটনার জন্যে বড়বাবু ভগিনীপতিকে তাড়িয়ে দিলেন সেই ঘটনার মধ্যে এক পারিবারিক কলঙ্ক রয়েছে। বিদ্যাবতী তা জানেন। বড়বাবু বরাবরই খানিকটা বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। মাঝে মাঝে সেটা বেড়ে যেত। বাড়ির এক আশ্রিতা যুবতী দাসী, বড়বাবুর চেয়েও তার বয়েস বেশি, গোপনে খারাপ এক সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছিল বড়বাবুর সঙ্গে। দাসী হলেও তার সঙ্গে একটা দূর সম্পর্কের জন্যে পরিবারে তাকে দাসী হিসেবে ভাবা হত না। তাকে সকলেই তারাবউদি বলত। সে বিধবা ছিল।

তারাবউদির সঙ্গে বড়বাবুর গোপন সম্পর্কের পরিণাম যে-জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো, বাধ্য হয়েই বড়বাবু তাকে বিষ খাওয়ালেন। শ্যামাচরণ এই ঘটনা জেনে ফেলেন। শুধু জানা নয়, তিনি হয়ত প্রমাণ করতেন, বড়বাবু মানুষ খুনের চেষ্টা করেছিলেন।

এরপর যা হয়—বড়বাবু শ্যামাচরণকে শুধু বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত

হলেন না, দুর্নাম রটালেন আর লোক লাগিয়ে শ্যামাচরণকে একরকম বাক্হীন করে দিলেন। শ্যামাচরণের প্রাণসংশয় ছিল। তাঁকে পালিয়ে যেতে হল।

বিদ্যাবতী এই ইতিহাস জানেন।

আরও সামান্য জানেন যা কমল জানে না। কেউই জানে না, মাত্র তিন জন ছাড়া। শ্যামাচরণ, বিদ্যাবতী আর বিদ্যার নিজের বিশ্বস্ত দাসী শৈলদি। শ্যামাচরণ চলে গেছেন। শৈলদিও নেই। শুধু বিদ্যাবতী রয়েছেন। ভগবান বিদ্যাবতীকে এতকাল বাঁচিয়ে রাখলেন কেন? বিদ্যাবতী চেয়েছিলেন বলে, নাকি, অন্য কোনো কারণ আছে?

মানুষ কি জীবনভর কোনো এক আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে? তাও এমন আশা যা পূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব? বিদ্যাবতী এক অবাস্তব অসম্ভব আশা নিয়ে এতকাল বেঁচে ছিলেন। তাঁর ধারণা হয়ে এসেছিল, আর হল না, পূর্ণ হল না সেই আশা। তাঁকে এবার বিদায় নিতে হবে। যার যেমন নিয়তি।

ঘরের অন্ধকার হাল্কা হতে হতে প্রায় মিলিয়ে এসেছিল। এখন এত পাতলা মিহি কালচে রঙ রয়েছে ঘরের মধ্যে যে আসবাবপত্র সবই চোখে পড়তে শুরু করেছে। ঘরের পুবমুখো একটা জানলা খোলা থাকে। অন্য সব বন্ধ। বদ্ধ ঘরে বিদ্যাবতীর দম বন্ধ হয়ে আসে। শীত পড়লে অবশ্য জানলা আর খুলে রাখা যাবে না।

বিদ্যাবতী বুঝতে পারছিলেন, বাইরে ভোর হয়ে আসছে। পাখি ডাকতে শুরু করল।

চোখের পাতা খুলে সামান্য তাকিয়ে থাকলেন। হঠাৎ মনে পড়ল, তাঁর স্বামীর বরাবর অভ্যেস ছিল প্রত্যুষকালে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়ানো; সূর্যোদয় দেখা তাঁর নিত্যকর্ম ছিল, সূর্যপ্রণামও করতেন। কিন্তু কোনোদিন বলতে পারতেন না—কেন এটা করেন! বিদ্যা স্বামীকে এই নিয়ে ঠাট্টা করতেন। শ্যামাচরণও বলতেন, ঠাট্টা করেই, 'একে তোমাদের বাড়িতে আমায় সবাই স্ত্রৈণ ভাবে, তার ওপর যদি বেলা পর্যন্ত তোমার আঁচল ধরে শুয়ে থাকি লোকে যে তোমাকেও ছ্যাছ্যা করবে।'

বিদ্যাবতীর হাসি পাচ্ছিল। হঠাৎ এক শব্দ কানে গেল। পর পর দু বার। বিদ্যাবতী যেন চমকে গেলেন। কিসের শব্দ? গুলির শব্দ না? শব্দের পর পরই ঘুম ভাঙা কাক পাখির দল ভয়ে চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করল। কী যেন ঘটে গেল বাইরে।

বিদ্যাবতীর মনে হল, শব্দটা গুলিরই।

কী হল হঠাৎ? গুলির শব্দ হল কেন? কে গুলি করল? কেন? কাকে?

বিদ্যাবতী বিছানায় উঠে বসতে পারলেন না। নন্দাকে ডাকতে লাগলেন। নন্দা, নন্দা। বিছানার পাশে রাখা ঘণ্টিটা বাজাতে লাগলেন।

নন্দা সকালেই ওঠে। তারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

ধড়মড় করে ঘরে এল নন্দা।

"কী হয়েছে ? শব্দ কিসের ?"

"জানি না। আমিও শুনেছি। দেখছি।"

নন্দা চলে গেল।

বিদ্যাবতীর উঠে বসতে সময় লাগে। বিশেষ করে এই সকালে। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন বিছানায়। পুবের জানলার বাইরে ফরসা দেখাচ্ছিল। ভোর হয়ে এসেছে।

জানলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেন বিদ্যাবতী। উদ্বেগ বোধ করছিলেন। বাড়ির এলাকার মধ্যে গুলির শব্দ কেন ? কে গুলি করল ? কাকে ? কেন ?...এ বাড়িতে বন্দুক ছোঁড়ার মতন লোক এক প্রসন্ন। সে কেন গুলি ছুঁড়বে ? কাকেই বা ?

বাইরে অনেকের গলা শোনা যাচ্ছে যেন ! এত তফাতে যে বোঝা যায় না কে কী বলছে। নিচের তলার দাসদাসীবা কি সবাই বাগানের দিকে ছুটে গিয়েছে ?

বিদ্যাবতীর সহসা মনে হল, কমলের কিছু হল না তো ? প্রসন্ন কি... ?

নন্দাকেই আবার ডাকলেন বিদ্যাবতী। যেন বড় বেশি বিচলিত। খেয়াল ছিল না, নন্দা এখন নেই, সেও খবর আনতে নিচে চলে গিয়েছে।

বিদ্যাবতী অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নন্দা ফিরে এল। উত্তেজিত। হাঁপাচ্ছে। বাইরে রোদ উঠছে তখন।

নন্দা বলল, "গুলি ছুঁড়েছিল কেউ ?" নন্দার গলার স্বর যেন বসে গিয়েছে।

"কে ?"

"বোঝা যায়নি।"

"কোথায় হয়েছে ?"

"বাগানে।"

"বাগানের কোন দিকে ?"

নন্দা হাত দিয়ে ইশারা করল। "ওই দিকে—আউট হাউসের দিকে।"

"কে ছিল ওখানে ?"

"শেফালিদি বেড়াতে বেরিয়েছিল ?"

"তার কিছু হয়েছে ?"

"না।"

"আর কে ছিল সেখানে ?"

"শেফালিদিকে ডেকে দেব ?"

"দাও।"

নন্দা চলে গেল।

বিদ্যাবতী কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। এ-বাড়িতে গুলি চালাতে জানার লোক একমাত্র প্রসন্ন। সকালে শেফালি যে বাগানে বেড়িয়ে বেড়ায়, বাড়ির সকলেই তা জানে। প্রসন্ন কেন গুলি চালাতে যাবে ? বিদ্যাবতীর মনে পড়ল না, এর আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেছে। একবার একটা খেপা শেয়াল মারতে, আর একবার এ-বাড়িতে ডাকাত পড়ার অবস্থা হয়েছিল যখন—তখনই শুধু প্রসন্ন বন্দুক ধরেছিল।

বিদ্যাবতী শেফালির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শেফালির আসতে সময় লাগল খানিকক্ষণ।

শেফালি এল। পরনে রাত্রের বাসী কাপড় জামা। চুল ডস্‌কোখুস্‌কো। ওকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

বিদ্যাবতী বললেন, "কী হয়েছে ?"

শেফালি বলল, "আউট হাউসের দিকে আমি বেড়াচ্ছিলাম। রোজই বেড়াই। কোনো দিকে নজরও করিনি। হরতুকি গাছের তলা দিয়ে আসছি তখন হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম। শুনেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি, এমন সময় আর একবার শব্দ হল। তখন মনে হল কেউ বন্দুক ছুঁড়ছে।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর আর শব্দ হল না। ফাঁকায় আসতে দেখি, অর্জুন, গদাই মালীরা ছুটে আসছে…।"

"তুমি কাউকে দেখনি ?" বিদ্যাবতী বললেন।

"না," শেফালি মাথা নাড়ল। "রোজই বেড়াই সকালে ; কোনোদিন কিছু হয় না। আমি নিজের মনে বেড়াচ্ছিলাম…"

"তা বেড়াও। তবু কাছাকাছি জিনিসে…"

বাধা দিয়ে শেফালি বলল, "আমি হরতুকি গাছের কাছে ছিলাম যখন তখনই শব্দ শুনেছি। ওদিকটায় কুলঝোপ আতাঝোপ কলকে ফুলের গাছ। ঝোপঝাড়ে ভরতি। কাছাকাছি কিছু নজরে পড়েনি।"

বিদ্যাবতী শেফালিকে দেখতে দেখতে বললেন, "কোনদিক দিয়ে শব্দটা এল ?"

"বুঝতে পারিনি। হঠাৎ শব্দ...বোঝা যায় না। আমি বুঝতে পারিনি।"

"বাড়ির দিক থেকে?"

"অত দূর থেকে নয়। আরও কাছ থেকে।"

"তুমি কাউকে দেখতে পেলে না?"

"না।"

"পালিয়ে যাবার শব্দও শোনোনি?"

"খেয়াল করিনি।...ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভয়ে তখন..."

"গুলি কোনদিকে ছুঁড়েছিল? তুমি তো আড়ালে ছিলে। তা হলে...?"

শেফালি মাথা নাড়ল। "আমি জানি না। তবে আউট হাউসের দিকেই হবে।"

"গুলির পর সবাই ছুটে গেল?"

"সবাই জড় হয়ে পড়ল।"

"প্রসন্ন জানে?"

"উনিও গিয়েছিলেন। পার্বতী, ময়না...সকলেই।"

"আর ওরা? যারা এখানে এসে রয়েছে?"

"প্রথমে কেউ যায়নি। পরে কলকাতার ভদ্রলোক এলেন।"

"বাকি দুজন?"

"শেষে এলেন।"

বিদ্যাবতী যেন কী ভাবলেন। বললেন, "কারও কিছু হয়নি তো?"

"না। শুনিনি।"

"প্রসন্নকে খবর দাও, আমি চান করিনি, তার সঙ্গে কথা রয়েছে। নন্দাকে ডেকে দাও।"

শেফালি চলে যাচ্ছিল। বিদ্যাবতী তাকে লক্ষ করলেন।

অন্যদিনের তুলনায় খানিকটা আগেই বিদ্যাবতী বারান্দায় নিজের জায়গাটিতে বসলেন।

প্রসন্ননাথের কাছে খবর গিয়েছিল। সামান্য পরে প্রসন্ন এলেন।

"মা?" প্রসন্ননাথ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"প্রসন্ন—!" বিদ্যাবতী তাকালেন। দু মুহূর্ত পরে বললেন, "এ সমস্ত কী হচ্ছে প্রসন্ন! আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

প্রসন্ননাথ সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিলেন না। পরে বললেন, "মা, আমার মনে হয়, আপনার অতিথিদের মধ্যে কেউ পিস্তল রিভলবার গোছের কিছু

এনেছে।"

বিদ্যাবতী অবাক হয়ে বললেন, "সে কী!"

"আমি আপনাকে বলতে পারছি না, কে এনেছে। একজনই এনেছে, না, দুজন। নাকি ওরা তিন জনই।"

বিদ্যাবতী কথা বললেন না। ভাবছিলেন। পরে বললেন, "আনেও যদি, তবু আমি বুঝতে পারছি না, অত ভোরে বাগানে পিস্তল ছোঁড়ার কী হল ?"

"আমিও পারছি না। ভাবছি।...আপনি আর এ নিয়ে ভাববেন না, আমি খোঁজ করছি। আজকালের মধ্যেই জানতে পারব।"

বিদ্যাবতী বললেন, "তুমি কিছু আন্দাজ করতে পার ?"

"না। শুধু এইটুকু আন্দাজ করতে পারি, ভোরবেলায় বাগানে শেফালি ছাড়াও আরও দুজন ছিল। একসঙ্গে নিশ্চয় ছিল না। একজন অন্যজনকে আড়াল থেকে গুলি চালিয়েছে।"

"কেন ?"

প্রসন্ন অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "মা, আমার কথায় অপরাধ নেবেন না। এখন যা অবস্থা দাঁড়াল তাতে মনে হচ্ছে, সম্পত্তি লাভের লোভে ওয়ারিশানদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু হল। কে সত্যিকারের ওয়াররিশান, কে নকল—তা আমি জানি না। নরেশ বা রথীন—কেউই তাদের দাবির ষোলোআনা প্রমাণ দিতে পারেনি। তবু এরা দাবি করছে, একজন বড়বাবুর নাতি, একজন ছোটবাবুর ছেলে। এদের কথা যদি সত্যি হয়—একজন আপনারও সম্পর্কে নাতি, অন্যজন ভাইপো। কমলবাবুর কথা আমি জানি না, মা। আপনি জানেন। তাঁর দাবিও যদি সত্যি হয়..."

বিদ্যাবতী হাত তুলে প্রসন্ননাথকে চুপ করতে বললেন।

প্রসন্ননাথ নীরব থাকলেন।

অনেকক্ষণ পরে বিদ্যাবতী প্রসন্ননাথের দিকে ইশারা করে একেবারে মুখের সামনে আসতে বললেন।

প্রসন্ননাথ প্রায় মুখের কাছে এলেন বিদ্যাবতীর।

বিদ্যাবতী বললেন, "প্রসন্ন, শেফালি সত্যি কথা বলছে না। নজর রাখবে।"

আকাশের দিকে মুখ করেই রথীন আসছিল। তার কোনো হুঁশ ছিল না। অজস্র তারার কোনোটাই সে খেয়াল করে দেখছে না, কিছু নেই দেখার। তারা খসে পড়ল, তাও নজর করল না রথীন।

হঠাৎ তার গায়ে কী যেন এসে পড়ল। পাথরের নুড়ি, না, ঢিল ?

রথীন দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল।

বাগানে ঝাউয়ের ঝোপ থেকে কে যেন বলল, "এ পাশে!"

পার্বতীর গলা।

রথীন আশেপাশে তাকিয়ে দেখে নিল একবার তারপর ঝাউঝোপের দিকে এগিয়ে এল। কাছেই জোড়া দেবদারু। ডালপালার তলায় পার্বতী দাঁড়িয়ে ছিল।

জায়গাটা অন্ধকার।

পার্বতী বলল, "ওদিকে চলো।"

আড়ালে এসে রথীন পার্বতীকে দেখল। এমন এক শাড়ি পরেছে পার্বতী যে অন্ধকারে তাকে ঠাওর করা যায় না। মাথায় কাপড়।

রথীন বলল, "তোর জন্যে আমি ওই বাড়িটার কাছে ঘোরাঘুরি করলাম। ভাবলাম, যদি তুই যাস— !"

পার্বতী মাথার কাপড় সরাল। বলল, "মাধবকুঞ্জে আমি যাইনি। রোজ রোজ গেলে ধরা পড়ে যাব।"

"জায়গা বদলে বদলে আর ক'দিন দেখা করবি?"

পার্বতী সে-কথার কোনো জবাব দিল না। বলল, "খোকনদা, এই বাড়িতে এখন কত জোড়া কুকুরের চোখ কে জানে! সবাই দেখছে। কে কাকে দেখছে, কী দেখছে কে জানে! আজ সকালের পর থেকে সব থমথম করছে।"

রথীন বলল, "যখন গুলির শব্দ হল. তখন তুই কী করছিলি?"

"সবে ঘুম ভেঙেছে। বিছানা তুলছিলাম।"

"ম্যানেজারবাবু?"

"উনি অনেক ভোরে ওঠেন। উঠে ছাদে পায়চারি করেন। সূর্য ওঠা পর্যন্ত ছাদেই থাকেন।"

"তোরা তা হলে কিছু দেখিসনি?" রথীন মুখ দেখার চেষ্টা করছিল পার্বতীর।

"না।"

রথীন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। "কে কাকে গুলি করতে গিয়েছিল আন্দাজ করতে পারিস?"

"না।"

"কেউ কিছু বলছে না?" রথীন অন্ধকারে পার্বতীর চোখ দেখার চেষ্টা করছিল।

"বলছে, তোমাদের তিন জনের মধ্যে কেউ গুলি চালিয়েছে।"

রথীন কেমন ভীত হয়ে পড়ল। বিচলিত। বলল, "নরেশ।"

"নরেশ কেন?"

"ওকে আমি দেখেছি।"

পার্বতী কী মনে করে হঠাৎ হাত ধরল রথীনের। ধরে আরও অন্ধকারে আড়ালে সরে গেল। "তুমি সকালে গুলি হবার আগেই বাগানে গিয়েছিলে?"

রথীন থতমত খেয়ে বলল, "গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"এমনি। রাত্তিরে একেবারে ঘুম হয়নি। মাথা গরম হয়ে কেমন করছিল। মনে হচ্ছিল, ঘাড় মাথা বলে আমার কিছু নেই। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। ভাবলাম, সকালের হাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে আরাম লাগবে।"

"বাগানের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ। গুলি হবার পর ঘাবড়ে গিয়ে সরে পড়েছিলাম। পরে আবার···।

পার্বতী একটু চুপচাপ থাকল। পরে বলল, "নরেশ বাগানে কী করছিল?"

"আমি দেখিনি।···তোদের ওই শেফালিদির সঙ্গে ও কথাবার্তা বলছিল বোধ হয়। কথাবার্তা বলে ফেরার সময় কাউকে দেখতে পায়। আর তখনই···"

পার্বতী সন্দেহের গলায় বলল, "কাকে দেখে? কমলকুমার বলে লোকটাকে?"

"আমি জানি না।···তবে কাল ওই মাতাল পাজি লোকটা কমলবাবুকে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিচ্ছিল।"

"তোমার কাছে?"

"হ্যাঁ। বেটা মাতাল কাল সন্ধের পর আবার আমায় ধরেছিল। বলছিল, বুড়ি কী ভেবেছে? আমাদের বেলায় তার আধ ঘণ্টা কথা বলতে সময় হয় না—আর ওই ল্যাংড়া শালা, আর্টিস্ট, তার সঙ্গে সকাল সন্ধে কথা বলার কী আছে! ল্যাংড়া বেটা বুড়িকে বাগাচ্ছে নিশ্চয়···। না হলে বুড়ি ওর সঙ্গে মতলব ভাঁজছে।"

পার্বতী আবার হাত ধরল রথীনের। বলল, "কমলের ওপর ওর খুব রাগ দেখলে?"

রথীন বুঝতে পারছিল তার হাত ঠাণ্ডা। সামান্য ঘাম জমেছে। পার্বতীর হাত ঠাণ্ডা নয়, মোটামুটি গরম। তাপের সঙ্গে মায়াও যেন জড়ানো। রথীনের কেন কে জানে অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল।

"বলছ না?" পার্বতী বলল।

নিজেকে সামলে নিল রথীন। বলল, "রাগ মানে! কাল থেকে সাংঘাতিক রাগ। পেলে ছিঁড়ে খায়—। কী অসভ্য কথাবার্তা বলছিল তুই ধারণা করতেও

পারবি না।"

পার্বতী একটু চুপ করে থাকল। পরে বলল, "শেফালিদির সঙ্গে কাকে কথা বলতে দেখেছ তুমি? নরেশ, না, কমলকে?"

রথীন মাথা নাড়ল। "কথা বলতে দেখিনি। আমার মনে হল, নরেশই শেফালির সঙ্গে কথা বলে ফিরছিল। ফেরার সময় কাউকে দেখতে পায়..."

"কমলকে তুমি দেখোনি?"

"না। তখন দেখিনি।...পরে তো সকলকেই দেখলাম।"

"এমন তো হতে পারে—কমলই আগে শেফালিদির সঙ্গে কথা বলে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।"

রথীন কী বলবে বুঝতে পারছিল না। "আমি জানি না।"

পার্বতী কেমন অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "কমল লোকটা কে—তুমি জান?"

"না।"

"বুড়ি ওর সঙ্গে এতবার দেখা করছে কেন? সকালে করল, আবার সন্ধেবেলায়! সন্ধেবেলায় বুড়ি তার বসবার ঘরে কমলের সঙ্গে কথা বলেছে, তা জানো। এভাবে বুড়ি কথা বলে না কারও সঙ্গে। সবাই অবাক। কে জানে বুড়ির মনে কী আছে?" পার্বতী হাত ছেড়ে দিল রথীনের। হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল তার। বলল, "বুড়ি যখন ওই লোকটার সঙ্গে কথা বলে কাছে কেউ থাকে না, জান তুমি? আমার ধম্ম-বাবা, বুড়ির ডান-হাতকেও সামনে থেকে সরিয়ে দেয়। সবাই দেখেছে। আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সময়..."

রথীন কথা শেষ করতে দিল না পার্বতীকে। বলল, "জানি। নরেশ বলছিল। সে কেমন করে এ বাড়ির সমস্ত খবর রাখে কে জানে!"

পার্বতী বিরক্ত হয়ে বলল, "কেন রাখবে না। তোমার মতন বোকা ওরা নয়। সবাই যে যার স্বার্থ নিয়ে এসেছে। কাজ বাগাতে হলে চালাক-চতুর ফন্দিবাজ হতে হয়। তোমার মতন মিউ মিউ করলে কিচ্ছু হয় না।"

রথীন কথা বলল না।

পার্বতী নিজেই বলল, "ওরা কেউ তোমার মতন হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তুমি তো সব ছেড়েই দিয়েছ!"

রথীন নিজের মনেই যেন বলল, "আমি চলে যাব। এখানে আসা আমার ভুল হয়েছে। এখানে থাকলে এরা কেউ না কেউ আমায় মেরে ফেলবে। সম্পত্তিতে আমার দরকার নেই। নিজের প্রাণ আগে...।"

পার্বতীর মাথা গরম হয়ে গেল। প্রাণ আগে? প্রাণ আগে তো এসেছিলে কেন? প্রাণের মায়া নিয়ে চা বাগানে বসে থাকলেই পারতে! পার্বতী রুক্ষভাবে

বলল, "প্রাণ শুধু তোমারই ? আর আমার প্রাণ নেই। কেন আমায় তবে এখানে এতদিন বসিয়ে রাখলে ? কেন আমি ঝি-বাঁদি হয়ে পড়ে থাকলাম এখানে ? কার জন্যে ? তুমি ভাবছ, এখানে এসে আমি খেতে-শুতে পেয়ে বর্তে গিয়েছি। ভাবছ, এখানে আমার পেছনে খেপা কুকুরের মতন মদ্দগুলো লাগেনি—তাতেই আমার গা-গতর বেঁচে গিয়েছে !...তুমি ভুল ভেবেছ ! ঝি হয়ে জীবন কাটাব বলে আমি এখানে আসিনি।"

রথীন বিরক্ত হল। বলল, "তুই পাগলের মতন কথা বলছিস।...আমি মরে গেলে তোকে কে রানী করবে ?"

"মরার আগেই তুমি মরে গিয়েছ !"

"তুই জানিস না। এখানে থাকলে আমি মরবো।"

"না, তুমি মরবে না। মরতে হয় ওরা মরুক। তুমি চোর-জোচ্চর নও। ঠগ নও। নিজের হকের পাওনা আদায় করতে এসেছ, মরবে কেন ?" পার্বতী দু হাত দিয়ে রথীনের বুকের কাছে জামা চেপে ধরল। "তোমার বাবাকে এরা ঠকিয়েছে। তোমাকেও ঠকাবে ?"

রথীন চুপ করে থাকল। পার্বতী তার গায়ের পাশে একেবারে ঘন হয়ে এসেছে। রাগে উত্তজনায় হাত কাঁপছে পার্বতীর। রথীনকে প্রায় আঁকড়ে ধরল।

কথা বলতে পারছিল না রথীন। তার বাবাকে এরা ঠকিয়েছে কিনা সে জানে না। যেটুকু জানে তাতে বুঝতে পারে, বাবা কোনো কারণে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। হয়ত ঘৃণায়। কিন্তু কেন ? কী করেছিল এরা ? অকারণে বাবা কেন নিজের দাদা-দিদিকে ঘেন্না করতে যাবে ? কেন অসহ্য মনে হবে নিজের বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন ?

মায়ের কাছে বাবা সে সব কথা বলেছিল কিনা কে জনে ! মা অন্তত লিখে রেখে যায়নি। বরং মা লিখেছে, বাবার নিষেধ ছিল—কোনো দিন কোনো কারণেই যেন মা এ-বাড়িতে না আসে।

রথীন বাবার কথা ভাবতে ভাবতে পার্বতীর কাঁধে হাত রাখল। বলল, "বাবাকে এরা ঠকিয়েছে কিনা জানি না। বাবা এদের পছন্দ করেনি, থাকতে চায়নি নিজের লোকের সঙ্গে। কিন্তু বাবা আমার মাকেও কি বিয়ে করেছিল ? যদি করত ও-ভাবে আত্মহত্যা করবে কেন ?"

পার্বতী এত ঘন করে রথীনকে জড়িয়ে ধরেছিল যে, হঠাৎ তার হাতে শক্ত মতন কিসের ছোঁয়া লেগে গেল।

"এটা কী, তোমার পকেটে ?"

রথীন চমকে গেল। সরিয়ে দিল পার্বতীকে।

“কী ওটা ?”

“কিছু না।”

“খোকনদা— ?”

লুকোবার উপায় ছিল না রথীনের। প্যান্টের পকেটে হাত রেখে রথীন ভয়ের গলায় বলল, “পিস্তল !”

পার্বতী যেন পাথর হয়ে গেল। মুখে কথা নেই। অবিশ্বাসের চোখে দেখছিল রথীনকে। অন্ধকারে মুখের আদল ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না রথীনের।

শেষে পার্বতী বলল, “পিস্তল ! কার পিস্তল ?”

“আমার।”

“তুমি—তুমি পিস্তল এনেছিলে ?”

“শিলিগুড়িতে কিনেছিলাম,” রথীন নিচু গলায় বলল।”

“আমায় বলোনি ?”

“না।”

পার্বতী ভয়ে-আতঙ্কে জিবের শব্দ করল। “তুমি পিস্তল সঙ্গে নিয়ে ঘুরছো ?”

“আজই ঘুরছি।”

“কেন ?”

রথীন জবাব দিল না।

পার্বতী চুপ করে থাকল সামান্য। তারপর বলল, “আমায় দাও।...তোমাদের ঘর-দোর, তোমাদের ওপর ভীষণ নজর রাখছে এখন। পিস্তল পকেটে করে ঘরে যাবে না। আমায় দাও।”

রথীন পকেট থেকে পিস্তল বার করে পার্বতীর হাতে দিল। বলল, “সাবধান।”

পার্বতী শাড়ির আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল পিস্তল। বলল, “সকালে তুমি পিস্তল ছুঁড়েছিলে ?”

“না।”

“সত্যি কথা বলছ ?”

“আমি ছুঁড়িনি। আমি ভাল করে পিস্তল ছুঁড়তে পারি না।”

“তুমি পিস্তল নিয়ে কেন ঘুরছ ?”

“আমার ভীষণ ভয় করছে। এত ভয় আগে করেনি।” গলা যেন বুজে গেল রথীনের।

“তুমি কি নিজে আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিলে ?”

রথীনের যে কী হল দু'হাতে নিজের মাথার চুল মুঠো করে চেপে ধরল। ছটফট করতে লাগল।

পার্বতীর কান ছিল। তফাতে কিসের শব্দ শুনতে পেল। আর দাঁড়াল না। ফিস ফিস করে বলল, "ঘরে যাও। সাবধানে।"

পার্বতী ছায়ার মতন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। যাবার সময় মাথার কাপড় তুলে দিল।

রথীন দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর পা বাড়াল।

নিজের ঘরে পা দিয়েই রথীন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল।

ঘরে আলো নেই। পতিত আলো আনতে গিয়েছে।

অন্য দিন ঘরে ঢোকার পর গা ছমছম করে না। আজ রথীনের কেমন ভয় করতে লাগল। ব্যালকনির দিকে দরজা খোলা। বাতাস আসছিল। রথীন মনে করতে পারল না, যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কিনা!

রথীন দু পা এগিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। দমকা বাতাস আসছে। সামান্য গা শিউরে উঠল রথীনের। তার ঘরের খানিকটা তফাতে এক বকুল গাছ। বাতাসের দমকায় কাঁপা ডাল-পাতার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পতিত আলো এনে ঘরে রাখল।

পতিত আলো রেখে চলে যাবার পর রথীন যেন কার গলা শুনল। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, নরেশ। ভয় পেয়ে গেল রথীন। অন্যমনস্কভাবেই পকেটে হাত দিল। পিস্তলটা নেই। পার্বতী নিয়ে নিয়েছে। রথীনের ভীষণ অসহায় লাগছিল।

নরেশ পা দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। অনেকটা লাথি মারার ভঙ্গিতে।

রথীন এগিয়ে এল।

নরেশ বলল, "আমার ঘরে কোন শালা ঢুকেছিল ? শুয়োরের বাচ্চাটা কে ?"

কিছু বুঝতে পারল না রথীন। এই নোংরা লোকটাকে দেখলে তার মনে হয়, গায়ে ক্ষমতা থাকলে নরেশকে সে সত্যিই খুন করত।

রথীন বলল, "কী বলছেন ?"

"বলছি, আমার ঘরে কোন শালা ঢুকেছিল ?"

নেশা করা মানুষের কথাবার্তার কোনো মাথামুণ্ডু থাকে না। রথীন বলল, "কে ঢুকবে! কেউ ঢোকেনি।"

নরেশ মেঝেতে পা ঠুকল। হাত ছুঁড়লো। যেন থিয়েটারের পার্ট করছে। "আমি বলছি, ঢুকেছিল। আমার ঘর সার্চ করা হয়েছে।"

রথীন থতমত খেয়ে গেল। ঘর সার্চ করা হয়েছে। কী বলছে, নরেশ? নেশার চোটে চোখে ভুল দেখছে নাকি?

রথীন বলল, "আপনার ঘর তালাবন্ধ ছিল না?"

"তালা!...তালা তো এদের। এদের তালা, এদের চাবি।"

"চাবি আপনার কাছে ছিল?"

"সো হোয়াট্? ইউ আর টকিং লাইক এ ফুল। এদের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। না থাকলেও,একটা ফালতু তালা খুলতে কী লাগে! ছোট স্ক্রু ড্রাইভার, একটা নরুন, শক্ত তার—আবার কী!"

রথীন বলল, "কে বলল, আপনার ঘরের তালা খোলা হয়েছিল?"

নরেশ যেন খেপে গেল। চেঁচিয়ে বলল, "আমি বলছি। আমার চোখে ধুলো দেবে এমন বাপের বেটা জন্মায়নি।...আমার ঘরের তালা খুলে কোনো শুয়ারের বাচ্চা আমার বিছানা, জিনিসপত্র, জামা-প্যাণ্ট হাতড়েছে।"

রথীন হকচকিয়ে গেল। "আপনি ঠিক বলছেন?"

"হাজার বার ঠিক বলছি।...আমি শালা বুদ্ধু নই। আমার বরাবর সন্দেহ হয়েছে, এই বাড়ির হারামিরা লুকিয়ে আমার ঘর-দোর দেখতে পারে। ওরা আজ দেখেছে।" নরেশ ঘরের মধ্যে দু'বার পায়চারি করে নিল। "ওরা যায় ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়। আমাকে ওরা বোকা বানাবে! অত সস্তা নয়। আমি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম যে আমার ঘরে বিছানা, সুটকেশ, জামা-প্যাণ্ট হাতড়ালেই আমি জানতে পারব।"

রথীন বলল, "কী ব্যবস্থা?"

নরেশ এমনভাবে তাকাল যেন ভাবল, কথাটা রথীনকে বলবে কি বলবে না। তারপর বলল, "বিছানার তলায় একটা পোস্টকার্ড রেখে দিতাম। ঠিকানার দিকটা থাকত নিচে। সেটা কেউ সোজা করে রেখেছে। ঠিকানার দিকটা সামনে রয়েছে।"

রথীন বলল, "আপনার ভুলও হতে পারে।"

"না," নরেশ জোরে জোরে মাথা নাড়ল। "আমি ঘর ছেড়ে বেরুবার সময় দেখে নিতাম সব। আজও দেখেছি। আমার বিছানা কেউ হাতড়েছে। দুটো জামা যেভাবে পাশাপাশি রেখেছিলাম, সেভাবে নেই। ডানেরটা বাঁয়ে, বাঁয়েরটা ডান দিকে হয়ে গিয়েছে। টেবিলের ওপর ডট্ পেন্‌টা রেখেছিলাম আড়াআড়ি। সেটা সোজাসুজি পড়ে আছে।"

রথীন বুঝতে পারল, নরেশ অত্যন্ত চতুর। সাবধানী। সন্দিগ্ধ। তার কাজকর্ম যেন গোয়েন্দাদের মতন।

"এই ঘরের জিনিসপত্র ঠিক ছিল ?" নরেশ বলল।

হঠাৎ কেমন চমকে গেল রথীন। এই ঘরের মধ্যেও কি কেউ ঢুকেছিল ? কে জানে ! হতে পারে কেউ এসেছিল। তার বিছানাপত্র, জামা কাপড় তল্লাশি করে গেছে লুকিয়ে। হ্যাঁ, হতেই পারে। পার্বতী বলছিল, তাদের প্রত্যেকের ওপর এখন রত্ননিবাসের কড়া নজর। আজ সকালের ঘটনার পর সেটা স্বাভাবিক।

রথীন সন্ত্রস্ত। গলা শুকিয়ে কাঠ। গায়ে কাঁটা দিয়েছে। ভগবান তাকে বাঁচিয়েছেন। তার পিস্তলটা এখন আর নেই। পার্বতী নিয়ে নিয়েছে। খুবই বরাত জোর বলতে হবে। অন্য দিন হলে রথীন ঘরেই তার পিস্তলটা রেখে যেত। আজ যায়নি। আজ তার ভীষণ ভয় করছিল। পিস্তলটা সে কাছছাড়া করেনি। ঘরে পিস্তল রেখে গেলে সে বিপদে পড়ে যেত। সকালে গুলির পর তার ঘরে পিস্তল পেলে…

নরেশ যেন কী বলল।

তাকাল রথীন। ভেতরে সে ঘামতে শুরু করেছে।

নরেশ বলল, "এই ঘরের কিছু ওলোট-পালট হয়নি ?"

রথীন ঘরের চারদিক তাকাল। "আমি জানি না।…বুঝতে পারছি না।"

"ইউ মাস্ট নো !" বলে নরেশ নিজেই ঘরে চারদিক দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে বলল, "শালা ল্যাংড়াটা কোথায় গেল ? ঘর বন্ধ !"

রথীন কিছু বলল না।

নরেশ ব্যালকনির দিকে চলে গেল। লোকটা মদ খেলেও হুঁশে রয়েছে। মাতালের চোখ-নাক যেন কুকুরের মতন আনাচ-কানাচের সব দেখছে, গন্ধ নিচ্ছে।

ব্যালকনির সামনে দাঁড়িয়ে নরেশ বলল, "সকালে কে গুলি চালিয়েছিল ?"

রথীন কাঠের মতন শক্ত। জবাব দিল না।

"ল্যাংড়া ?"

"আমি জানি না।"

"গুলির জবাব আমি জানি। গুলি ফসকায়। আমার জবাব ফসকাবে না। আজ হোক, কাল হোক—এর জবাব আমি দেব। শালাকে খুন করব। সে যেই হোক।"

রথীন বলল, "সকালে কেউ খুন হয়নি।" সে যেন বোঝাতে চাইছিল, সকালে যখন কেউ খুন হয়নি তখন অকারণে খুন-খারাপির দরকার কিসের ?"

নরেশ ব্যালকনি থেকে চলে এল। বলল, "এখনও হয়নি। এবার হবে। আমি জানি না কে খুন হবে ! বুড়িও হতে পারে।"

রথীনের বুকে যেন ধাক্কা লাগল হঠাৎ।

নরেশ সামান্য এলোমেলো পায়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কাচ ভেঙে পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নরেশের।

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নরেশ যেন পাক খেয়ে বিছানার অন্য প্রান্তে গড়িয়ে গেল। তারপর খাট থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়ল।

ঘর অন্ধকার! কালোয় কালো। একটি মাত্র জানলা খোলা রেখেছিল নরেশ। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা মাঝরাতের শীত মেশানো বাতাস আসছে। আর বাইরের অন্ধকার। তারার আলোও ঘরে আসছে না।

নরেশ দেওয়াল ঘেঁষে, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার চোখ দরজার দিকে। এখান থেকে বোঝার উপায় নেই দরজার পাল্লা কতটুকু ফাঁক হয়ে আছে। হয়ত খুবই সামান্য, কয়েক আঙুল মাত্র। কিন্তু কেউ না কেউ তার ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকার চেষ্টা যে করছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

নরেশ ঠিক এই রকমই সন্দেহ করেছিল। সে প্রায় বুঝেই ফেলেছিল, কেউ না কেউ মাঝরাতের দিকে তার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করবে। হয় আজ, না হয় কাল। কিংবা পরশু।

এতটা রাত্রে, এখন মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে কিনা, কে জানে, যে-মানুষটি নরেশের ঘরের দরজা বাইরে থেকে খুলে ভেতরে ঢোকার জন্যে এসেছে—তার নিশ্চয় জানা ছিল না, নরেশ অনেক বেশি চালাক। বুদ্ধিমান। সতর্ক।

শোবার সময় নরেশ তার ঘরের দরজা বন্ধ করার পরও নিশ্চিন্ত হয়নি। বাইরে থেকে নিঃসাড়ে দরজা খোলা কঠিন কাজ নয়। রত্ননিবাসে এরকম কেউ নেই তাই বা কে বলবে। হয়ত এ-ধরনের কাজে পাকাপোক্ত লোকও এখানে মাইনে দিয়ে রাখা হয়। না রাখলে মানুষ খুন হয় কেমন করে?

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার পর নরেশ ঘরে চেয়ারটা টেনে এনে একেবারে দরজার গা ছুঁইয়ে রেখে দিয়েছিল। রেখে চেয়ারের ওপর এই ঘরেরই বড় টেবিলবাতিটা এমনভাবে রেখেছিল যাতে বাইরে থেকে দরজা খুলে পাল্লা সরালেই চেয়ারের ওপর রাখা টেবিলবাতিটা পড়ে যাবে। পড়ে গেলেই তার কাচের বড় চিমনিটা ভেঙে যাবে শব্দ করে। বাতি রেখে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল নরেশ।

যেমন ভাবা গিয়েছিল, হয়েছে ঠিক তাই। টেবিলবাতিটা উল্টে মাটিতে পড়েছে। কাচ ভেঙেছে। ওল্টানো টেবিলবাতির কেরোসিন তেল ছড়িয়ে গিয়েছে ঘরে। তেলের বিশ্রী গন্ধ উঠছে।

নরেশ এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকল যেন ছায়া হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে আছে। একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে। যদি কোনো শব্দ হয়। যদি আর কোনো ছায়া দেখা যায়!

প্রতিটি মুহূর্ত যেন দীর্ঘস্থায়ী। আতঙ্কে আরও দীর্ঘতর। সমস্ত কিছু থমথম করছে। কেরোসিন তেলের গন্ধে ঘর ভারী হয়ে উঠছিল।

নরেশের মনে হল, দরজার বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে—সে নিজেও সতর্ক হয়ে গিয়েছে। তার নিশ্চয় ধারণা ছিল না, নরেশ এত বেশি চালাক এবং সাবধানী। কাচ ভাঙার, বাতি পড়ে যাবার শব্দ সেও শুনতে পেয়েছে। পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর তার সাহস হচ্ছে না। বুঝতে পারছে, এরপর দরজা ঠেললেই চেয়ারটাও উল্টে পড়বে। হয় নরেশ এতক্ষণে জেগে গিয়েছে, কিংবা জেগে যাবে!

ভেতরে ভেতরে নরেশের যেন সামান্য মজাও লাগল। কেউ যদি ভেবে থাকে—মদো মাতাল নরেশ বিছানায় শুলেই মরে যায়, তার কোনো সাড় থাকে না, অক্লেশে ঘরে ঢুকে নরেশের বুকে ছুরি ছোরা বসিয়ে দেওয়া যাবে, বা মুখের ওপর বালিশ চেপে দমবন্ধ করে মেরে ফেলা যায়—তবে সে বিরাট ভুল করেছে। নরেশ ঠিক কতখানি মাতাল, মদ তাকে সত্যিই বেহেড করে দেয় কিনা সেটা বোধ হয় ওরা জানে না। ওরা নরেশ সম্পর্কে খুবই কম জানে, খুবই কম।

বাইরে থেকে আবার একটু দরজার পাল্লা সরাবার চেষ্টা হল। শব্দ হল চেয়ারের। ঘষড়ানোর শব্দ। তারপর চেয়ারটাও উল্টে পড়ল শব্দ করে।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লোকটা থেমে গেল। যদি বা তার মনে হয়েছিল, ঘরে ঢোকার চেষ্টা একবার করা যেতে পারে, চেয়ার উল্টে পড়ার পর তার আর সাহস হল না।

নরেশ একই ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর নরেশ বুঝল, লোকটা আর দাঁড়িয়ে নেই। পালিয়ে গিয়েছে।

তবু এই প্রথম নরেশ কাশির শব্দ করল। ঘুমের মধ্যে কাশির শব্দ বা নরেশ জেগে উঠেছে—যা হোক কিছু একটা বুঝে নিক লোকটা।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অপেক্ষা করল নরেশ। কান পেতে থাকল। মনে হল না, কেউ আর দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

নরেশকে এবার খানিকটা ঝুঁকি নিতেই হয়। বৃথা দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

নিচু হয়ে নরেশ বিছানার দিকে ঝুঁকে পড়ল। বালিশের তলায় তার টর্চ।

পেনসিল টর্চ। টর্চটা উঠিয়ে নিল। জ্বালল না। সাবধানে বিছানার মাথার দিক ঘুরে ওপাশে গেল। চটিটা ওপাশে খাটের তলায়। চটি পায়ে দিল। দিয়ে বিছানার মাথার দিক থেকে তার টিটিয়া চাক্‌কু তুলে নিল। অস্ত্রটা নিতান্তই একটা ছুরি যেন। কিন্তু মামুলি ছুরি নয়। সরু পাতলা গাছের পাতার মতন দেখতে। করবী পাতার মতন অনেকটা। ইঞ্চি দশেক লম্বা। শক্ত, ভীষণ শক্ত। নোয়ানো বাঁকানো যায় না। দু মুখে খুরের চেয়েও বেশি ধার। চামড়ার খাপে ফিনফিনে ছুরিটা ঢোকানো ছিল।

নরেশ আর একবার কাশির শব্দ করল। এবার সামান্য জোরে।

পেনসিল টর্চ জ্বেলে দু পা এগুতেই নরেশ দেখল, সে যেমনটি ভেবেছিল—অবিকল তাই। রত্ননিবাসের টেবিলবাতি মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চিমনির কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কেরোসিন তেল গড়াচ্ছে মেঝেতে। চেয়ারটা একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে।

দরজার পাল্লা আধ বিঘত মতন ফাঁক।

নরেশ সাবধানে দরজার পাল্লা ফাঁক করে বাইরে এল। টর্চের আলো ফেলল। কোথাও কেউ নেই। স্তব্ধ সব। কেউ যে এসেছিল, চলে গিয়েছে—তার কোনো চিহ্ন এখন নেই।

নরেশ এগিয়ে গিয়ে কমলকুমারের ঘরের সামনে দাঁড়াল। দবজা বন্ধ। টর্চের আলোয় ভাল করে দেখল দরজাটা। তারপর রথীনের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ।

প্যাসেজ, বারান্দা কোথাও কেউ নেই। তবু নরেশ বিশ তিরিশ পা এগিয়ে গেল। ফিরে এল।

ঘরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আর-একবার সব দেখে নিচ্ছিল। চোখে পড়ল, দরজার নিচে একপাশে কী একটা পড়ে আছে।

নিচু হয়ে বসে নরেশ জিনিসটা তুলে নিল। ইঞ্চি চারেক লম্বা ; দু পাশে গোল বোতামের মতন দুই মুখ, কোনাগুলো ধারালো। মাঝখানে গ্রিপ। দেখতে কাফ-বটন্‌ বা বোতামের মত।

উঠে দাঁড়াল নরেশ। জিনিসটা কী ? বাইরে থেকে দরজা খোলার কোনো যন্ত্র নাকি ?

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল নরেশ। ভাঙা কাচ এড়িয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর টেবিলের সামনে গিয়ে তার ছুরি, টর্চ, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা নামিয়ে রাখল। টর্চ নিবিয়ে দিল।

টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট লাইটার পড়ে ছিল। নরেশ একটা

সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

এখন বোধ হয় শেষ রাত। বাতাসে শীত। বাইরে কুয়াশা জমেছে।

সিগারেটটা শেষ করল নরেশ। কে এসেছিল তার ঘরে ? কে? প্রসন্ননাথের কোনো লোক ? কমল ? রথীন ? রথীনের এত সাহস, বুদ্ধি হবে না। কমলকুমার ? কমলকে নরেশ বিশ্বাস করে না। সামনাসামনি নরেশ কমলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন ল্যাংড়া লোকটাকে সে ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না। অন্যের সামনেও নরেশ কমলকে নিয়ে ঠাট্টা করে, বলে, কলকাতার ল্যাংড়া আর্টিস্ট। কিন্তু মনে মনে নরেশ জানে, কমলকে অত নিরীহ ভাবার কোনো কারণ নেই। অন্তত গতকাল থেকে কমল সম্পর্কে নরেশের ধারণা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। কে ওই লোকটা ? বুড়ির সঙ্গে তার অত খাতির জমছে কেন ? বুড়ি মোটেই খাতির জমাবার লোক নয়। কিসের সম্পর্ক দু জনের মধ্যে ?

নরেশ বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল আবার। দেখা যাক, কাল সকালে ম্যানেজার কী বলে ? নরেশ বুড়ি পর্যন্ত যাবে। ছাড়বে না।

সকালে প্রসন্ননাথ তাঁর অফিসঘরে বসে কাজকর্ম শুরু করার মুখেই নরেশ ঘরে ঢুকল।

প্রসন্ননাথ মুখ তুলে তাকালেন।

নরেশ সোজা প্রসন্ননাথের সামনে এসে চেয়ারে বসল। হাতে সিগারেট। মুখে চাপা চতুর হাসি।

"আপনাকে একটা খবর শোনাতে এলাম—" নরেশ বলল, "খবরটা কি আপনার কানে গেছে ?"

প্রসন্ননাথ তাকালেন। নরেশের মুখে খবর শোনার জন্যে কৌতূহল বোধ করছেন বলে মনে হল না। স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, "কী খবর ?" বলে চুরুটটা ছাইদানে রেখে দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা কাগজ-চাপাটা সরিয়ে দিলেন একপাশে।

"আপনারা কি রত্ননিবাসে চোর-ছ্যাঁচড় পোষেন ? কিংবা গুণ্ডাক্লাসের লোকজন ? নরেশ বলল। উপহাসের মতন করে।

প্রসন্ননাথ বললেন, "দরকারে পুষতে হয়।"

নরেশ বলল, "বুঝতে পারছি। তা দরকারটা আমার ঘরে হল কেন ?"

প্রসন্ননাথ চোখের চশমা খুলে কাচ মুছতে মুছতে বললেন, "আপনার ঘরে কিছু হয়েছে ?"

নরেশ দেখছিল, লোকটা যেন ইচ্ছে করেই বাঁকা পথে হাঁটছে। নরেশ বলল,

"কাল রাত্তিরে আমার ঘরে কেউ ঢোকবার চেষ্টা করেছিল ?...কে ?"

প্রসন্ননাথ দেখলেন নরেশকে। চশমা পরলেন। বললেন, "আমি শুনলাম আপনার ঘরের আলোটা আপনি ভেঙেছেন।"

"আমি নয় ; আপনাদের লোক।"

"আমাদের লোক !...কই আমায় কেউ বলেনি।"

"আপনাকে বলুক না বলুক—আমার কিছু আসে যায় না।...সোজা কথা হল, কাল মাঝরাত্তিরের পর আপনাদের কেউ আমার ঘরের দবজা খুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল।"

"কেন ?"

"কেন ! কেন তা আপনিই জানেন।"

"জানি না। আপনি বলছেন বলে জানছি। কী হয়েছিল ?"

নরেশ অধৈর্য হযে উঠছিল। রাগের গলায় বলল, "আপনি আমাকে যতটা বোকা ভাবছেন ম্যানেজারবাবু, অতটা বোকা আমি নই।" বলে রাত্রের ঘটনার কথা বলল।

প্রসন্ননাথ সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "ব্যাপারটা অদ্ভুত ! খোঁজ করে দেখতে হবে। আপনার ঘর থেকে কি কিছু খোওয়া গিয়েছে ?"

নরেশের মাথা আগুন হয়ে যাচ্ছিল। লোকটা তার সঙ্গে তামাশা করছে ? বলল, "দেখুন সিংহিবাবু, আপনি যতটা চালাক, আমি তার চেয়ে কম চালাক নই। কাল বিকেলে যখন আমি ঘরে ছিলাম না—তখন আমার ঘর আপনারা তল্লাশি করেছেন।"

প্রসন্ননাথের মুখ দেখে মনে হল না, তিনি তল্লাশির খবরে বিব্রত হয়েছেন। শান্তভাবে বললেন, "আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।"

নরেশ খেপে গেল। "কিসের খোঁজ নেবেন। আপনি জানেন না, আমার ঘর তল্লাশি করা হয়েছিল ? আপনি জানেন। আমি বলছি, আপনি সব জানেন।...রাত্রেই বা কে আমার ঘরে দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করেছিল আপনি বিলক্ষণ জানেন।"

"আমি জানি না।"

"ইউ আর এ লায়ার। ড্যাম লায়ার।...আপনারা ভেবেছিলেন ঘুমন্ত একটা মানুষকে খুন করা..."

"খুন ?"

নরেশের আর সহ্য হচ্ছিল না। রাগের মাথায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। "আপনি বড় বেশি সাধু সাজার চেষ্টা করছেন। আমি বলছি, আপনারা আমাকে

খুন করার চেষ্টা করেছিলেন। এ-বাড়িতে আগেও খুন হয়েছে।"

প্রসন্ননাথ যেন এবার বিরক্ত বোধ করলেন। বললেন, "আপনার যদি মনে হয়ে থাকে আমরা আপনাকে খুন করার চেষ্টা করছি, আপনি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেন।"

নরেশ বলল, "বাড়ি আপনার নয়। আপনি কর্মচারী। যাঁর বাড়ি আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

প্রসন্ননাথ বললেন, "আপনি এখন যান। দেখা করতে চাইলেই এ বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করা যায় না। আমি খবর দিচ্ছি। উনি যদি দেখা করতে চান—আপনাকে জানানো হবে।"

"দেখা হবার দরকার রয়েছে।...আমি আমার ঘরে থাকব। খবর দেবেন।"

নরেশ আর অপেক্ষা করল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাইরের বারান্দায় কাউকে চোখে পড়ল না। অর্জুন নয়, পতিতও নয়। নরেশের যেন মাথার ঠিক ছিল না। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। বুড়ো ম্যানেজার নিজেকে কী মনে করেছে? কোথাকার নবাব সে? লোকটা শুধু ধুরন্ধর নয়—নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে।

রাগের মাথায় নরেশ বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে মাঠে নেমে গেল। রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল। বেলা এখন বেশি নয়। রোদ গাঢ়, তবু তপ্ত হয়ে ওঠেনি। খানিকটা হেঁটে গিয়ে দাঁড়ল নরেশ। খেয়াল হল, সে মাঠে।

সামান্য পরে আর ভাল লাগল না নরেশের। গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কোনো কারণ নেই তবু তার হাই উঠছিল। ক্লান্তি লাগছিল। হয়ত কাল ঘুম না হবার জন্যে অবসাদ রয়েছে।

নরেশ অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশ দেখছিল। হঠাৎ কমলকুমারকে দেখতে পেল। পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

কী মনে করে নরেশ এগিয়ে গেল।

কমলকুমার এমনভাবে রোদ, আকাশ, গাছপালা দেখছে যেন তার অন্যদিকে খেয়াল নেই।

নরেশই কথা বলল, "এই যে—আর্টিস্ট, এখানে দাঁড়িয়ে সিনারি দেখছেন?"

কমল তাকাল। হাসল। "আপনি? কী খবর?"

"এখনও মর্নিং ওয়াক?"

"না। দেখছি।"

"কী দেখছেন?"

"এমনি।...আপনি কোথায়?"

"ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলাম। ব্লাডি বাগার। লোকটাকে চাবকাতে ইচ্ছে করছে।"

কমল তাকিয়ে থাকল। "কেন ?"

"ও এ-বাড়ির চাকর না মনিব বোঝার উপায় নেই।"

কমল কোনো জবাব দিল না।

সামান্য চুপ কবে থেকে নরেশ বলল, "কাল সন্ধের পর আপনার ঘর বন্ধ দেখলাম। কোথায় ছিলেন ? আজ সকালেও..."

কমল বলল, "ছিলাম কাছেই।"

"আচ্ছা ! আকাশ চাঁদ ফুল দেখছিলেন ! না ওপাশে বুড়ির কাছে ছিলেন ?"

মাথা নাড়ল কমল। "না।"

"বুড়ি আপনাকে খুব খাতির করছে শুনলাম ?" নরেশ ব্যঙ্গের গলায় বলল।

"কই বুঝতে পারলাম না," কমল সহজভাবে জবাব দিল।

"মশাই, চোখ সকলেরই আছে।"

কমল যেন একটু হাসল।

ছায়ার দিকে আরও একটু সরে গিয়ে নরেশ বলল, "কাল বিকেলে—আমবা যখন ঘরে ছিলাম না, আমাদের ঘর সার্চ হয়েছে। জানেন আপনি ?"

কমল তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। বলল, "আপনার ঘর ?"

"আমার ঘর ওরা সার্চ করেছে।...জানি না লিলি গসের ঘর তল্লাশি হয়েছে কিনা ! ও একেবারে ওয়ার্থলেস। কিছু বলতে পারল না।..আপনার ?"

কমল বলল, "বোধ হয় আমারও।"

"আপনি জানেন না ?"

"ভাল বুঝতে পারলাম না। আমার খেয়াল-টেয়াল একটু কম। তবে সন্দেহ হচ্ছে।"

নরেশ যেন খুশি হল। কমলকেও তা হলে বাদ দেওয়া হয়নি।

"আমার বেলায় শুধু বিকেলে নয়, রাত্তিরেও।" নরেশ বলল, "আমার ঘরে কেউ ঢোকার চেষ্টা করেছিল, দরজা ভেঙে। পারেনি। আমি অ্যালার্ট ছিলাম।" বলে নরেশ পকেটে হাত ঢোকাল।

কমল যেন বিশ্বাস করল না। "কী বলছেন ?"

"মশাই, আমি মাল-খাওয়া লোক হলেও কলাগাছ নই। আপনার সঙ্গে দিললাগি করছি না। কোনো শালা শুয়ারের বাচ্চা, বদমাশ খুনীটুনি হবে—আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে ভেঙেছিল। কিন্তু ঢুকতে পারেনি আমার অ্যালার্টনেসের জন্যে।...ঢোকার চেষ্টা কেন করেছিল আপনি বলুন ?

তার উদ্দেশ্য কী ছিল ? টু কিল্ মী ! একটা ছোরাটোরা বসিয়ে দিলেই তো হয়ে যেতাম। কিংবা ধরুন, গলায় ফাঁস লাগিয়ে টানত··· । এ-বাড়ির অনেক সুনাম। খুনে বাড়ি। কিলারস হাউস !"

কমল কিছু বলল না। হাতের ছড়ি দিয়ে মাঠের ঘাসে দাগ কাটতে লাগল।

নরেশ পকেট থেকে রাত্রে ঘরের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা বার করল। বলল, "এই যে দেখুন। এটা আমার ঘরের দরজার কাছে পড়েছিল।"

কমল দেখল। কাফ্ বোতামের মতন দেখতে অনেকটা। মাঝখানটা শক্ত হাতে ধরা যায় ; দু পাশে দুই ধারালো গোল বোতাম লাগানো যেন।

সাধারণ কৌতূহল নিয়ে কমল হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিল। দেখল। ফেরত দিল।

নরেশ বলল, "দরজা খোলার কোনো যন্ত্র ?"

কমল বলল, "কী জানি !" মুখে বলল, কী জানি— ; কিন্তু জিনিসটা মোটামুটি সে চিনতে পেরেছিল। এই ধরনের জিনিসকে বলে 'কংগো'। বিদেশী ব্যাপার। এখানে স্বদেশী চেহারা নিয়েছে। এ এক মারাত্মক অস্ত্র। যে-লোক কংগো চালানোর কায়দা জানে সে যে কোনো মানুষকে চোখের পলকে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে। মানুষের শরীরে এমন অনেক জায়গা আছে—যা ভীষণ স্পর্শকাতব। স্নায়ুগুচ্ছের কী যেন রহস্য সেখানে জমা থাকে। কংগোর কাজ হল এই বিশেষ জায়গায় আঘাত করা। মানুষ তাতে মরে না, কিন্তু সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। বেকায়দা জায়গায় লাগলে কী হয়—কমল জানে না।

রত্ননিবাসে কেমন করে এই মারাত্মক অস্ত্র এল, কার পক্ষেই বা এই ভয়ংকর অস্ত্র চালানো সম্ভব কমল বুঝতে পারল না।

কমল চুপ করে আছে দেখে নরেশ বলল, "কাল সকাল থেকে বায়োস্কোপ লেগে গিয়েছে, মশাই। ওয়ান আফটার ওয়ান। সকালে গুলি, বিকেলে আমাদের ঘর সার্চ, রাত্তিরে আমার ওপর হামলার চেষ্টা··· । ব্যাপারটা কী ?"

কমল হাসবার চেষ্টা করল। "বুঝতে পারছি না, আপনিই বলুন।"

নরেশ কী মনে করে কমলের কাঁধের কাছে আঙুলের খোঁচা মারল। বলল, "টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি—আমি এখন দুজনকে দেখছি—যারা কলকাঠি নাড়ছে বলে আমার মনে হয়। একজন ওই রাস্কেল ম্যানেজার। নিজেকে ও বড় বেশি চালাক ভাবে। আজ ও বুঝতে পেরেছে, হি ইজ্ নট্ সো ক্লেভার।" বলে নরেশ কেমন ধূর্ত হাসির চোখ করে দু পলক কমলকে দেখল ! তারপর বলল, "অন্য লোকটি আপনি—মিস্টার আর্টিস্ট !···আপনি যত নিরীহ ভালমানুষ সেজে

থাকেন, ইউ আর নট্ দ্যাট্। আপনি গভীর জলের মাছ। বুড়িকে বাগাচ্ছেন। চেষ্টা করুন। কিন্তু আপনাকে আমি আগেই বলেছি, যতক্ষণ পারা যায় আমি ভদ্দরলোকের খেলা খেলব।...তারপর ফ্রি ফর অল। আমি আপনাকে ছাড়ব না। আপনিও আমায় না-ছাড়ার চেষ্টা করবেন।"

কমল উত্তেজিত হল না। হাসিমুখেই বলল, "পরের কথা পরে।...এখন একবার সামনে তাকান। দূরে।" বলে কমল তার হাতের অ্যালুমিনিয়াম স্টিক দিয়ে রত্তনিবাসের পুবের দিকটা দেখাল। বলল, "ওই দূরে দেখুন। বাড়ির থেকে অনেকটা তফাতে ওই গাছপালাগুলো হল কাল সকালের সেই স্পট্। ওদিকেই গুলি চলেছিল। কে চালিয়েছিল ? কেন ? কার পক্ষে আড়াল থেকে গুলি চালানো সম্ভব ?"

নরেশ তাকিয়ে থাকল। রোদ চড়ে এসেছে। বলল, "কে চালিয়েছে আমি জানি না। টার্গেট বোধ হয় আমিই ছিলাম।"

"আপনি, আমি, রথীনবাবু,—এমন কি ওই মহিলা—শেফালিও হতে পারে। আমরা সকলেই বাগানে ছিলাম। যে যার মতন—।" বলে কমল একটু হাসল। "বা এমনও হতে পারে, টার্গেট ছিল না—নিতান্তই ওটা ফাঁকা আওয়াজ।"

নরেশ ব্যঙ্গ করে বলল, "আপনার কান এত পাকা জানা ছিল না।...যাক্, আমি চলি। দেখি বুড়ির সঙ্গে দেখা হয় কিনা!"

নরেশ চলে গেল।

কমলও আর দাঁড়াল না, অন্যদিকে পা বাড়াল।

আর একটু পরেই বেরিয়ে পড়ত কমলকুমার। দরজায় টোকা পড়তেই বলল, "খোলা আছে।"

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো ময়না। ঢুকেই একপাশে, আড়ালে সরে গেল। মনে হল, সে চায় না—বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পায়।

কমল খানিকটা অবাক হল। তার ঘরে ময়না আগেও এসেছে। ডাকতে। রত্ননিবাসের অতিথিদের খবরাখবর রাখা বোধহয় তার কাজ। সরাসরি না হলেও আড়াল থেকে। আজ যেন ও কোনো কারণে সতর্ক হয়ে কিছু বলতে এসেছে।

কমল বলল, "কী ব্যাপার ?"

ময়না দরজার আড়ালে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। নিচু গলায় বলল, "আপনি বাইরে যাচ্ছেন ?"

"বেড়াতে যাচ্ছিলাম। কেন ?"

"দিদিমামণি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। সন্ধের দিকে। আমায় খবর দিতে

বললেন ।"

কমলকুমার ময়নাকে দেখতে লাগল। এর আগে বিদ্যাবতীর সঙ্গে দেখাশোনার ব্যবস্থা হয়েছে প্রসন্ননাথ মারফত। কখনও সরাসরি, কখনও তাঁর ব্যবস্থা মতন। ময়না এসেছে হয় প্রসন্ননাথের ডাক নিয়ে, বা বিদ্যাবতীর কথা মতন। প্রসন্ননাথের অজ্ঞাতে নয়। আজ, কমলের মনে হল, ময়না বোধ হয় প্রসন্ননাথকে না জানিয়েই এসেছে। বিদ্যাবতীর কথা মতনই।

কমল বলল, "সন্ধের দেরি আছে। এখন বিকেল।"

"দেখতে দেখতে বিকেল চলে যাবে। দিদিমামণি বললেন, আপনি আর বাইরে যাবেন না। আমি এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।"

কমল জানলার দিকে তাকাল। পড়ন্ত বিকেল। রোদ নেই। আলো আছে এখনও। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আলো মরে ঝাপসা অন্ধকার নেমে আসবে। তারপরই চোখের পলকে সব আঁধার।

কমল ইচ্ছে করেই বলল, "আমি বাইরে থাকব। বাগানে। না হয় ম্যানেজারবাবুর ঘরে··· ?"

মাথা নাড়ল ময়না, "না। মেসোমশাইয়ের অফিস খোলা নেই। উনি জানেন না। দিদিমামণি বলেছে, ওঁকে কিছু বলতে হবে না। আমি এসে আপনাকে ডাকব।"

কমল তা হলে ঠিকই ধরেছিল। প্রসন্ননাথকে না জানিয়েই বিদ্যাবতী কমলের সঙ্গে দেখা করতে চান! কিন্তু কেন? বিশেষ কোনো কারণে?

কমল বলল, "ঠিক আছে। আমি বাগানের মধ্যেই ঘুরবো।"

ময়না এবারও মাথা নাড়ল। বলল, "আপনি বাগানের এখানে সেখানে ঘুরবেন না।"

বাধ্য হয়েই কমল বলল, "ঠিক আছে।" ময়না গেল না। দাঁড়িয়ে থাকল। দরজা খোলা। তার বোধ হয় মনে হচ্ছিল, দরজার বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে।

"দিদিমামণি বলেছে, আপনি যাবার সময় যা নেবার নিয়ে যাবেন··· ।"

যা নেবার নিয়ে যাবেন? মানে, সেই চাবি নাকি? ময়নাকে কি চাবির কথা বলে দিয়েছেন বিদ্যাবতী? কমল বলল, "সব মানে?"

"আমি জানি না। বলল, সব আনতে বলিস।"

কমল বুঝতে পারল। "আচ্ছা।"

ময়না তবু নড়ল না।

কমল চোখের ইশারায় নরেশ আর রথীনের ঘর দেখাল। বলল, "ওরা

আছে ?”

“দরজা বন্ধ !”

“তালা দেওয়া ?”

“না ।”

“তাহলে আছে ।”

ময়না চোখ তুলল । নামাল । নোখ খুঁটল । চুপচাপ । তারপর বলল, “আপনি খানিকটা পরে সন্ধের আগে আস্তাবলের কাছে যেতে পারবেন না ?”

“আস্তাবল ?”

“দেখেননি ? ঘোড়া নেই । ক'মাস আগে মারা গেছে । গাড়িটা আছে । গাড়িটা আস্তাবলে রাখা আছে । ওদিকে কেউ যায় না । যাবেন আপনি ?” বলে হাত দিয়ে আস্তাবলের দিকটা দেখাল ।

কমল অবাক হলেও কৌতূহল বোধ করছিল । বলল, “ওদিকে কেন ?”

“তখন বলব ।”

কমল কী ভেবে মাথা নাড়ল । যাবে ।

ময়না আর কথা বলল না । ইশারায় জানতে চাইল, বাইরে কেউ আছে কিনা !

কমল মাথা নেড়ে জানাল. কেউ নেই ।

ময়না আর দাঁড়াল না । দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি চলে গেল । যাবার আগে বলে গেল, অন্ধকার হলেই সে আস্তাবলের কাছে হাজির থাকবে ।

কমল কিছুক্ষণ বসে থাকল । তারপর উঠে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল ।

বিদ্যাবতী কেন দেখা করতে চান কমল বুঝতে পারছে । তিনি দেখতে চান সত্যিই কমলের কাছে দানপত্রের বাক্সর চাবিটা আছে কিনা ! ওটাই এখন শেষ প্রমাণ যা দিয়ে কমলকে তিনি স্বীকার করতে পারবেন । আর শ্যামাচরণের চিঠি । কাশীর সুখময় শাস্ত্রীকে লেখা । স্বামীর হাতের লেখা কি এখনও মনে রেখেছেন বিদ্যাবতী ? মনে হয় না । তবু তিনি দেখতে চান ।

বিদ্যাবতী, কমলের মনে হল, প্রসন্ননাথের কাছে নিজের জীবনের কথা প্রকাশ করতে চান না । অন্তত এখনই নয় । কিন্তু তিনি তো কথাটা লুকিয়ে রাখতে পারবেন না । আজ হোক কাল হোক প্রসন্ননাথকে জানাতেই হবে । শুধু প্রসন্ননাথ কেন, রত্ননিবাসের সবাই জানতে পারবে, কমলকুমার বিদ্যাবতীর নাতি । অবশ্য ওঁর এতে লজ্জা বা গ্লানির কিছু নেই । কারও ছেলে যদি হারিয়ে যায়, যদি না তাকে পাওয়া যায় খুঁজে—মা-বাবার করার কী থাকতে পারে !

বিদ্যাবতীর ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল এটা ঘটনা। সেই ছেলে তারপর কোথায় কীভাবে মানুষ হয়েছে তিনি কেমন করে জানবেন। আবার সেই হারানো ছেলের ছেলেও যে এই সংসারে থাকতে পারে—এটা যদি বিদ্যাবতীর না জানা থাকে, তাঁকে কে আর অপরাধী করতে যাচ্ছে! বিদ্যাবতী নিজে অপরাধী নন। তিনি অসহায়। তাঁর অপরাধ যা ঘটেছে সে এমন সময়, এমনই বয়েসে যখন তাঁর কিছু করার ছিল না। তখনও তিনি অসহায় ছিলেন? কিন্তু অত অসহায় কেন?

বৃদ্ধা বিদ্যাবতীকে নিয়ে কমল ঠিক এই মুহূর্তে ব্যস্ত হল না। অপেক্ষা করলেই বোঝা যাবে আজ তার ডাক পড়েছে কেন? কিন্তু কমল বুঝতে পারছিল না, ময়না তাকে কেন আস্তাবলের কাছে দেখা করতে বলল। কারণটা কী? কমলের সঙ্গে ময়নার পরিচয় সামান্য। কথাবার্তাও সাধারণ। অথচ গত পরশুদিন, ময়না যখন তাকে প্রসন্ননাথের অফিসে নিয়ে যাচ্ছিল—তখন নিজেই গায়ে পড়ে কমলকে সাবধান করে দিল। কমলের মনে আছে কথাগুলো। ময়না তাকে বলেছিল, রাত্রে অন্ধকারে বাইরে ঘোরাফেরা না করতে। আর সাবধান করে দিয়েছিল, রাত্রে যদি আচমকা কুকুরের ডাক শোনে, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেন দেখতে না যায়—এভাবে কুকুর ডাকছে কোথায়?

কমল নানারকম অনুমান করেও ধরতে পারল না, ময়না কেন তাকে এত জায়গা থাকতে লুকিয়ে আস্তাবলের কাছে দেখা করতে বলল!

কমল জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আলো আরও ফিকে হয়ে এসেছে। আমবাগানের মাথার ওপর দিয়ে ম্লান আলো ক্রমশই ছায়া জড়ানো হয়ে আসছিল।

এই বাড়ির আস্তাবলটা কমল দেখেছে। তফাত থেকে। আস্তাবল বলে মনে হয় না দেখলে। কলকাতা শহরের পুরনো বাড়ির নফর ঘরের মতন দেখতে অনেকটা। মাথার ছাদ গোল! বাঁকানো। অবশ্য ফটক আছে। লোহার শিক বসানো কাঠের ফটক। পাশেই বোধ হয় ঘোড়া রাখার জায়গা ছিল। টিনের শেডের তলায় হাত কয়েক জায়গা।

আস্তাবলটা রত্ননিবাসের গায়ে গায়ে লাগানো। পুব দক্ষিণ ঘেঁষে। গাছপালাও কিছু রয়েছে ওখানে। কী গাছ কমল খেয়াল করে দেখেনি।

দরজায় আবার খট খট শব্দ হল।

সাড়া দিল কমল। "ভেজানো আছে।"

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল রথীন। কেমন এক হতশ্রী চেহারা। চোখ মুখ শুকনো। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। রুক্ষ। চোখের তলায় কালির দগ। অন্যমনস্ক দৃষ্টি।

কমল দেখছিল রথীনকে। নরেশ যাই বলুক, রথীনকে দেখতে কিন্তু সুশ্রী। চেহারার মধ্যে মেয়েলি ভাব বলতে তার গায়ের ওই অস্বাভাবিক ফরসা রঙ, আর বড় বড় টানা চোখ। শরীর স্বাস্থ্য ঠিক দুর্বল নয়, রোগাটে গড়ন। এখন অবশ্য চেহারার লালিত্য চোখে পড়ছে না।

রথীনের শুকনো, ক্লান্ত চেহারা দেখতে দেখতে কমল বলল, "বেরোচ্ছেন নাকি।"

রথীন প্রথমে জবাব দিল না কথার। পরে বলল, "দেখি। ভাল লাগছে না।"

কমল একটু হাসল। "রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না ?"

রথীন তাকিয়ে থাকল।

"আপনাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ঘুমের রোগ আপনার, ঘুমটুম না হলে..."

কমলকে বাধা দিয়ে রথীন বলল, "এ-বাড়িতে পা দিয়েই ঘুম গিয়েছে।"

কমল যেন হাল্কাভাবেই নিল কথাটা। হেসে বলল, "কেন, কী হল ?"

"এখানে কী হয় আমি বুঝতে পারি না।" রথীন বলল, "সবই যেন ভুতুড়ে। মমির মতন দেখতে এক অদ্ভুত মহিলা, ভাঙা পুরনো দুর্গের মতন বাড়ি, একরাশ দাসদাসী—বিচিত্র এক ম্যানেজার... ! কেন যে এখানে এলাম ! ভাল করে দুটো কথাও কেউ বলল না।"

কমল বলল, "মহিলা বললেন না ?"

"কোথায় আর বললেন !..." রথীন কথা পালটে নিল। "আমি একটা দরকারে এসেছিলাম। আপনার কাছে এন্‌ভেলাপ আছে ?"

"চিঠির ?"

"হ্যাঁ।"

"না," কমল মাথা নাড়ল। "পোস্টকার্ডও নেই। রাখিনি।"

"আমার বড় দরকার ছিল। এখন তো পোস্ট আফিস খোলা পাব না। ভাবছিলাম, চিঠিটা লিখে স্টেশনে গিয়ে পোস্ট করে দেব।"

কমল বলল, "নরেশবাবুর কাছে— ?"

"না।" রথীন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। তারপরই বলল, "ও বেরিয়ে পড়েছে। ঘর তালাবন্ধ।"

কমল বুঝতে পারল, নরেশ সামান্য আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। "আপনি ম্যানেজারবাবুকে বলতে পারেন। অবশ্য এখন তো তাঁকে অফিসে পাবেন না।"

"চলি।"

"কত দূর যাবেন ?"

"দেখি।"

রথীন চলে যেতে গিয়ে দাঁড়াল হঠাৎ। "একটা কথা। নরেশ বলছিল, কাল আমাদের ঘরের তালা খুলে সার্চ হয়েছে। আপনি— ?"

"বোধহয় হয়েছে।"

"হয়েছে !...আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।"

"খেয়াল করেননি হয়ত।"

"আমাদের ঘরে ওরা কী খুঁজছে ?"

"পিস্তল, রিভলবার বা..."

"পিস্তল ?" রথীন যেন চমকে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ। থতমত খেয়ে গিয়েছিল। পিস্তল কথাটা শুনলেই সে এখন ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

কমল বলল, "কাল সকালে পর পর গুলি চলল..."

"হ্যাঁ।...অদ্ভুত !...আচ্ছা চলি।" রথীন আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

কমল কয়েক পলকে রথীনের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে মুখ ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকাল, দেখল, আলো আর নেই। ছায়া ছড়িয়ে যাচ্ছে। সামান্য পরেই হেমন্তের অন্ধকার নেমে আসবে।

সন্ধের আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল কমল। বাগানে ঘোরাঘুরি করেনি। নিজেকে গাছপালার ছায়ায় আর অন্ধকারে আড়াল করে করে আস্তাবলের কাছে এল। এসে কাউকে দেখতে পেল না।

অন্ধকারে বুনো লতাপাতার গন্ধ উঠছে। মস্ত শিরীষগাছের তলায় একটা কাঠের গুঁড়ি। কমল বুঝতে পারল না, ঘোড়াটাকে এই খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হত কিনা।

আকাশে তারা উঠে গিয়েছিল।

কমল এদিক ওদিক পায়চারি করার মতন করে হাঁটছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেল।

ময়না।

ময়না যে কোন দিক দিয়ে এল কমল বুঝতে পারল না।

কমল বলল, "আশ্চর্য ! আমি... ।" কথাটা সে শেষ করল না। তার চোখে ডিভি কনট্যাক্ট লেন্স। অন্ধকারে ভালই দেখা যায় ; অথচ সে ময়নাকে দেখতে পেল না কেন ?

ময়না বলল, "কতক্ষণ এসেছেন ?"

"একটু আগে।"

আকাশের দিকে তাকাল ময়না। ক'মুহূর্ত পরে চোখ নামিয়ে আশেপাশে দেখে নিল। "আপনি এদিকে আছেন—কেউ দেখেছে ?"

“মনে হয় না।” বলে কৌতুকের গলায় বলল, “দুই অতিথি বাড়ির বাইরে। বেড়াতে গিয়েছে।”

ময়না সঙ্গে সঙ্গে বলল, “এক অতিথি গিয়েছে মদ খেতে।”

কমল ময়নার মুখ দেখছিল। নরেশের কথা তাহলে সবাই জানে। হালকাভাবেই কমল বলল, “যার যা নেশা! কেউ যদি মদ খায়...”

“আমরা জানি,” ময়না কয়েক পা সরে গেল। “ও আজ আবার গণ্ডগোল করেছে।”

“কার সঙ্গে?”

“সকালে মেসোমশাইয়ের ঘরে গিয়ে চেঁচামেচি করেছে। তারপর দিদিমামণির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লাফালাফি করেছে।”

কমল প্রথমটা জানত, নরেশ নিজেই বলেছে। পবেরটা জানত না। বলল, “ঝগড়া করেছে?”

“ওর অত সাহস হল কেমন করে! বলছিল, থানায় যাবে।”

“থানায়?”

“ওর ঘর খুঁজে দেখা হয়েছে...।”

“হ্যাঁ। বলছিল।...ঘর বোধহয় আমাদেরও ঘেঁটেঘুঁটে দেখা হয়েছে।”

বলব কি বলব না করে ময়না বলল, “আমি বলতে পারব না।”

কমল মনে মনে হাসল।

“এবার তা হলে—” কমল বলল।

“আসুন।” বলে ময়না এগুতে লাগল। বলল, “আপনাকে আমি গোল সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাব। চোরা পথ। দিদমণি বলে দিয়েছে।”

চোরা পথ? কমল অবাক হল না পুরোপুরি। এই ধরনের সেকেলে বনেদি বড়লোকের বাড়িতে চোরা পথ, গলি পথ, ভুলভুলি পথ থাকতেই পারে। অবশ্য কমল চোরা পথের কথা আগে ভাবেনি। তবে তার সন্দেহ হয়েছিল, প্রসন্ননাথের চোখের আড়ালে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা করার মধ্যে কিছু গোপনতা থাকবেই। আস্তাবলের কাছাকাছি কোনো চোরা পথ থাকতে পারে সে ভাবেনি। ভেবেছিল ময়না তার সঙ্গে আস্তাবলের সামনে দেখা করে হয়ত কোনো ঘুর পথে বিদ্যাবতীর কাছে নিয়ে যেতে পারে।

ময়না আস্তাবলের পেছনে এসে পড়ল।

এখানটায় লতানো ঝোপঝাড়। তার পাশে এক ইটের গাঁথনি। লম্বা হয়ে উঠে গিয়েছে। পুরনো রেল কলোনির দোতলা তেতলা বাড়িতে এই ধরনের গাঁথনি সে দেখেছে। ময়নার কথা মতন দুচার পা এগুতেই দেখল, পাক খাওয়া

ঘোরানো সিঁড়ি। লোহার নয়, ইটের। একটা পাশে দেওয়াল তোলা। বাইরে থেকে দেখার উপায় নেই কে উঠছে, কে নামছে।

প্রসন্ননাথও এক আলাদা সিঁড়ি দিয়ে কমলকে বিদ্যাবতীর সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন সন্ধেবেলায়। সেই সিঁড়ি কিন্তু বাড়ির বাইরের দিকে ছিল না। সেটা ছিল অন্দরমহলের সিঁড়ি। এটা বাইরের।

ময়না বলল, "আপনি সব এনেছেন?"

কমল বলল, "না।"

"না?"

"আনিনি।"

"কেন? দিদিমামণি যে বলে দিল..."

"ওঁর যেটা দরকাব সেটা এনেছি...।"

"কিন্তু— !"

কমল কোনো জবাব দিল না। না দিয়ে টর্চ জ্বালতে যাচ্ছিল, ময়না বারণ করল।

ময়না সামনে। কমল পিছনে। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার! চারদিকে আড়াল। ঠিক যেন এক কুয়োর মধ্যে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠছে। পায়ের শব্দ নিজেদেরই কানে লাগছিল। কমলের ছড়ির শব্দ হচ্ছে ঠক ঠক।

এই সিঁড়িতে বোধহয় অনেককাল মানুষ ওঠেনি। ধুলো নোংরার গন্ধ। কত ধুলোময়লা জমে আছে কে জানে!

ময়না বলল. "দিদিমামণি আমার ওপর রাগ করবে।"

"না। আমি বুঝিয়ে বলব।"

"কী বলবেন?"

কমল এক সিঁড়ি থেকে অন্য সিঁড়িতে পা তুলতে তুলতে বলল, "বলব, আমি নিজেই আনিনি।"

"কেন?"

"এই বাড়িতে আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

ময়না সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুপ। দু মুহূর্ত পরে বলল, আপনি আমাকে অবিশ্বাস করলেন? দিদিমামণি না পাঠালে আমি আপনাকে ডাকতে যেতাম?"

কমল বলল, জোর করে বলতে পারব না। হতে তো পারে এটা একটা ফাঁদ। আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এমন একটা জায়গায় আনা হল যেখানে আমাকে সহজেই খুন করা যায়।"

ময়না আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন তার মুখে কথা আসছিল না। শেষে বলল, "খুন ? আপনাকে !"

"এবাড়িতে খুন নতুন নয়।"

ওপর সিঁড়িতে ময়না। নিচের সিঁড়িতে কমল। কমলের মাথা ময়নার কোমরের কাছে। অন্ধকার এক কুয়োর মধ্যে যেন দুজনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার দিকে আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি। সামান্য আকাশ দেখা যাচ্ছে।

ময়না হঠাৎ বলল, "আপনাকে আমি খুন করতে ডেকে আনিনি। কিন্তু এই সিঁড়িতে খুন হয়েছে।"

কমল যেন সামান্য শিউরে উঠল। সতর্ক হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নিচের দিকে তাকাল। অন্ধকার। কিছুই ঠাওর করা যায় না।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল, "কেমন করে ?"

"টাঙির কোপ্ দিয়ে। কুকুর লেলিয়ে।"

কমলের আর পা উঠল না। আতঙ্ক বোধ না করলেও উদ্বেগ বোধ করছিল। মনে মনে 'একাজি'-কে স্মরণ করল। তুমি ভয়ংকর হও, ভীষণ হয়ে ওঠো—ভয় তোমার কাছে আসবে না। ভীরুতাকে জয় কবতে তুমি পশুর মতন হিংস্র হবে।

ময়না বলল, "নিচে কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছেন ?"

কান পেতে শুনল কমল। বলল, "না।"

"ফাগুলাল নেই। সে থাকলে তার নেকড়ের মতন কুকুরটাকে ছেড়ে দিত। না হয় টাঙি নিয়ে উঠে আসত। শব্দ পেতেন।"

"ফাগুলাল কে ?"

"জল্লাদ। খুনী। এখন সে সুখনবাবুর বাড়ি দেখাশোনা করে।"

কমল আর একপা-সিঁড়ি উঠে গেল নিঃশব্দে। ময়নার বুক তার মাথা ছুঁয়ে গেল।

ময়না চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেখল, কমলের মাথা তার বুক ছুঁয়ে রয়েছে। ঠেলে দিতে গেল কমলের মাথা, দিতে গিয়ে কমলের মাথার চুল মুঠো করে ধরে ফেলল।

"আপনাকে আমি ঠেলে ফেলে দিতে পারি। ঠেলে দিলে অন্ধকার সিঁড়িতে কোথায় গড়িয়ে যাবেন—আপনি বুঝতে পারছেন ?" ময়না বলল।

কমল বলল, "আমার ছড়িটা তোমার পায়ের মাঝখানে আছে। তুমিও বাঁচবে না।"

ময়না বলল, "আপনাকে আমি ঠেলে দিচ্ছি না।...আসুন।" বলতে বলতে মুঠো আলগা করে কমলের মাথার চুল ছেড়ে দিল। তারপর পলকে যেন দু তিন

ধাপ সিঁড়ি উঠে গেল। শব্দ হল পায়ের।

কমল দেখল, ময়না সিঁড়ির শেষ ধাপে। আর একটা ধাপ উঠলেই সে ফাঁকায় গিয়ে দাঁড়াবে।

"কই আসুন ?"

কমল দেখল, তার মাথার দিকটা ঢাকা পড়ে গেল। ময়না শেষ ধাপও উঠে গিয়েছে। তার শরীরের আড়ালে ফাঁক ঢাকা পড়েছে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে মাথার দিকটা।

দেওয়ালে টাঙানো ছবির মতন স্থির, নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল বিদ্যাবতীকে। যেন তিনি কবে কোন কালে মারা গিয়েছেন। তাঁর সজীব কোনো অস্তিত্ব নেই। দেওয়াল ঘেঁষে দীর্ঘ একটি আঁধার-জড়ানো পুরনো ছবি টাঙানো আছে।

কমলকুমার তাঁকে দেখছিল। অপলকে। বিদ্যাবতীর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ছে না। পাতা পড়ছে না চোখের। মনে হচ্ছিল, তাঁর নিশ্বাসও আর পড়ছে না। তিনি মৃত।

ঘরের আলো কিম্ভুত ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে এখানে ওখানে। কোথাও কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। ঘরের জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ। এ এক অন্য ঘর।

কমলকুমারেরই ভয় করে উঠল। উনি কি সত্যিই মারা গেলেন ? সামান্য আগেও উনি বেঁচে ছিলেন। ওঁর সামনে একটা পলকা নকশা করা গোল টেবিল। টেবিলের ওপর ছোট একটি কাঠের বাক্স। বাক্সের মুখ খোলা। দুটি ছোট ছোট চাবি পড়ে আছে পাশে। গোল করে পাকানো একটা কাগজ। তার পাশে দুটি মাত্র চিঠি।

কমলকুমার ভাবছিল উঠবে কি উঠবে না, বিদ্যাবতীকে ডাকবে কি ডাকবে না। সাহস হচ্ছিল না সময় যে কেমন করে বয়ে যাচ্ছিল কে জানে!

হঠাৎ বিদ্যাবতীর হাত সামান্য নড়ল। পাতা পড়ল চোখের।

তারপর দু'চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। শীর্ণ, কুঞ্চিত দুটি গাল ভিজে গেল জলে, চিবুকও ভিজল। অথচ এই কান্নার বেগে কোনো শব্দ নেই, শ্বাস নেই আবেগের। অস্ফুট একটি আওয়াজও শোনা গেল না।

কমলকুমারও স্থিরভাবে নিঃশব্দে বসে থাকল।

কতক্ষণ কে জানে, শেষে বিদ্যাবতীর গলা শোনা গেল। অত্যন্ত অস্পষ্ট, মৃদু।

নিজের মনেই যেন কিছু বললেন প্রথমে। তারপর কমলকুমারের দিকে তাকালেন। বললেন, "আমি তোমায় মেনে নিলাম।"

কমল কথা বলল না। তাকিয়ে থাকল। বৃদ্ধা তাঁর চোখের জল মুছলেন না। তার ঠোঁট বিকৃত হল না। যেমন বসে ছিলেন গদির মধ্যে, সেইভাবেই বসে থাকলেন। কাছের অলোয় তাঁর মুখটি স্পষ্ট করেই দেখা যাচ্ছিল।

খানিকক্ষণ একেবারেই নীরব। শেষে বিদ্যাবতী বললেন, "দানপত্র তুমি দেখবে না?"

কমল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। সামান্য পরে বলল, "দেখব। আপনি কি শ্যামাচরণের হাতের লেখা চিনতে পেরেছেন?"

বিদ্যাবতী বললেন, "কত কাল আগের…মনে তো থাকে না। তবু পারলাম একটু। মনে হল, তাঁরই হাতের লেখা।"

"যদি তাঁর না হয়?"

"না। তাঁরই হাতের লেখা। আমার স্বামীর। তিনি 'র'-এর তলায় ফোঁটাটি বড় করে দিতেন। কেন জান?"

কমল অবাক হল। সে কখনোই এটা লক্ষ করেনি।

বিদ্যাবতী বললেন, "উনি ঠাট্টা করে বলতেন, শ্যামামায়ের পায়ের তলায় চরণ ধরে পড়ে থাকি, একটু বড় করে না ধরে থাকলে মা যদি না দেখেন— ।"

কমল হাসল না। বিদ্যাবতীর স্মৃতি কি এখনও স্বামীর এই তুচ্ছ পরিহাস মনে রাখতে পেরেছে? আশ্চর্য!

কমল বলল, "উনি কি এই পরিবারে শ্যামাচরণ নাম ব্যবহার করতেন? এই বাড়িতে…"

"আমার কাছে করতেন।

দানপত্রে—যৌতুক হিসেবে যা আমরা পেয়েছিলাম, বাবার কাছ থেকে তাতে ওঁর, আসল নামটিও লেখা আছে এক জায়গায়। বোধ হয় আইন মতে লিখতে হয়েছে। দেখবে?"

"পরে দেখব?"

দু'জনেই চুপ।

বিদ্যাবতীর গাল তখনও ভিজে। তিনি থানের আঁচলে চোখ গাল মুছলেন না। তাকিয়ে থাকলেন।

অপেক্ষা করে কমল বলল, "আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন?"

"করেছি ।"

"যদি এমন হয়, ওই চাবি, ও চিঠি—আমি অন্যের কাছ থেকে নিয়েছি? যা আপনাকে বলেছি—সবই অন্যের কাছে শুনে। ধরুন, আমার সঙ্গে এমন একজনের পরিচয় হয়েছিল যে সত্যিই আপনার নাতি। আমি তার কাছে সব

জেনেছি, শুনেছি। শেষে সে হঠাৎ মারা যাবার সময় আমাকে তার সবই দিয়ে গিয়েছিল। আমি আসল নয়, নকল। তার জাল...”

বিদ্যাবতী মাথা নাড়লেন। বললেন, “তুমি জাল নও। জাল হলে এখান পর্যন্ত তোমার আসা হত না।”

কমলের কেমন অদ্ভুত লাগছিল। উনি কেমন করে এত নিশ্চিন্ত হচ্ছেন ?

বিদ্যাবতী বললেন, “তুমি আমায় অনেক খবর শুনিয়ে চমকে দিয়েছ। একটা খবর কিন্তু শোনাতে পারনি। কেন পারনি, তাও আমি জানি।”

কমল তাকিয়ে থাকল। সে বুঝতে পারছিল না, জানানোর মতন কোন কথা তার বাদ গিয়েছে ?

বিদ্যাবতীও চুপ করে থাকলেন।

এই ঘর ক্রমশই যেন ভৌতিক হয়ে উঠছিল। বন্ধ জানলার পাল্লায় হয়ত দমকা বাতাস এসে লাগল। শব্দ হল সামান্য। ছায়াগুলো, যা অগোচরে ছিল, হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়তে লাগল। বিদ্যাবতীর পায়ের তলায় নকল বেড়াল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। মনে হয় যে কোনো সময়ে কালো বেড়ালটা সজীব হয়ে যেতে পারে। ঘরের বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে ? কেউ কি আছে ? ময়না কি ফাঁক ফোকরে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে কমলকে ওই চোরা বিশ্রী পথ দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ? প্রসন্ননাথ কি জেনে ফেলেছেন এই অত্যন্ত গোপন সাক্ষাতের কথা ? যদি জেনে ফেলে থাকেন তিনি, কোথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন ? কেন ?

কমল অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, “আমি আপনাকে যা জানাবার...”

বিদ্যাবতী মাথা নাড়লেন। “তুমি একটা বড় খবর আমায় জানাওনি। কারণ তুমি জান না।”

“কী ?”

“আমার ছেলে চুরি যায়নি।”

কমল যেন স্তম্ভিত, চমকে উঠল। বিদ্যাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল স্থিরভাবে। পাতা পড়ল না চোখের।

বিদ্যাবতী বললেন, “আমাদের সন্তানকে আমি আমার স্বামীর হাতেই তুলে দিতে চেয়েছিলাম।”

কমল মাথা নাড়ল সামান্য। যেন বিশ্বাস করল না কথাটা।

“কী হয়েছিল তুমি শোনো,” বিদ্যাবতী বললেন, “আমার স্বামী কোথায় আছেন আমি জানতাম। গোপনে জেনেছিলাম। আমাদের বাড়িতে আমার এক নিজের লোক ছিল, শৈলদি। এমনিতে সে আমার খাস দাসী হলেও ছিল দিদির

মতন। নিজের প্রাণের চেয়েও আমাকে বেশি ভালবাসত। শৈলদির ছিল যেমন সাহস তেমন বুদ্ধি। শৈলদি অনেক লুকিয়ে-চুরিয়ে আমার স্বামীর খবরা-খবর জোগাড় করেছিল।...করত।"

কমল কোনো কথা বলল না। শুনছিল। দেখছিল বিদ্যাবতীকে।

বিদ্যাবতী বললেন, "উনি কাশীতে আছেন, কেমন করে আছেন আমরা জানতাম। শৈলদি খবর জোগাড় করত। আমরা ওঁর কাছে দু'একটা খবরও পাঠাতাম। বড়বাবুর ভয়ে আর কিছু করার ছিল না। জানতে পারলে সর্বনাশ হত আমাদের।"

বিদ্যাবতী একটু নড়াচড়া করলেন। তাঁর বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল। পিঠ আরও হেলিয়ে দিলেন। চুপ করে থাকলেন অল্পক্ষণ। তারপর বললেন, "তুমি বলেছ, আমরা যখন কাশী গিয়েছিলাম তখন তিনি আমাদের হঠাৎ দেখতে পান। না আমরা কাশীতে যাচ্ছি এ-খবর তাঁকে জানানো হয়েছিল।"

কমল বলল, "আমি..."

"তুমি জান না। জানতেন উনি, আমি আর শৈলদি। এ সব কথা জানানোর অনেক বিপদ ছিল।"

"দু'পক্ষেরই বিপদ।"

"হ্যাঁ।...আমরা তাঁকে জানিয়েছিলাম।...আর আমাদের ছেলেকে আমি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে এসেছিলাম।"

কমল অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকল বিদ্যাবতীর দিকে। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কথা বলতেও পারছিল না। বিদ্যাবতীর মাথা এখন সামান্য হেলানো। তাঁর চোখের দৃষ্টি ধরা যাচ্ছে না।

নিজেকে সামলে নিতে নিতে কমল বলল, "গঙ্গাস্নানের সময় হারিয়ে..."

"না। কেউ হারায়নি। কেউ ডোবেনি। শৈলদি আর আমি অনেক ভেবে ভেবে ঠিক করেছিলাম, এমনভাবে আমাদের ছেলেকে আমার স্বামীর হাতে তুলে দেব যেন কেউ না জানতে পারে। ছেলে গঙ্গায় ডুবে গিয়েছে কিংবা হারিয়ে গিয়েছে—এটা আমরা সাজিয়ে নিয়েছিলাম।"

"শ্যামাচরণ কি— ?"

"তিনি জানতেন। তাঁকে জানানো হয়েছিল। গঙ্গার ঘাটে তিনি এসেছিলেন। আমি তাঁকে দূর থেকে দেখছিলাম। সেই আমার শেষ দেখা।"

বিদ্যাবতী মাথা হেলিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হয়ত অন্ধকার দেখছিলেন। হয়ত অন্ধকারের কোথাও সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি তিনি দেখছিলেন। কাশীর গঙ্গার ঘাট। স্নানের ভিড়। মহালয়া তিথি। অজস্র স্নানার্থীর ভিড়ে

যুবতী বিদ্যাবতী দূর থেকে তাঁর বাক্‌হীন দরিদ্র হতশ্রী স্বামীকে শেষবারের মতন দেখে নিচ্ছেন। আর তাঁর একটিমাত্র অবোধ পুত্রসন্তানকে তিনি শৈলদির হাত দিয়ে অতি গোপনে তুলে দিচ্ছেন স্বামীর হাতে।

কমল নিঃসাড় হয়ে বসে ছিল। তার মনে হচ্ছিল, বৃদ্ধা বিদ্যাবতীর সারা মুখ বুঝি আবার চোখের জলে ভিজে এল।

অনেক পরে কমল বলল, "আপনার একটিমাত্র সন্তান—তাকে আপনি এভাবে স্বামীর হাতে তুলে দিলেন?"

"দিলাম। যাঁর জিনিস তাঁর হাতেই তুলে দিলাম।"

"কিন্তু উনি তো তখন অতি দরিদ্র, ভিখিরির মতন..."

"তাই তো দিলাম, বাবা! উনি তো কিছুই পেলেন না জীবনে। সবই না তাঁর পাবার কথা ছিল। দেবার জন্যেই না বাবা তাঁকে আদর করে ডেকে এনেছিলেন। কিন্তু কী অদ্ভুত ভাগ্য মানুষটার। কিছুই পেলেন না। সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান। তিনি হলেন ভিখিরি, তাঁর জিব কেটে তাঁকে বোবা করে দেওয়া হল। তাঁকে অপমান করে দুর্নাম দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হল বাড়ি থেকে। ...তুমি বলো, আমার আর কী দেবার ছিল তাঁকে, তাঁরই সন্তান ছাড়া?"

কমল যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল। চোখে জল আসছিল তার।

"আপনি তো আপনার সন্তানকে স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ, সুখের মধ্যে মানুষ করতে পারতেন। শ্যামাচরণ নিজের ছেলেকে কেমনভাবে মানুষ করবে..."

"আমি জানতাম। জানতাম, আমার ছেলে দুঃখ কষ্ট অভাব, রোগ-শোকের মধ্যে মানুষ হবে। সব জেনেই আমি দিয়েছি। মন আমার কম বেঁকে বসত না। তবু দিয়েছি শেষ পর্যন্ত।"

"কেন?"

"আমার স্বামী মানুষ ছিলেন। আমরা ছিলাম না। অর্থ আর সম্পদ আমাদের কতরকমভাবে নোংরা, পাপী, অমানুষ করে তুলেছিল—তুমি বুঝবে না। বড়বাবু আমাদের মুঠোয় পুরে রেখেছিল, অন্ধ করে রেখেছিল। তার মোহ থেকে আমি মুক্তি পাইনি।...ছোটবাবু পালিয়ে গিয়েছিল। আমি স্ত্রীলোক। পারিনি।"

বিদ্যাবতী যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নীরব থাকলেন।

কমলও কথা বলছিল না। বুঝতে পারছিল বিদ্যাবতীর মনের তলায় যত কথা—মুখে তিনি তার অতি সামান্যও বলতে পারছেন না। সম্ভব হচ্ছে না বলা।

কতক্ষণ কে জানে, শেষ পর্যন্ত বিদ্যাবতী বললেন, "তোমাকে একটা বলার কথা ছিল।"

"বলুন !"

"তুমি কি আমাকে ছুঁয়ে বলতে পারবে—"

"শপথ করতে বলছেন ?"

"হ্যাঁ।"

কমল উঠে এসে বিদ্যাবতীর হাত স্পর্শ করল।

বিদ্যাবতী বললেন, "আমার, আমার স্বামীর সন্তানের জীবন যে মানুষটি নষ্ট করেছে সে আমার দাদা—বড়বাবু। আমি তোমায় জোর করে বলতে পারব না, চা-বাগান থেকে যে ছেলেটি এসেছে সে সত্যিই ছোটবাবুর ছেলে কিনা। হতে পারে। নাও পারে। তবে ছোটবাবু বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময় আমায় বলে গিয়েছিল, দিদি তোমাকে একদিন তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। হয় তুমি নিজে আত্মঘাতী হবে, না হয় তুমি পিশাচিনী হবে। হয়ে মরবে। আমি আত্মঘাতী হইনি। মরার আগে আমি দেখে যেতে চাই বড়বাবুর ছায়া যেন আর এ-বাড়িতে না ঢোকে।"

কমল বুঝতে পারল না। বলল, "আপনি কি নরেশের কথা বলছেন ?"

বিদ্যাবতী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

"উনি কি— ?"

"বড়বাবুর অনেক কীর্তি। অত তোমায় বলা যাবে না। ...আগ্রার কথাটা কিছু সত্যি। পরে আমি জেনেছি। কাউকে বলিনি। প্রসন্নকেও নয়।"

"নরেশকে..."

"আমার জীবন, আমার স্বামী সন্তান সব গিয়েছে। বড়বাবুর কোনো চিহ্ন এখানে রেখো না।"

কমল যেন পাথর হয়ে গেল। বিদ্যাবতী কি জীবনের এই শেষ বেলায় ভীষণ কোনো প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে গিয়েছেন ?

কমল বলল, "নরেশের কী দোষ ?"

"আমার, আমার স্বামীর, আমার সন্তানের কোন দোষ ছিল !"

কমল বলল, "এ-বাড়িতে এর আগে কয়েক জন মারা গিয়েছে। তারা..."

"তারা কেউ নিজেরা মরেছে। ভয়ে। ধরা পড়ার পর।..."

"অন্যরা ?"

"প্রসন্ন জানে।"

"তারা কি বড়বাবুর— ?"

"হয়ত কিছু ছিল।"

কমল বুঝতে পারল।

বিদ্যাবতী বললেন, "এবার তুমি যাও। ময়না তোমায় পৌঁছে দেবে।"

কমল বিদ্যাবতীর গায়ের পাশ থেকে সরে এল। বলল, "একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আমি বাক্সর মধ্যে রাখা দানপত্র দেখিনি। আমার ঠাকুরদা ও আপনি যৌতুক হিসেবে যা পেয়েছিলেন আমার দাবি তার বেশি নয়।"

বিদ্যাবতী যেন কেমন হয়ে গেলেন। তিনি পিঠ তুলে বসতে বসতে ডাকলেন কমলকে। "শোনো।"

কমল কাছে এল।

বিদ্যাবতীর হাত কাঁপছিল। কোনোরকমে তিনি কমলের একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বুকের কাছে টেনে আনলেন। তাঁর চোখের পাতা বুজে এল। বিড় বিড় করে যেন কী বললেন।

হাত ছেড়ে দিলেন বিদ্যাবতী।

কমল নিজের জায়গায় এসে চেয়ারের পাশ থেকে তার অ্যালুমিনিয়াম স্টিকটা তুলে নিল। নিয়ে একবার দেখল বিদ্যাবতীকে। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরে অন্ধকার। এক টুকরো ছাদ। ছাদের পাশে আধ মানুষ সমান আলসে। ময়লা, শ্যাওলা ধরা, জীর্ণ, আলসে কালো হয়ে আছে। আকাশ-ভরা তারা। তারার আলোয় কমল কয়েক পা এগিয়ে এল। ময়নাকে দেখতে পেল না। এতক্ষণ কি ময়না এক জায়গায় ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকবে! হিম পড়া শুরু হয়েছে। ময়না বলেছিল, আমি এ দিকেই থাকব। আপনি বেরিয়ে এলে আমি দেখতে পাব।

ময়না কি তাকে দেখতে পায়নি?

এই বাড়ির অন্দর মহলের ঘর-দোরের রহস্য কমল ধরতে পারল না। কোথায় কোন চোরা কুঠরি, কোথায় পথ, কোথায় সিঁড়ি কে জানে। ময়না নিশ্চয় কোথাও দাঁড়িয়ে আছে হিম থেকে মাথা বাঁচিয়ে।

কমল আসার সময় যেভাবে এসেছিল সেইভাবে ছাদটুকু পেরিয়ে সেই ঘোরানো কুয়া-সিঁড়ির মুখের কাছে এসে দাঁড়াল।

ময়না। ময়নার জন্যে তাকাল এ-পাশ ও-পাশ।

ময়না নেই। কমল কী করবে? অপেক্ষা করবে?

ময়না কি বিদ্যাবতীকে ঘরে পৌঁছে দিতে গিয়েছে? ও কি বিদ্যাবতীর বসার জায়গার কাছাকাছি বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছিল।

কমল দাঁড়িয়ে থাকল। অপেক্ষা করল সামান্য। আকাশ দেখছিল।

ময়না আসছে না।

কমল কুয়া-সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

সিঁড়ির মুখে দু'পাটের সরু দবজা। খোলাই ছিল।

কমল পা বাড়াল। অন্ধকারেই।

পা বাড়াতেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে নিল। তার পায়ের সামনে কিছু পড়েছিল।

কমল সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, নরম গোছের কিছু পড়ে আছে পায়ের কাছে। নরম, ঘন।

প্রায় পলকেই সে পকেট থেকে টর্চ বার কবে জ্বালল।

শিউরে উঠল কমল। সারা শরীর যেন ঠাণ্ডা। বুকের কাছে ধক ধক করতে লাগল।

ময়না মাটিতে পড়ে রয়েছে। তার চোখের পাতা বন্ধ। ঠোঁট ফাঁক হযে আছে। হাত পা ছড়ানো। কাপড় এলোমেলো।

কমল মাটিতে বসে পড়ল।

ময়নার হাত তুলে নিল। নাড়ি দেখল। বেঁচে আছে। নাকের কাছে আঙুল রাখল। নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত, তবে মৃদু।

ময়নার পায়ের দিকের কাপড় গুছিয়ে দিয়ে কমল তাব গালে হাতেব আঙুল দিয়ে মারতে লাগল। মুখটা নেড়ে দিল। হাত টানল।

ময়না যেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল হঠাৎ, ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেতে লাগল। চোখের পাতা খুলল। বন্ধ করল। আবার খুলল। তারপর তার চেতনা ফিরে আসতেই উঠে বসল ক্লান্তভাবে।

ময়না উঠে বসতেই কমলের নজরে পড়ল, ওর মাথা যেখানে ছিল সেখানে রক্ত ছড়িয়ে আছে।

কমল তাড়াতাড়ি ময়নার মাথা দেখতে লাগল। "দেখি— !"

মাথার তলায় তখনও রক্ত চোঁয়াচ্ছে। চুল ভিজে গিয়েছে।

"তুমি কি পড়ে গিয়েছিলে?" কমল বলল।

"না।" ময়না তার বাঁ-হাতটা দিয়ে মাথার পেছন দিকটা চেপে ধরল

"কী হয়েছিল তোমার?"

"আমায় কেউ পেছন দিক থেকে মাথায় মেরেছিল।" বলতে বলতে ময়না হাতটা চোখের সামনে এনে দেখল। "ইস্— । এত রক্ত!"

"তুমি কোথায় ছিলে?"

"এখানেই। ছাদে। শীত করতে লাগল যখন তখন ভেতরে এসে দাঁড়ালাম

“কে তোমায় পেছন থেকে মারল ?”

“জানি না।”

“আন্দাজ করতে পার ?”

“না। মাথায় যেন হাতুড়ি মারল। আমি চিৎকার করে উঠতেও পারিনি বোধ হয়। পড়ে গেলাম। পড়ার সময় মনে হল, আমার ধাক্কায় সেও নিচে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।”

কমল বলল, “ওঠো। নিচে চলো।”

ময়নাকে হাত ধরে তুলে নিচ্ছিল কমল, হঠাৎ ময়নার শাড়িব পিঠের বা সামনের আঁচল থেকে ঠং করে মাটিতে কী যেন পড়ে গেল।

কমল আলো ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো সেই ভীষণ যন্ত্র—কংগো। কংগোর দিশি সংস্করণ।

জিনিসটা তুলে নিতে নিতে কমল বলল, “তুমি মরে যেতে। কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছ। চলো। আমায় ধরো।”

ময়নাকে নিয়ে কমল নামতে লাগল।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমেই ময়না দাঁড়িয়ে পড়ল।

কমল বলল, “কী হল ?”

ময়না বলল, “দিদিমামণি— !”

কমল বুঝল না। ময়নাকে সে এক হাতে আলগাভাবে ধরে রেখেছে, অন্য হাতে তাব স্টিক আর টর্চ। টর্চের আলো ফেলতে অসুবিধে হচ্ছিল। বরং ময়নাই সামান্য সামলে নিয়েছে। বাঁ হাতে কুয়া-সিঁড়ির দেওয়াল ধরেছে সে, ডান দিকে কমল। কমল তার হাতের ওপর দিকটা ধরে আছে। ময়না বলল, “আপনাকে নিচে পৌঁছে দিয়ে আবার আমায় ওপরে উঠে আসতে হবে। দিদিমামণিকে তার ঘরে নিয়ে যেতে হবে। মণি বসে থাকবে আমার জন্যে। আমি আর পারছি না। মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।”

কমল বুঝতে পারল। ময়না তাকে নিচে আস্তাবলের পেছন দিকে পৌঁছে দিয়ে আবার ওপরে উঠে আসবে, এসে বিদ্যাবতীকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাবে—এই রকম কথা ছিল। বিদ্যাবতী ময়নার জন্য অপেক্ষা করবেন।

কমল বলল, “তুমি পারবে না। নিচে নামবে, আবার উঠে আসবে—এই অবস্থায় পারবে না। মাথার রক্ত পড়া বোধ হয় এতক্ষণে বন্ধ হয়ে এসেছে। তবু মাথায় চোট… !”

ময়নার যন্ত্রণা হচ্ছিল। বলল, “কী হবে ?”

কমল বলল, “আগে ওঁকেই পৌঁছে দিয়ে আসি।” বলে ময়নার দিকে

তাকাল।

"আপনি ?" ময়না আঁতকে উঠল। একেই যন্ত্রণায় তার মুখ কুঁচকে গিয়েছে, কমলের কথায় আরও যেন কেমন হয়ে উঠল। টর্চের আলো সিঁড়ির দিকে, পায়ের তলায়। সেই আলোয় ময়নার মুখ অস্পষ্ট করেই দেখা যায়। তবু কমল তার ডি ভি কন্‌ট্যাক্ট লেন্সের জন্যে মোটামুটি দেখে নিতে পারল।

কমল বলল, "কেন, আমি কী !"

"না না, আপনি নয় ; আপনি নয়। আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না। দিদিমামণিকে আমারই নিয়ে যাবার কথা।"

"কিন্তু তুমি একলা পারবে না। তোমার নিজেরই এখন যা অবস্থা..."

ময়না মাথা নাড়তে গেল, যন্ত্রণায় পারল না। বলল, "দিদিমণি ভীষণ রাগ করবে। আমি মণিকে ওই ঘরে রেখে এসেছি। আমাকেই আবার ঘর থেকে মণিকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে।"

কমল হাত ধরে টানল ময়নার। বলল, "চলো। যা বলছি শোনো। তোমার দিদিমণি দিদিমামণি কিছুই বলবে না তোমাকে। আমি বলছি। তুমি নিজেই দাঁড়াতে পারছ না—অন্য একজনকে কেমন করে নিয়ে যাবে। চলো—।"

বাধ্য হয়ে ময়নাকে যেন রাজি হতে হল। সে বুঝতে পারছিল তার মাথার যা যন্ত্রণা, এখনও যেমন শরীর ঝিমঝিম করছে তাতে সত্যিই তার পক্ষে অথর্ব বিদ্যাবতীকে এক ঘর থেকে তুলে অন্য ঘরে—তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ময়নার কী দোষ ! সে তো জানত না, এইভাবে আড়াল থেকে কেউ তাকে মারবে, মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবে।

সিঁড়ির মুখে এসে কমল বলল, "দাঁড়াও, তোমার মাথায় কিছু একটা বেঁধে দি। মাথার দিকের কাটাকুটির রক্ত বন্ধ হতে দেরি হয়। লেগেছেও জোরে। আর একটু বেকাদায় লাগলে আর চোখ খুলতে হত না।" কমল এমনভাবে কথাগুলো বলল ময়নাকে, যেন চোটটা বেশি হলেও ভয় পাবার মতন কিছু নেই।

সিঁড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কমল টর্চ দিয়ে একবার মাথার আঘাতের জায়গাটা দেখল। রক্ত বন্ধ হয়েছে, তবে চোয়ানো রক্ত রয়েছে। হাতের ছড়ি আর টর্চ ময়নাকে ধরতে বলল কমল।

ময়না সিঁড়ির দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

পকেট থেকে রুমাল বার করে কমল বুঝল, এই রুমাল দিয়ে ময়নার মাথার ক্ষতের জায়গাটা বাঁধা যাবে না। একটু ভেবে নিল সে। রুমালটা পাট করে ছোট করে নিল। তারপর ময়নাকে বলল, তোমার শাড়ির আঁচল ছিঁড়তে হবে।

ব্যাণ্ডেজ করব ।" বলে ময়নাকে হ্যাঁ—না বলতে দিল না । গা থেকে আঁচলের খানিকটা খসিয়ে ছিঁড়ে ফেলল খানিকটা ।

ময়না কথা বলছিল না । কী বলবে ! সে যেন তখনও কেমন বোধহীন অবস্থায় ।

পাট করা রুমালটা মাথার চোটের ওপর রেখে আঁচলের ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল কমল । দেখল । টর্চ আর ছড়ি নিয়ে নিল ময়নার হাত থেকে । বলল, "এখন যা করার করা গেল । নাও, চলো । আমায় ধরো ।"

ময়না বলল, "আপনি টর্চ নিভিয়ে দিন । ছাদে যাব । আলো জ্বালবেন না ।"

কমল টর্চ নিভিয়ে দিল ।

ফাঁকা ছাদ । মাথার ওপর তারাভরা আকাশ । শিরীষ গাছের ডালপালা ঝাঁকড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তফাতে । চারদিক স্তব্ধ । ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছিল আস্তাবলের দিকে । জোনাকি উড়ছে । কুয়াশা জমছে গাছপালা জড়িয়ে ।

ময়না সামান্য এলোমেলো পায়ে হাঁটছিল, কমল তার ডান হাত ধরে রেখেছে ।

ঘরের দরজার কছে এসে ময়না চাপা গলায় বলল, "দিদিমণি যদি কিছু বলে—আপনি আমায়..."

"বলবেন না ।"

কমল যাবার সময় দরজা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল । এই দরজা দিয়ে ময়নার আবার ঘরে আসার কথা, কমলকে পৌঁছে দিয়ে । বিদ্যাবতীর এমন ক্ষমতা নেই যে উঠে এসে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবেন ।

কমল দরজা ঠেলল ।

দরজা খুলে গেল । ঘর অন্ধকার । ঘুট ঘুট করছে । কালোর পরদা দিয়ে সব যেন মোড়া ।

কমল অবাক হয়ে গেল । আলো নিভে গেল কেমন করে ? এই ঘরে বড় মতন টেবিল-বাতি জ্বলছিল । কোথায় গেল বাতিটা ? ঘর একেবারে নিস্তব্ধ । বিদ্যাবতী কি নিজেই উঠে চলে গিয়েছেন ? তাও কি সম্ভব ?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই কমল টর্চ জ্বালল । জ্বেলে ঘরের মধ্যে আলো ফেলতেই চোখে পড়ল, বিদ্যাবতী তাঁর নিজের জায়গায় কেমন করে যেন এক পাশে হেলে বসে আছেন । মাথা ঘাড় ঝুঁকে রয়েছে ।

ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ? তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন ? শরীর মন আর বুঝি সহ্য করতে পারেনি এত মানসিক চাপ উত্তেজনা !

কমল কাছে এল বিদ্যাবতীর । আলো ফেলল । ফেলেই এমন অদ্ভুত শব্দ

করল ভয়ে যেন কেউ তার গলা টিপে ধরেছে হঠাৎ। সারা শরীর হিম হয়ে গেল। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছিল তার।

তাড়াতাড়ি কমল বিদ্যাবতীর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল। প্রথমেই নাকের কাছে হাত দিল। তার হাত কাঁপছিল। জোর করে হাতটা ধরে রাখল। নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে না। কমল তাড়াতাড়ি বিদ্যাবতীর হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখল। কোনো স্পন্দন নেই। বিদ্যাবতী আর নেই। মারা গিয়েছেন।

কিন্তু কেমন করে? আচমকা! হার্ট ফেল!

ময়না পেছনে। বলল, "কী হয়েছে?"

কমল ক' মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। পরে চাপা গলায় বলল, "মারা গিয়েছেন।"

ময়না যেন শুনতে পায়নি, বুঝতেও পারেনি। "কী?"

কমল বলল, "উনি আর নেই।"

ময়না সঙ্গে সঙ্গে কমলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিদ্যাবতীর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ল।

"দিদিমামণি? দিদিমণি?" ময়না দু হাত দিয়ে ঝাকুনি দিতে যাচ্ছিল বিদ্যাবতীকে, কমল তাকে আটকাল।

"দাঁড়াও, এখন ছুঁয়ো না।"

"ছোঁবো না! দিদিমণি..."

"উনি নেই। মারা গিয়েছেন।"

ময়না চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ওর বিশ্বাস হচ্ছে না। আবার এগিয়ে এল। তার তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদে বদ্ধ ঘর যেন আরও ভয়ংকর ভৌতিক হয়ে উঠল।

কমল ময়নাকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, "এখন চেঁচিয়ো না। দেখতে দাও। চিৎকার করে লোক জুটিয়ে লাভ হবে না।"

টর্চের আলোয় কমল একে একে অনেক কিছু দেখে নিল। বিদ্যাবতীর মুখ চোখ হাত। ওঁর শাড়ির পিঠের দিকে একটা বালিশ মোচড়ানো। দলা পাকানো। গায়ের আঁচল কোলের কাছে পড়ে আছে খানিকটা। একটা হাত যেন ওঠাবার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। একটা পা সামনের দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে।

ময়না কাঁদছিল। নিজেই যেন নিজের গলা টিপে ধরবে। সে হাঁটু গেড়ে লুটিয়ে বসে পড়েছে বিদ্যাবতীর পায়ের তলায়।

কমল আলো ফেলে ফেলে আরও অনেক কিছু দেখল। পলকা গোল

টেবিলের ওপর রাখা সেই বাক্সটা আর নেই। গোল করে পাকানো দানপত্রও নয়। চাবি দুটোও নেই।

না, আলো কেউ ভাঙেনি। নিভিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

বিদ্যাবতীকে যে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে বোঝাই যায়। নব্বুই বছর বয়েসের এক শীর্ণ অসুস্থ বৃদ্ধাকে গলায় ফাঁস দিয়ে মারার দরকারও করে না ; একটা কুশন বা বালিশই যথেষ্ট। হ্যাঁ, একটা কুশন ওঁর কোলের তলায় হাঁটুর কাছে পড়ে আছে। বা এমনও হতে পারে গলায় ফাঁস লাগানো হয়েছিল। সম্ভবত স্কার্ফ বা রুমাল ধরনের বড় কাপড় দিয়ে। সে কাপড আপাতত নেই। অদৃশ্য। বিদ্যাবতীর গলার কাছে থান তোলা রয়েছে। হয়ত দাগ ঢাকার জন্যে। কমল কিছুই ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। পুলিশের জন্যে তোলা থাক সব।

ময়না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

কমল বুঝতে পাবছিল, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

"ময়না ?"

ময়না শুধু কাঁদছে।

কমল বলল, "পরে কাঁদবে। এখন উঠে পড়। তোমার দিদিমণিকে কেউ দমবন্ধ করে খুন করেছে ?"

কথাটা শোনামাত্র ময়না চিৎকার করে বলতে যাচ্ছিল, 'না !' বলতে পারল না। তার মুখ হাঁ হযে থাকল। গোঙানো শব্দ হচ্ছিল। বিকট কান্নায় তার গলা যেন আটকে গিয়েছে।

খানিকটা পরে ময়না হঠাৎ বলল, "দিদিমণিকে কে মারল ?"

"জানি না।"

"আপনি এ ঘরে এসেছিলেন। আপনি এখানে ছিলেন। দিদিমণির সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন।" ময়না উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

কমল যেন প্রথমটায় খেয়াল করেনি, বিদ্যাবতীর মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী হতে পারে। ময়নার কথায় তার মনে হল, অবস্থাটা বাইরে থেকে দেখলে বা সাধারণভাবে দেখলে মনে হতে পারে, সে খুনী। বিদ্যাবতীকে দম বন্ধ করে মেরে, বাতি নিভিয়ে সে ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল !

কয়েক মুহূর্ত কমল কোনো কথা বলল না। তাকে ফাঁদে জড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে তা হলে !

ময়না বলল, "দিদিমণি এখানে আসবে কেউ জানত না, আমি ছাড়া। আপনাকে আমিই নিয়ে এসেছিলাম এই ঘরে দিদিমণির কথা মতন। আপনি ছাড়া এই ঘরে কেউ আসেনি। কে দিদিমণিকে খুন করবে ?"

কমল বলল, "তুমি জান না কে খুন করতে পারে ?"

"না।"

"ঠিক আছে। ওঠো।"

"না।"

"এখানে পড়ে থেকে লাভ হবে না। ওঠো।"

"আপনি খুন করেননি? সম্পত্তি পাবার জন্যে একটা নব্বুই বছরের বুড়িকে..."

ময়নাকে কথা শেষ করতে দিল না কমল। হঠাৎ নুয়ে পড়ে তাকে টেনে তুলল। শক্ত হাতে। মনে হল, যেন সে রুক্ষ, রাগী হয়ে উঠেছে হঠাৎ। প্রায় ধমকের গলায় বলল, "কথা বলার অনেক সময় পাবে পরে।...যাও, কোন দরজা দিয়ে তোমার দিদিমণি এই ঘরে এসেছিলেন—সেই দরজাটা আগে দেখো।"

ময়না এগিয়ে গেল। দরজা জানলায় পরদা টানা। কোনটা জানলা কোনটা দরজা বোঝাই যায় না। কমল আলো ফেলছিল। ময়না কোনাকুনি একটা জায়গায় গিয়ে পরদা সরাল। আড়ালে দরজা। দরজা টানল। খুলল না। বাইরে থেকে বন্ধ।

ময়না দরজায় ধাক্কা মাবল।বন্ধ। ভয়ের গলায় বলল, "বাইরে থেকে কে বন্ধ করে দিয়েছে।"

কমল কয়েক পা এগিয়ে এল। "তুমি যখন তোমার দিদিমণিকে এই ঘরে নিয়ে এসে বসালে, তুমি কি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেছিলে ?"

"না।"

"নয় কেন ?"

ময়না থতমত খেয়ে গেল। বলল, "খেয়াল করিনি। দিদিমণিও বলেনি।"

"দরজাটা তোমার বন্ধ করা উচিত ছিল। কেন করোনি ? আমরা আড়ালে দেখা করে কথা বলছিলাম। যে কোনো লোকই তো ঘরে ঢুকে পড়তে পারত। কেন তুমি দরজা বন্ধ করলে না ভেতর থেকে ?"

ময়না বুঝতে পারছিল না কী বলবে। তার খেয়াল হয়নি ? না, ভুল হয়েছে ? নাকি সে ভাবেনি এই ঘরে কেউ আসতে পারে।

ময়না কেঁদে ফেলল। বলল, "এখানে কেউ আসবে আমি ভাবিনি।"

কমল বলল, "দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ না করে তুমি ভুল করেছ। পুলিশ যদি বলে, তুমি ইচ্ছে করেই দরজা বন্ধ করোনি ? তুমি অন্য কাউকে ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছ ?"

ময়না চিৎকার করে উঠল। "মিথ্যে কথা। না, আমি কাউকে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিইনি। বিশ্বাস করুন।"

কমল বলল, "বিশ্বাস করছি।...তুমিও বিশ্বাস করতে পার, আমি তোমার দিদিমণিকে গলা টিপে মারিনি।"

ময়না তথমত খেয়ে গিয়েছিল। অপ্রস্তুত। বলল, "আমি এমনি বলেছিলাম। ভেবে বলিনি। আপনি খুনী হলে আমায় ফেলে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেন।"

কমল বলল, "আমি খুনী হলে তোমার দিদিমণিকে খুন করে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতাম। ঘরের পেছন দিকে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করতে পারতাম না। ছাদ থেকে ওপাশে যাবার কোনো রাস্তা নেই। ছাদ থেকে এই ঘরে ঢোকার একটিই দরজা, যে-দরজা দিয়ে তুমি আমায় নিয়ে এসেছ।"

ময়না চুপ করে থাকল। মুখ ফসকে আচমকা কথাটা সে বলে ফেলেছে। নিতান্তই ঘাবড়ে গিয়ে। সে জানে, ছাদের এ পাশ থেকে ঘরের ও পাশে যাবার কোনো রাস্তা নেই। ছেলেমানুষের মতন ময়না বলল, "আমি ভয় পেয়ে..." কথাটা আর শেষ করল না সে।

কমল টর্চের আলো ফেলে ফেলে ঘরটা দেখছিল। বলল, "এই ঘবটা কিসের ? ওঁর বসার ঘর নয়। সেখানে আমি গিয়েছি।"

ময়না বলল, "এই ঘরটা এক সময় মণির পুজোর ঘর ছিল।"

"পুজোর ঘর ?"

বসার ঘরের দক্ষিণে। মণির শোবার ঘর থেকেও এ ঘরে আসা যায়।"

"দেখে তো পুজোর ঘর মনে হয় না।"

মাথা নাড়ার চেষ্টা করল ময়না। বলল, "না। অনেক আগে মণি এখানে বসে পুজো করত। তারপর পুজোটুজো ছেড়ে দেয়। ঘরটা পড়ে ছিল। কী মনে হয় মণির, ঘরে কিছু জিনিসপত্র রেখে দিয়েছিল। এক একদিন হঠাৎ এসে বসে থাকত। একলা। আজকাল আর আসত না।" ময়না একটু থামল ; বলল, "শীতকালে এক আধ দিন বড় জোর আসত।"

কমল বলল, "শীতকালে ! মাঘ মাসে ?"

"তা বলতে পারব না।"

কমলের মনে পড়ছিল, ষোলোই মাঘ, ত্রয়োদশী তিথিতে বিদ্যাবতীর বিয়ে হয়েছিল। মহিলা কি দিনটি স্মরণে রেখেছিলেন। কে জানে !

টর্চের আলো যেন নিজের থেকেই বিদ্যাবতীর মুখের ওপর গিয়ে স্থির হয়ে থাকল। দেখছিল কমল; স্থির চোখে। বিদ্যাবতী কোনো দিন কি এই ঘরটিকে নিভৃত স্বামীসঙ্গের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন ! হতে পারে। নাও পারে ! এই ঘরটিতেই কি বিদ্যাবতীর সন্তানের জন্ম হয়েছিল ? কে জানে ! কী হয়েছিল, সে

কথা জানার উপায় নেই। কিন্তু এই ঘরেই তাঁর অদ্ভুতভাবে মৃত্যু ঘটল। বিদ্যাবতী কোনো দিন কল্পনা করেননি তঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তটি এমন নির্মমভাবে আসতে পারে। কী মর্মান্তিক মৃত্যু! নব্বুই বছরের প্রায়-মৃতা এক মহিলাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হল। কে এমন নৃশংস যে এমনভাবে বিদ্যাবতীকে খুন করল? কে?

কমল শুধু বেদনাই বোধ করছিল না, তার মধ্যে কিসের এক চঞ্চলতা এবং ক্রোধ জমে উঠেছিল। মহিলার সমস্ত জীবনটাই অভিশপ্ত। নিয়তি তাঁকে সোনার এক মূর্তি করেই রত্ননিবাসে প্রতিষ্ঠা করে গেল। প্রাণহীন এই মূর্তির কোনো মূল্য থাকল না। জীবনে উনি কিছু পেলেন না। সুখ না, স্বস্তি নয়, স্বামী নয়। এমন কি সন্তানও নয়।

ময়না কমলকে দেখছিল। বলল, "শুনছেন?"

"বলো?"

"এখন কী হবে?"

কমল বুঝতে পারছিল, আর অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। ডাকল ময়নাকে, "এসো।"

"কোথায়?"

"বাইরে চলো। এই ঘরের যেখানে যা আছে থাক। বাইরে চলো।"

ময়নাকে নিয়ে বাইরে এল কমল। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে।

ছাদ জোড়া অন্ধকার। আকাশ তারায় তারায় ভরা। হেমন্তের কুয়াশা ঘন হয়ে উঠছে গাছপালায়। বাগানে।

কমল আকাশের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকল। নিজেকে যেন স্থির শান্ত করছিল।

'একাজি'-কে স্মরণ করল কমল। সেই বিচিত্র মানুষটি, যিনি কমলকে শুধু পালন করেননি, নিগ্রহ নির্যাতন কষ্ট ও ক্লেশের মধ্যে দিয়ে কঠিনতম সক্ষম পুরুষ হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বেটা তুই কুত্তার মতন কাঁদবি না, পালাবি না। তুই...

হ্যাঁ, কমলের মনে পড়ল, একাজি বলতেন, পশু যখন শিকারের ওপর ঝাঁপ দেয় তখন তার লক্ষ্য শুধু শিকার। সাপ যখন ছোবল তোলে সে কার গায়ে বিষ ঢালছে তা নিয়ে গ্রাহ্য করে না। মানুষকে যখন পশু হতে হয়—সে পরিপূর্ণ পশুই হবে, দেবতা নয়। মানুষও না।

বেটা, তোর দিশা যখন ঠিক করবি, কোনো দিকে তাকাবি না, শুধু দিশার দিকে তাকিয়ে থাকবি। ওই দিশাই তোর প্রাণ।

কমল অনুভব করছিল, এখন সেই পরম আশ্চর্য শক্তিকে নিজের ইন্দ্রিয়, বোধ ও অনুভূতির মধ্যে গ্রহণ করার সময় হয়েছে। 'ভিসিকাব্রজ'। একাজির কাছ থেকে যে-শক্তির খানিকটা সে শিক্ষা করতে পেরেছে।

পা বাড়াল কমল। "এসো।"

ময়না বলল, "সিঁড়িতে যদি কেউ থাকে?"

"থাকুক। তুমি এসো।"

সিঁড়ির দরজা পেরিয়ে প্রথম ধাপে পা দিল কমল। "আমাকে ধরো।"

"আমি পারব।"

"পেছনে থাকো তুমি। দেওয়াল ধরে এসো।"

"বাতি জ্বালছেন?"

"ভয় করে লাভ নেই। তুমি এসো।"

সিঁড়ি নামতে লাগল কমল। ময়না পেছনে।

আধাআধি নেমে কমল বলল, "এখন রাত বেশি হয়নি বোধ হয়। নরেশবাবুরা ঘরে ফিরে এসেছে। আমি আমার ঘরে থাকব।"

ময়না বলল, "আমি কী করব?"

"তুমি বাড়ির মধ্যে যাবে। গিয়ে নিজের অবস্থাটা দেখাবে। বলবে,তোমাকে কেউ মারবার চেষ্টা করেছিল। লোকটা আমার মতন দেখতে।"

"না না!" ময়না বলল, "আপনি আমাকে..."

"তুমি বলবে, আমি তোমার দিদিমণিকেও খুন করেছি।"

ময়না সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কমল পিছনে তাকাল না। বলল, "তুমি না বললেও ওরা বলবে। বলার জন্যেই ফাঁদ পেতেছিল। তুমিই আগে বলো।...এমন করে বলবে যেন হইচইটা জমে যায়।" কমল যেন শেষের দিকে একটু হালকা করে বলল।

"তারপর?"

"তারপর যা হবে তুমি দেখতে পাবে। শুধু একটা কথা আমায় বলো, ময়না। তোমাদের এ-বাড়িতে সাইকেল আছে?"

"গোবিন্দ দরোয়ানের ছিল। বাড়ির সাইকেল।"

"এখানে এমন কেউ আছে যে স্টেশনের কাছে রামগতির কাছে যেতে পারে? সরকারবাবুদের বাড়ি। রামগতি ভাঙাচোরা মোটরগাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটে?"

"জানি। স্টেশনের যাবার মতন এখন কেউ নেই।"

"থানায় যাবার মতন?"

ময়না চুপ করে থেকে বলল, "না। আমার কথায় কেউ যাবে না।"

কমল নিচে নামতে নামতে বলল, "আজ কী হবে আমি বলতে পারছি না। যদি আমি মারা যাই, খুন হই—রামগতিকে একটা খবর তুমি পৌঁছে দিতে পারবে না পরে ?"

ময়না দু ধাপ সিঁড়ি নেমে এসে অদ্ভুতভাবে বলল, "আপনি খুন হবেন ?"

কমল বলল, "কে হবে বলতে পারছি না। হবে। হয় আমি নয়ত সে—কিংবা ওরা "

সিঁড়ি ফুরিয়ে গিয়েছিল।

কমল টর্চ নিভিয়ে দিল।

আস্তাবলের পেছনে ভাঙাচোরা দেওয়াল আর আগাছার ঝোপের মধ্যে দিয়ে ময়না ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল কমল আর দেখতে পেল না।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে খানিকটা ফাঁকায় এল কমল। চারপাশ দেখে নিল। এখন, এই অন্ধকারে, গাছপালার ফাঁকে, ঝোপেঝাড়ে কী ধরনের বিপদ কোন আড়ালে লুকিয়ে আছে সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু আছে। আদিম পশুসুলভ এক বোধ থেকে সে বুঝতে পারছে, এই আস্তাবলের সামনে থেকে নিজের ঘর পর্যন্ত ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সহজ হবে না।

কমল একটা পা হাঁটু গেড়ে বসল। তার ভাঙা বা কমজোরী পায়ের প্যান্টের তলার দিকের কোথাও জিপ্ ফ্যাস্‌নার লাগানো ছিল। খুলে ফেলল খানিকটা। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। হাত ছোঁয়াল। সাধারণভাবে মনে হতে পারে, কমজোরী পায়ের হাড়গোড় বাঁচাবার জন্যে এক ধরনের গার্ড পরে সে। চামড়ার দু তিনটে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা গার্ড। আসলে এটা কোনো গার্ড নয়। কোনো সূক্ষ্ম জিনিস, দরকারী জিনিস লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা। কমলের পছন্দমতন বানানো। পায়ের পেছন দিকে, কাফ্ মাসল্-এর কাছটায় পুরোপুরি ফাঁকা। এই জায়গাটা শরীরের খুবই প্রয়োজনীয় অংশ। বলা যেতে পরে সেকেণ্ড হার্ট। এখানে স্থায়ী চাপ রাখা উচিত নয়। কমলের পায়ের এই অংশে কোনো চাপ ছিল না। সামনের দিকের হাড় এবং দু পাশে কয়েকটা রিব। মনে হতে পারে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পায়ে পরা প্যাড্। অনেকটা সেই রকম।

কমল দু হাতে রিব্‌গুলো দেখে নিল। ফাঁপা রিব্, বা সরু নল। এক দিকের রিবে সূক্ষ্ম কয়েকটা যন্ত্রপাতি, মোটা ছুঁচের মতন স্ক্রু ড্রাইভার, সোন্নার মতন প্লাস, নানা ধরনের বাঁকানো শক্ত তার, টুকিটাকি আরও কিছু। অন্য রিব্ বা ফাঁপা সরু নালির মতন মধ্যে কোনো যন্ত্রপাতি নয়, কয়েকটা বুলেট। পেনসিলের মতন সরু, লম্বায় সোয়া ইঞ্চি মতন। এদের সোহাগী নাম, "ফ্লাই' বুলেট। যুদ্ধের সময়

স্নাইপারদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাছি মার্কা বুলেট কিছুদিন ব্যবহার করেছিল আমেরিকানরা। এখন আর এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

কমল আরও দুটো বুলেট বার করে নিল। নিয়ে প্যান্ট ঠিকঠাক করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তার হাতের অ্যালুমিনিয়াম স্টিকের মাথার দিকে চাপ দিতেই ওপরের আবরণ আলগা হয়ে গেল। হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাতে যেটা থাকল সেটা যেন গুপ্তি। শৌখিন ছড়ির তলায় যেভাবে গুপ্তি লুকোনো থাকে, প্রায় সেই রকম। অ্যালুমিনিয়াম স্টিকের ওপরটা দেখলে ক্রাচ্ মতন মনে হয়। ওটা নিতান্তই আবরণ, বা খাপ্। ভেতরে সরু নলের এক অদ্ভুত বন্দুক, স্টিক গান।

খুব তাড়াতাড়ি, কয়েক পলকের মধ্যে কোন্ কলকব্জা সরিয়ে কমল আরও দুটো 'মাছি' বুলেট ভরে নিল। আগে থেকেই দুটো 'মাছি' ভরা ছিল ; নতুন করে দুটো ভরার পর চারটে হল। গোটা ছয়েক ভরা যায়। আপাতত তার দরকার নেই। চারটেই যথেষ্ট।

কমল নিচু হয়ে অ্যালুমিনিয়ামের খাপটা কুড়িয়ে নিয়ে আগের মতন লাগিয়ে নিল। এখন সে বোধ হয় অনেকটা নিরাপদ।

নিরাপদ, কিন্তু নিশ্চিত নয়।

পাঁচ দশ পা সরে এসে কমল আকাশের দিকে তাকাল। অজস্র নক্ষত্র, দুরান্তে বুঝি কোনো ছায়াপথ। নিজেকে হঠাৎ কেমন অসহায়, নিঃসঙ্গ, দুঃখী মনে হল কমলের। সে কেন এসেছিল এখানে ? কী হল ? কমল কি অর্থের লোভে এসেছিল ? ধনসম্পত্তির আশায় ? না। সম্পদের লোভে সে আসেনি। এসেছিল নিজের পরিচয়কে স্পষ্ট করে সত্য করে জেনে নিতে। তার জানা হয়ত শেষ হয়েছিল, কিন্তু ওই বৃদ্ধা বিদ্যাবতী, যে পরম ব্যর্থতা বঞ্চনা ও বেদনার মূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, সেই মানুষটির অন্তরে আরও কত কী ছিল জানা হল না। নৃশংসভাবে তাঁকে খুন করা হল।

কমল নিজের মধ্যেই যেন চমকে উঠল। সে কি দুর্বল হয়ে পড়ছে ? আবেগ তাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলছে ?

না। কমল এখন অলস, বিষণ্ণ, ভাবুক হতে পারে না। সে সময় তার নেই। কমলকে এই মুহূর্তে ভয়ংকর হতে হবে। নির্মম, নৃশংস, পশুর মতন বিপজ্জনক।

একাজি···একাজি। কমল তার জীবনের শিক্ষক ও গুরুকে স্মরণ করল। দুঃখ যন্ত্রণা নিগ্রহ গ্লানি থেকে যিনি তাকে উদ্ধার করে মানুষের চেতনা দিয়েছিলেন।

কমল একটি নক্ষত্রকে বেছে নিতে নিতে চোখের পাতা বন্ধ করল। সহস্র

নক্ষত্রের পট থেকে একটিকে বেছে নেওয়া যায় না। চোখের তলায় অনন্ত আকাশ, অজস্র নক্ষত্র ধরা দেয়, মিলিয়ে যায়, আবার ধরা দেয়, মিলিয়েও যায় আবার।

'ভিসিকাব্রজ'। একাজি শিখিয়েছিলেন, মনকে বিমুক্ত করো। নদীর যে-জল ক্রমাগত বয়ে চলেছে তাকে রোধ করা যায় না। মন নদীর মতন। বেটা, সেই মনকে বাঁধতে হবে। একাগ্র হও। মনে করো, একটি আলোর কুঁড়ি তোমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। ওই কুঁড়িটা ছাড়া তোমার চোখের বা মনের সামনে কিছু নেই। সেই আলোর কুঁড়ি ক্রমশ বিন্দু হবে। ম্লান হবে। তারপর ভেঙে যাবে। ভেঙে গিয়ে চার বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে যাবে, ওপরে নিচে, চার কোণে। আবার সেই ছড়িয়ে পড়া বিন্দুগুলোকে এক করো একটি বিন্দু হয়ে ওঠার পর—সেই বিন্দু হবে তোমার একমাত্র ধ্রুব। তার ধ্যান একাগ্রতা থেকে তুমি নিজের ইন্দ্রিয় অনুভূতি বোধকে অনুভব করতে পারবে নতুন করে। তুমি তোমার অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করতে পারবে।

কমল অনুভব করল, অচঞ্চল স্থির ক্ষুদ্রতম কোনো জ্যোতিকণা থেকে সে নিজের শক্তিকে যেন গ্রহণ করতে পারছে। তার স্নায়ু তীক্ষ্ণ, দেহের কোন্ গোপন অদৃশ্য সত্তা থেকে তার মধ্যে এক প্রবল ভয়ংকর শক্তি রক্তপ্রবাহের মতন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। সে কঠিন, সে নির্মম। অতি হিংস্র।

নিজেকে, নিজের হাত পা আঙুল, মেরুদণ্ডকে ইস্পাতের মতন কঠিন মনে হচ্ছিল।

কমল এখন প্রস্তুত।

সাবধানে পঁচিশ ত্রিশ গজ জায়গা এগিয়ে এল কমল। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই,। রত্ননিবাসের দু একটি আলোর রেখা যেন আরও ম্লান। কুয়াশা জমছে। শিরীষ গাছের মাথার ওপর পাখি বুঝি ডানা ঝাপ্টালো।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কমল। তার মনে হল, কে যেন হাল্কাভাবে, দমকা বাতাস বয়ে যাবার মত করে একবার শিস দিল।

সতর্ক হয়ে গেল কমল। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টর্চ জ্বালল না। আলো জ্বালার সময় এটা নয়। কমল চারপাশে তাকাল। তার ডি ভি কনট্যাক্ট লেন্স চোখে থাকা সত্ত্বেও গাছপালা ঝোপের আড়ালে কিছু ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। এখানে আতা আর ডালিমগাছের ঝোপ।

কমল আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল।

পায়ের শব্দ পেল কমল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল কে যেন তার ঘাড় মাথা তাক করে কিছু তুলেছে। টাঙি।

কমল চোখের পলকে সরে গেল।

লোকটা অন্ধকারে টাঙি তুলে তার দিকে লাফিয়ে পড়ার মতন ছুটে এল আবার।

হয়ত কমল তাকে এড়িয়ে গিয়ে আক্রমণ করতে পারত কিন্তু তার আগেই লোকটা আচমকা চিৎকার করে টাঙি ছেড়ে দিল। দিয়ে বিশ্রীভাবে গালাগাল করে উঠল, "শালা চাক্কু মারা।"

চাক্কু! কমল বুঝতে পারল না। কে ছুরি মারল? কোথ্ থেকে? কেমন করে?

কমল পাশে সরে গিয়ে সামনে তাকাতেই অন্ধকাবে নরেশকে দেখতে পেল। আশ্চর্য!

"আপনি?" কমল বলল।

"এই লোকটা অনেকক্ষণ থেকে আপনার মতন এখানে ঘুরঘুব করছে।"

"আপনি এখানে ছিলেন?"

"এখন আছি।"

কমল অবাক হয়ে গেল। এই নরেশ যেন অন্য নরেশ। মদো মাতাল নয়। কিন্তু গলা ভারী।

"লোকটা কে?" নরেশ বলল। "আমি ওঁকে টাঙি নিয়ে ঘুরতে দেখে বেটাকে ফলো করছিলাম।"

কমল বলল, "ফাগুলাল।" আন্দাজে নামটা বলল কমল। ময়নার কাছে আজই কমল শুনেছে ফাগুলাল টাঙি চালাতে কুকুর লেলাতে ওস্তাদ।

"বেটাকে একবার দেখি—" নরেশ পকেট থেকে টর্চ বার করে জ্বালল।

কমল বলতে যাচ্ছিল, আলো জ্বালবেন না। তার আগেই নরেশ টর্চ জ্বেলে ফেলেছে।

ফাগুলাল তখনও মাটিতে বসে। ছুরিটা তার হাতে লেগেছে। আঙুলের কাছে। আর একটু হলে হয়ত ছুরিটা লাগত না। না লাগলে টাঙিটা কমলের কোথায় লাগত কে জানে! এভাবে অন্ধকারে ছুরি চালানো বোকামি। ভীষণ বোকামি। না লাগতেও পারত। কিংবা কমলও জখম হতে পারত।

ফাগুলাল যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। আঙুল কেটে রক্ত পড়ছে। বাঁ আর ডান হাতের কাটা জায়গা চেপে ধরে ফাগুলাল অশ্রাব্য গালিগালাজ করছিল।

ফাগুলালের গালিগালাজ থেকে বোঝা গেল, খানিকটা আগে ও পায়ে কাঁধে চোট পেয়েছিল বলে ঠিকমতন দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে টাঙি চালাতে পারেনি। নয়ত হারামি কলকাত্তাঅলাকে দেখে নিত।

কমল একেবারে হঠাৎ, আচমকা ফাগুলালের মুখে লাথি মারল। মাথা মুখ ঘুরিয়ে দু হাত দূরে ছিটকে পড়ল ফাগুলাল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। এই লোকটাই যে আজ খানিকটা আগে কংগো দিয়ে ময়নাকে জখম করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ময়নার ধাক্কায় লোকটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় নিশ্চয় পায়ে কাঁধে চোট পেয়েছিল।

ফাগুলালের লাথি খাওয়াটা দেখল নরেশ। তারপর কমলকে বলল, সন্দেহের গলায়, "আপনার ভাঙা পায়ে এত জোর?"

কমল খেয়াল করেনি সে বাঁ পায়ে লাথি মেরেছে! স্বাভাবিকভাবেই তার বাঁ পা চলে গিয়েছিল। কারণ এই পায়ের সামনের দিকে, হাড় বারবর যে ইঁচু রিব্ তোলা আছে—তার মধ্যে কাঠের গুঁড়ো এমনভাবে ঠাসা যে ওই জায়গাটা দিয়ে মারলে মনে হবে কেউ যেন লোহার মতন শক্ত জিনিস দিয়ে মেরেছে। তা ছাড়া বোধ হয় চরম ঘৃণার বশেও বাঁ পা চলে গিয়েছিল। কমল ধরা পড়ে গিয়েছে।

নরেশের চোখ এত তীক্ষ্ণ কমল জানত না। নরেশ কী বলল সে-কথায় কান না দিয়ে কমল বলল, "এই লোকটাই আপনার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল।"

নরেশ দু পা এগিয়ে সামান্য ঝুঁকে পড়ল। টর্চের আলো ফেলছিল ফাগুলালের মুখে।

কমল বলল, যে জিনিসটা আপনি সেদিন দরজার সামনে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সেটা এক রকম অস্ত্র। এই বেটা চালাতে পারে। আজও চালিয়েছে...।"

"তাই নাকি!" নরেশ নিজেও একটা লাথি কষাতে যাচ্ছিল বোধ হয় তার আগে দেখল ফাগুলাল জখম হওয়া পাগলা জন্তুর মতন মাটি হাতড়ে তার ছিটকে পড়া টাঙিটা তুলে নেবার চেষ্টা করছে।

ফাগুলাল বাঁ হাতে টাঙির আগা প্রায় ধরে ফেলেছিল। তার আগেই কমল যেন লাফ মেরে গিয়ে তার হাত চেপে ধরল পা দিয়ে। চিৎকার করে উঠল ফাগুলাল। তার বাঁ হাতটাও যেন ভেঙে যাচ্ছে।

নরেশ বুঝতে পেরেছিল। টাঙিটা তুলে নিয়ে অন্ধকারে ঝোপে ঝাড়ে ফেলে দিল।

ফাগুলালের কপাল ভাল কীভাবে যেন হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারল। তারপর উঠে দাঁড়িয়েই পালাতে লাগল।

গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে সে কোথায় পালাল আর তাকে দেখা গেল না।

কমল বলল, "টর্চটা নিভিয়ে দিন।"

নরেশ টর্চ নিভিয়ে দিল।

কমল বলল, "আপনি এদিকে কোথায় ঘুরছিলেন ?"

"আপনার খোঁজে।"

"আমার খোঁজে ?"

নরেশ যেন হাসির গলায় বলল, "ওই মেয়েটা—ময়না আপনার ঘরে গিয়েছিল না বিকেলে ?" বলে দু মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন কমলকে বুঝতে দিল, নরেশ সব দিকেই চোখ রাখে। বলল, "আপনাকে আমি সন্ধের আগে এদিকে আসতে দেখেছিলাম। তারপর আপনি বেমালুম হাওয়া।"

কমল বুঝতে পারল, নরেশ তাকে নজর করছিল। ও কি ময়নাকেও দেখতে পেয়েছে ? নিজেকে সহজ করার জন্যে কমল বলল,"আমাকে নজরদারি করতে গিয়ে আজ তা হলে আপনার সন্ধেবেলার…"

"ভাল হয়নি," নরেশ বলল, "আপনি কাটা ঘুড়ির মতন কোথায় গিয়ে পড়লেন বুঝতে পারলাম না। দরোয়ানের ঘরে গিয়ে ধেনো খাচ্ছি, ওর স্টক। হঠাৎ ওই শালা হারামিকে দেখলাম। বেটা আসছিল। গোবিন্দ বলল, লোকটা খারাপ। ম্যানেজারের পোষা গুণ্ডা। বেটা জল্লাদ। …আমার মিস্টার মেজাজ বিগড়ে গেল। সন্দেহ হল। লোকটাকে ফলো করতে লাগলাম। দেখলাম, বেটা ঠিক সেই জায়গায় এসেছে যেখান থেকে আপনি হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন।"

"আপনি তখন থেকে… ?"

"সিওর। মিস্টার, টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি—আপনারা তিনজনে খেলাটা বেশ জমিয়ে তুলেছিলেন। আপনি, ম্যানেজার আর ওই বুড়ি। আমি বুঝতে পারছিলাম না, তলায় তলায় আপনারা কোন চাল চালছেন। আই হ্যাড্ টু বি মোর অ্যালার্ট, সাসপিসাস্…।"

কমল বলল, "আপনি আমাদের খেলার চাল খুঁজতে এসেছিলেন ?"

"ও ইয়েস্।…শুধু এখন নয়, প্রথম থেকেই।"

কমল সামান্য চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আর খুঁজবেন না।"

"কেন ?"

"বিদ্যাবতী খুন হয়েছেন।"

নরেশ যেন বিশ্বাস করল না। অন্ধকারেই সে লাফিয়ে উঠল। "কী ?"

"বিদ্যাবতী খুন হয়েছেন।"

"বুড়ি খুন হয়েছে ! কোথায় ?"

"ঘরটা আপনি বুঝবেন না। আস্তাবলের পেছন দিক দিয়ে একটা চোরা সিঁড়ি আছে। তার মাথায় একটা ছোট ঘর। সেই ঘরে।"

নরেশ খপ করে কমলের হাত চেপে ধরল। "আপনি ঠিক বলছেন ?'
"হ্যাঁ।"
"ইউ আর এ ড্যাম লায়ার। বুড়ির বাড়িতে বুড়ি খুন হবে ? মিথ্যা কথা !"
"খুন হয়েছেন। কেউ ওঁকে মেরে ফেলেছে। শ্বাসবন্ধ করে। গলা টিপেও মারতে পারে।"
নরেশ যেন তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না। কথা আসছিল না মুখে। বোবা, হতভম্ব। তারপর হঠাৎ বলল, "আপনি দেখেছেন ?"
"নিজের চোখে দেখেছি।"
"কে খুন করেছে ? আপনি... ?"
"না। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এসে খুন করেছে।"
নরেশ হাত ছেড়ে দিল কমলের। দিয়ে পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠল, "ওই লোকটা। দ্যাট ম্যানেজার। শালা শয়তান। বাস্টার্ড।
কমল কিছু বলা বা বোঝার আগেই নরেশ রত্ননিবাসের দিকে ছুটতে শুরু করল। খেপার মতন চেঁচাচ্ছিল, "আমি ওকে ছাড়ব না। খুন করব। ব্লাডি, সোয়াইন...। শালা বেজন্মা, শুয়ারের বাচ্চা..."
কমলের মনে হল, নরেশের এভাবে ছুটে যাওয়া বোকামি। ও জানে না, এখন, এই সময়টা কত ভীষণ, কত কী হতে পারে!
অন্ধকারে নরেশ কোথায় মিলিয়ে গেল। তার পায়ের শব্দ আগেই মিলিয়ে গিয়েছে। কমলও কেন যেন নরেশকে ধরার জন্যে ছুটতে লগল হঠাৎ।
কমলের নজরে পড়ল, রত্ননিবাসের নিচের তলায় বারান্দা আর সিঁড়ির কাছে আলো হাতে কারা যেন ছোটাছুটি করছে, জোরালো টর্চ জ্বলল, টর্চের আলোয় কাউকে খোঁজা হচ্ছে, গলার শব্দ, কথা বলছে কারা!
ওরা কি কমলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ? ময়নার মুখ থেকে বিদ্যাবতীর খুন হওয়া এবং কমল খুনী—এ-কথা শোনার পর রত্ননিবাসের লোকগুলো বিভ্রান্ত বিহ্বল হিংস্র হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কমলকে! তার এতক্ষণ নিজের ঘরে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু কমল তার ঘরে ফিরতে পারেনি। ফেরা সম্ভব হয়নি। কমলের খোঁজে তারা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এরপর বাগানে নামবে। খুঁজে বেড়াবে খুনী কমলকে।
কমল ছুটতে লাগল। নরেশ যে কী করবে, করতে পারে—কে জানে!
নরেশ আগেই রত্ননিবাসের সিঁড়িতে পৌঁছে গেল। সারা রত্ননিবাসই যেন নিচের বারান্দা আর সিঁড়ির মুখে ভেঙে পড়েছে। আলো, নানা জনের গলা। গলার শব্দ ভেসে আসছিল। উত্তেজিত, আতঙ্কিত গলার স্বর।

কমল শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

নরেশ কিছুই গ্রাহ্য করল না। সে যেন ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। "সেই লোকটা কোথায় ? শয়তান ! শালা ম্যানেজার ?"

প্রসন্ননাথকে দেখা যাচ্ছিল না। কমল নিজেও অবাক হচ্ছিল। প্রসন্ননাথ কোথায় ? কমলকে অদ্ভুত চোখে সবাই দেখছিল।

নরেশ আবার চেঁচিয়ে উঠল, "কোথায় সেই হারামি ? শয়তান ?"

অর্জুন ইশারা করে অফিসঘর দেখাল। "ওই ঘরে।"

কমল তাকাল। প্রসন্ননাথের অফিসঘর খোলা। এখন এ সময়ে ম্যানেজারের অফিসঘর খোলা থাকার কথা নয়। কে খুলেছে, কেন খোলা হয়েছে—কে জানে। ঘরে আলো জ্বলছিল।

অর্জুন বলল, আপনারা যান। ম্যানেজারবাবু হুকুম করে রেখেছেন।"

নরেশ কোনো দিকে তাকাল না। অফিসঘরে চলে গেল।

কমলও এল। পেছনে পেছনে।

অফিসে ঢুকে কমল দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রসন্ননাথ তাঁর নিজের সেই সিংহাসনমার্কা চেয়ারে বসে আছেন। স্থির। তাঁর হাতের সামনে, টেবিলের ওপর একটা পিস্তল। ছাই দানে চুরুটের টুকরো। ঘরের মধ্যে সামান্য গন্ধ চুরুটের। হাত কয়েক তফাতে বাতি জ্বলছে।

নরেশও কেমন থমকে গিয়েছিল। পিস্তলটার দিকে তাকাল। বলল, "আচ্ছা !...তা হলে ম্যানেজার পিস্তলও রাখে ?"

প্রসন্ননাথ সরাসরি নরেশের দিকে তাকালেন। তাঁর সমস্ত মুখ যেন পাথর। প্রতিটি রেখা কঠিন অথচ কোনো যন্ত্রণায় কেমন কুঞ্চিত।

প্রসন্ননাথ বললেন, "বসুন আপনারা।" বলে গলা সামান্য তুলে অর্জুনকে ডাকলেন।

অর্জুন বাইরে ছিল। ঘরে এল।

"ওই বাবু কোথায়, চা বাগানের ?"

"বাইরে আছেন।"

"ডেকে দাও।...তোমরা কেউ এই ঘরে আসবে না আমি না ডাকলে। দরজা বন্ধ করে রাখবে।"

অর্জুন বাইরে গেল রথীনকে ডাকতে।

কমল প্রসন্ননাথকে দেখছিল। তার হাতের অ্যালুমিনিয়াম স্টিকের হাতলের একপাশে বুড়ো আঙুল স্থির হয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে ওপরের খাপটা খুলে ফেলা যাবে।

রথীন এল। সে যেন ভয়ে ভাবনায় কেমন আচ্ছন্ন, বোধহীন। শুকনো, অসুস্থ, সন্ত্রস্ত।

প্রসন্ননাথ রথীনকে বসতে বললেন।

রথীন বসল।

প্রসন্ননাথ দু মুহূর্ত রথীনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। "এই পিস্তলটা আপনার নয় ?"

রথীন চমকে উঠল। পিস্তলটা সে দেখেছিল আগেই। গলা শুকিয়ে আসছিল। বলতে যাচ্ছিল, তার পিস্তল নয়, বলতে পারল না।

প্রসন্ননাথ বললেন, "পিস্তলটা আমি পার্বতীর কাছে পেয়েছি। সে লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। ধরা পড়ে গিয়েছিল।...আপনি পিস্তল নিয়ে এ বাড়িতে এসেছিলেন ?"

রথীন মাথা নাড়ল। স্বীকার করল।

প্রসন্ননাথ নরেশের দিকে তাকালেন। "পিস্তল আমার নয়। আপনাদের একজনের।"

নরেশ বলল, "তাতে কী! এ বাড়িতে গেরুয়া পরে চিমটে হাতে ঢোকার নিয়ম ছিল নাকি ?"

প্রসন্ননাথ সে-কথার কোনো জবাব দিলেন না। নরেশের দিকেও আর তাকালেন না, কমলের দিকে চোখ ফেরালেন। "মা আজ খানিকটা আগে মারা গিয়েছেন। খুন হয়েছেন।" প্রসন্ননাথের গলার স্বর কঠিন। না আবেগ, না উত্তেজনা।

নরেশ বলল, "আপনি খুন করেছেন ?"

প্রসন্ননাথ কমলের দিকেই তাকিয়ে থাকলেন। বললেন, "মা আপনাকে কোথায়, কেন দেখা করতে বলেছিলেন আজ, আমি জানি। আমি জানতাম। ময়না আপনাকে নিয়ে গিয়েছিল। আপনি ঘর ছেড়ে চলে আসার পর মা খুন হয়েছেন।"

কমল বলল, "কে করেছে ? আপনি ?"

"না।"

"হাতের ছাপ বলে দেবে কে খুন করেছে।"

"ছাপের কোনো দরকার নেই। আমি বলে দেব কে খুন করেছে ?"

"কে ? কেমন করে ?"

প্রসন্ননাথ চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। চোখ বুজলেন। বাঁ হাত দিয়ে চোখ কপাল ঢেকে বসে থাকলেন সামান্য। তারপর বললেন,

"মাকে খুন করার কথা ছিল না। কথা ছিল, ওই ঘর থেকে তাঁর বাক্সটা নিয়ে আসা… ।"

কমল অবাক হল না। "আপনি তা হলে বিদ্যাবতীর যৌতুকের বাক্স, দানপত্রের কথা জানতেন ?"

"জানতে হয়েছিল। আপনাদের কথাবার্তা আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে শুনতাম। আমাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হত আপনাদের।"

"কেন ?"

"কেন— !" প্রসন্ননাথ আবার চশমা তুলে নিলেন। বললেন, "মায়ের এখন এমন মনের অবস্থা হয়েছিল যে তিনি নিজের একজন বংশধর খুঁজছিলেন, অবলম্বন। ঠক্‌, জোচ্চোর, ইতর—এসব বাদ বিচার করার বোধবুদ্ধি প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন। জীবনের শেষবেলায় তাঁর শুধু একটিই বাসনা ছিল—নিজের কোনো—নিজেদের—"

"বুঝেছি।"

"আমার মনে হয়েছিল, আগেও যেমন হয়েছে, এবারও তাই হবে। আপনারা হয় জাল, না হয় জোচ্চোর।"

"আপনি দেখতে চেয়েছিলেন আমি সত্যি সত্যি জাল না খাঁটি ?"

"হ্যাঁ।"

"কী দেখলেন ?"

"জাল নয়।"

"এঁরা, নরেশবাবু, রথীনবাবু ?"

"জানি না।"

কমল সামান্য চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "বিদ্যাবতীকে কে খুন করেছে ?"

প্রসন্ননাথ সেকথার কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর টেবিলের বাঁ দিকের ড্রয়ার খুললেন।

কমল অবাক হয়ে দেখল, বিদ্যাবতীর সেই যৌতুকের বাক্স।

বাক্সটা এগিয়ে দিলেন প্রসন্ননাথ। বললেন, "এর মধ্যে আপনাদের চাবি, দানপত্র সবই আছে।" বলে একটু যেন ম্লান হাসলেন। বললেন, "সবই আছে, শুধু তিনি নেই—যিনি আপনাকে স্বীকার করে নেবেন আইনমতে।"

নরেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। বলল, "সেটা পরে দেখা যাবে। আগে বলুন কে ওঁকে খুন করেছে ?"

প্রসন্ননাথ কিছু বলার আগে ছাইদানি থেকে চুরুটটা তুলে নিলেন। মনে হল

যেন তিনি চুরুটটা ধরাতে পারেন, ধরালেন না। বললেন, "ইচ্ছে করে কেউ খুন করেনি। পার্বতীকে আমি ওই ঘরে পাঠিয়েছিলাম, বাক্স আর চাবি কাগজ চুরি করে আনতে। সে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। না গেলে, এই পিস্তল নিয়ে সে আর রথীন বিপদে পড়ত। আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলাম।"

কমল বলল, "চোখের সামনে থেকে কেমন করে জিনিসগুলো চুরি করবে ?"

"করা যায়," প্রসন্ননাথ বললেন, "মা রাত্তিরে চোখে ভাল দেখেন না, ওঁর মধ্যে ঝিমুনি থাকে। আপনার সঙ্গে অতক্ষণ কথা বলার পর উনি ক্লান্ত, অন্যমনস্ক থাকবেন—এটা আশা করা যায়। তা ছাড়া, পার্বতী মোটামুটি ময়নার মতন করে সেজেছিল। একই রকম শাড়ি। মেয়েটা একসময় যাত্রা করত। ঘরে ঢুকে সাবধানে আলো কমিয়ে দিয়ে প্রায় অন্ধকারে তার যা চুরি করা দরকার চুরি করার কথা ছিল—...পার্বতী ঘরে ঢুকে আলো কমিয়ে সামনে যেতেই তিনি বুঝতে পারেন, ময়না নয়, অন্য কেউ। মা কে কে—বলে উঠে বসতে চেষ্টা করছিলেন, পার্বতী ভয় পেয়ে ওঁর মুখে বালিশ চেপে ধরে। জোয়ান মেয়ে, বড় বেশি জোরে চেপে ধরেছিল। হয়ত নিজের শরীরের পুরো ওজন দিয়েই ওঁর ওপর নুয়ে পড়েছিল।"

রথীন কেমন অদ্ভুত শব্দ করে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

কমল বুঝতে পারছিল, অতি বৃদ্ধা অসুস্থ এক মহিলার শ্বাসবদ্ধ হবার পক্ষে ওই চাপই যথেষ্ট।

"পার্বতী যা পেয়েছিল হাতের সামনে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে চলে আসে। ও ভীষণ ভয় পেয়েছিল। কাঁপছিল। আমি ঘরের ভেতর যাই। দেখি মা দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। বাতি নিবিয়ে দিয়ে চলে আসি।"

"বাইরে থেকে দরজাও বন্ধ করে দেন ?"

"দিয়েছিলাম।"

"কেন ?"

"বলতে পারব না। হয়ত ভয়ে, হয়ত আমার মাথার ঠিক ছিল না।"

"ফাগুলালকে আপনি আমার পেছনে লাগিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।...লাগিয়েছিলাম।"

"কেন ?"

"যদি আপনি নকল হন, আপনিই প্রথম খুন হতেন।"

"ময়নাকে ও মারল কেন ?"

"ময়নাকে খানিকটা সময় বেহুঁশ না রাখতে পারলে আপনাকে কেমন করে

ধরবে ?"

"আমি নকল না আসল, ফাগুলাল কেমন করে জানত ?"

"ইশারা ছিল। আলোর।"...সেটা জানানো হয়নি।"

নরেশ দেখল, রথীন প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতন মুখ করে বসে আছে।

কমল বলল, "ফাগুলাল আমার ওপর টাণ্ডি চালিয়েছিল।"

"মাথা মোটা। আমারও ভুল হয়েছিল। আমি কল্পনাও করিনি—মা এমনভাবে মারা যাবেন। আমার বুদ্ধির দোষে।"

কমল বলল, "আপনি বোধ হয় প্রথম নরেশবাবুর ওপরেই গুলি চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। সেদিন সকালে।"

প্রসন্ননাথ মাথা নাড়লেন। "ফাঁকা আওয়াজ।...উনি ক'দিন ভোরবেলায় শেফালির সঙ্গে বাগানে দেখা করছিলেন। ব্যাপারটা ভাল নয়। ভয় দেখাবার, সাবধান করার দরকার ছিল।"

"কেন ?"

"শেফালির হাত দিয়ে মায়ের অনেক ক্ষতি হতে পারত।...এর আগে একজন শেফালির হাত দিয়ে মাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতে গিয়েছিল। পারেনি। তাকে আমরা রেল লাইনে ফেলে এসেছিলাম ?"

"খুন করে ?"

প্রসন্ননাথ যেন ম্লান হাসলেন।

হাতের বাসী চুরুটটা ছাইদানে রেখে প্রসন্ননাথ হাত সরিয়ে নিচ্ছিলেন। কমল বুঝতে পারল, হাত সরাবার সময় প্রসন্ননাথ পিস্তল তুলে নেবেন।

কমল তার স্টিকের বোতাম টিপলো। ওপরের আবরণটা আলগা হয়ে পড়ে গেল মাটিতে পায়ের কাছে।

প্রসন্ননাথ পিস্তলটা তুলে নি েন।

কমল তার হাত ওঠাবার আগেই প্রসন্ননাথ পিস্তলটা নিজের গলার কাছে ধরলেন। বললেন, "আমার যা লেখার আমি লিখে গিয়েছি। ড্রয়ারে আছে। এই বাড়ির আমিও একজন ছিলাম। মাকে আমি ভালবেসেছিলাম। তাঁকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছি বঞ্চকদের হাত থেকে। আমার দুর্ভাগ্য, আমিই তাঁর জীবনের এই শেষ দিনে..."

কমলের হাত উঠে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই প্রসন্ননাথ আঙুল চাপলেন। কণ্ঠনালির পাশ দিয়ে গুলিটা তাঁর গলার দিকে চলে গেল, তালুর দিকে। তারপর কোথায় গেল বোঝা গেল না।